বাছাই পঁচিশ

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রকাশিনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রণে
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

ছুটকী

ময়নার দিদির নাম ছুটকী। নামে ছুটকী হলেও চোদ্দ বছর বয়স থেকে ভারিক্কী, গম্ভীর, মমতোময়ী এবং কর্তব্যে কঠোর। ওই বয়সে ওর মা মারা যায়। ময়না তখন নয় বছরের। শ্রাদ্ধ মিটে যাওয়ার পর দিনই ওর নজরে পড়ল বোনটার সারা শরীরে চুলকুনি। মা বিছানা নেওয়া থেকে কেবা ওকে কুয়োর জল তুলে স্নান করায়·যত্ন আত্তি করে। গরমে অস্থির হয়ে পেছনের ডোবার জলে ঝাপাঝাপি করে খালুসের কামড়ে এমন হয়েছে। খালুস এক রকমের কীট। চোখে দেখা যায় না। পুরনো বদ্ধ জলে জন্মায়। বেশিক্ষণ গা ডোবালে চামড়ায় লাল বিন্দু বিন্দু ফুটে ওঠে। চুলকে ঘা হয়ে যায়। তা ময়না রাতে ঘুমুতে পারছিল না। সকালে উঠে ছুটকী কাঠবিড়ালীর মতো তরতর করে নিমগাছে উঠে পাতা পেড়ে সেদ্ধ করল। ময়না দিদির এসব উদ্যোগ আয়োজনের ব্যাপার-স্যাপার আঁচ করতে পারেনি। মুড়ি গুড় খেয়ে বেলা নটায় বনে-বাঁদানে ঘুরতে যাবে বলে বেরুচ্ছিল। ছুটকী ওকে ডাকল

—কোথায় চললি?

—ওই ওদিকে

ওদিকে মানে? শোন বাঁদরী, মা নেই বলে তোর চার হাত-পা গজিয়েছে মনে করিস না। আজ থেকে ইস্কুলে যাবি। আয় তোকে স্নান করিয়ে দি।

ময়না রীতিমতো বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

—কেন আবার কি? যা বলব তাই করতে হবে। পিশেচ কোথাকার। কি করেছিস চেহারাটা? গা ভর্তি চুলকুনি, মাথায় উকুন, হাতে-পায়ে গলায় পুরু ময়লা কেউ দেখার নেই নাকি ভেবেছিস?

ময়নার কোনও আপত্তি টিকল না। হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে করতে নিম জলে স্নান করল। চুল আঁচড়াল, ফিতে বাঁধল, তারপর দিদির হাত দরে গুটি গুটি প্রাইমারীর মাস্টারদের জিম্মায় চলে গেল।

মোটমাট চোদ্দ বছরের ছুটকী বাবা আর বোনের দায়িত্ব নিয়ে ফেলল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নাঘরের ঝুলকালি ঝেড়ে শলার ঝাটা দিয়ে ঝপাঝপ গুটি কয়েক আরশোলা মেরে, ইঁদুরদের জাতীয় শুড়ঙ্গের উপর ইঁটচাপা দিয়ে মার রাজত্বে জাঁকিয়ে বসে গেল। কুমী, পার্বতী, টুকীরা ইস্কুল যাওয়ার পথে অভ্যেস মতো প্রথম দু-চারদিন দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়েছিল, ছুটকী ইস্কুল যাবি নাকি?

না রে যাওয়া হবে না। হোমটাস্ক করিনি।

কুমী ওর প্রাণের বন্ধু। বলল, চলনা আমার খাতা থেকে ক্লাস বসার আগেই টুকে নিবি।

ছুটকী গিন্নীবান্নীর মতো কোমরে হাত রেখে জবাব দিল, ও-বাব্‌বা, তা হলেই হয়েছে। এদিকে লণ্ডভণ্ড হয়ে থাকবে সব। আজ আবার একবালতি জামাকাপড় ভিজিয়েছি। ঘাটে নিয়ে কাঁচতে হবে। মোটমাট এইরকম নানা কারণে ছুটকীর পড়াশুনাও শেষ হয়ে গেল।

মার মৃত্যুর পর কি রকম জবুথবু হয়ে বাবা পাঁচ বছর বেঁচে রইল। সকালে উঠে দই-চিড়ে খেয়ে কাজে চলে যেত। ভাত খেতে ফিরে আসত দুপুর দুটো আড়াইটায়। তারপর আবার চারটায় বেরিয়ে রাত নটায় ফেরা। বরাবরের বাঁধা নিয়ম। মার আমলে চলত এখনো চলছে। অথচ্‌ কে দই পাতে, বাজার করে ভাত রেঁধে গালে হাত দিয়ে দুয়ারে অপেক্ষায় থাকে এসব বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা নেই মাথা ব্যথাও নেই। মোটমাট ছুটকী সংসারের জাতাকলে পড়ে গেছে। একদিন বাবা হঠাৎ বিকেল বেলায় ফিরে এসে ডাকল, ছুটকী এদিকে আয়তো। দেখি মা কতটা বড় হয়েছিস। সাউজি বলছিল মেয়ে তোমার বড় হয়েছে গো বিয়ে থা দিয়ে দাও—

তাই বুঝি ভাবনা ঢুকেছে? না বাবা বড় আমি হইনি। হলেও বিয়ে আমি করব না।

—তাইতো বললাম খামোকা চমকে দিচ্ছ কেন সাউজি? এই কি বিয়ের বয়স? তোকে পার করে দিলে রান্না কে করবে? ময়নাকে কে দেখবে?

ওই একবারই কি করে যেন বাবার মাথায় কিছুক্ষণের জন্য মেয়ের বিয়ের উদ্বেগ ঢুকে গিয়েছিল। ওইটুকু রক্তের টানের প্রকাশ ছুটকীর মনে গেঁথে আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বাবা ফিরে গিয়েছিল শেলাই কলের খর খর ঝর ঝর শব্দের মধ্যে নানা রঙের কাপড়ের কাটাকুটি মাপজোকের ভেতর ডুবে যেতে। বিনয় দর্জি এমনিতেই কথা বলত খুব কম। শুধু রাতটুকুর জন্য ঘরে ফিরে বড় জোর ময়না ঘুমিয়েছে। কি তোর মা একবার নারকোল বাটা দিয়ে কৈমাছ রান্না করেছিল। ব্যস, এই টুকুতেই সংসারের আলাপ আলোচনা শেষ। সারাদিনের উপার্জনের টাকাটা একটা কৌটার মধ্যে রেখে যেত ছুটকী তা থেকেই হিসেব করে চাল-ডাল-তেল-নুন-ওষুধ-ডাক্তার, ময়নার বই পত্তরের খরচ মেটাত।

বাবা মারা গেল এক থই থই জোছনার রাতে। ঘরে ফিরে টলতে টলতে সটান ময়নার পাশে শুয়ে পড়ল। ছুটকীর বয়স তখন উনিশ বছর। রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করে বারান্দায় লণ্ঠন নিবু নিবু কমিয়ে রেখে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। কোথায় একটা বোকা পাখি দিনের আলো ভেবে ডাকতে লেগেছে। দেখা যাচ্ছে না। ডোবার ওই পাশের জাম গাছে হবে হয়ত! ছুটকীর ছোটবেলায় শেখা একটা ছড়া মনে পড়ল—চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে? হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনা মণির বে। তা ময়নার বয়স চোদ্দ হল। আর কয়েক বছর পর ওকে বিয়ে দিয়ে পার করতে পারলে হাড় জুরুবে ছুটকীর। চওড়া কাঁধ শ্যামলা এক যুবকের পাশে কপালে সিঁদুর লেপটানো ফর্সা ময়নাকে কল্পনা করলো

ও। সুন্দর মানাবে। ছেলের গলার আওয়াজ যেন গমগমে হয়। পুরুষ মানুষের মিনমিনে কথা ও পছন্দ করে না। ঠিক এই সময় বাবাকে ওভাবে শুয়ে পড়তে দেখে একটু অবাক হল। কাছে গিয়ে ডাকল, বাবা খাবে না?

বিনয় দর্জি মেয়েকে শেষ কথা বলেছিল। আমার বুকে একটু হাত রাখ। খুব ব্যথা।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটা মরে গেল। প্রায় নিঃশব্দে। বারকয়েক মুখ হাঁ করল, বন্ধ করল, বিছানার চাদর খামচে ধরল, ব্যস!

নিঃশব্দে যে বেঁচে থাকে এবং যার মৃত্যুটাও প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার মতো তার অনুপস্থিতি খুব একটা প্রকট হয় না। যা করার কাছের দূরের আত্মীয়-স্বজনরাই করল। ছুটকীর কাছে বাবার অভাবটা প্রথম তীব্রভাবে ধরা পড়ল। টাকা রাখার আমুলের কৌটোয় হাত ঢুকিয়ে একটা আধুলি বা সিকিও নেই। তার মানে চাল-ডাল-তেল-নুন কিছুই আর আসবে না। এখন বেলা দশটা। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। অথচ এরমধ্যে ছুটকী চোখে অন্ধকার দেখতে থাকল। সামনে ময়নার মাধ্যমিক পরীক্ষা। একটু পরে উঠে এসে বলবে দিদি, ভাত হয়নি? এসময় ও দুহাতা সেদ্ধ ভাত খায়। দুপুরের খাওয়াটা বারোটা-একটায়। রান্না ঘরের শেকল তুলে দিয়ে হলুদ কালি মাখা শাড়ি পালটে ছুটল পান্নার মোড়ে। বাবার দোকান। পুরনো কারিগর ব্রজলাল মেশিনে একটা ফ্রক শেলাই করছিল। ওকে দেখে কি রকম চমকে উঠল, ছুটকী, তুমি এখানে?

হ্যাঁ, ব্রজকা, টাকা পয়সা নিতে এলাম। বাবা মারা যাওয়ার পর এই চারদিন আসতে পারিনি। এ কদিনের আয়টা আমাকে বুঝিয়ে দাও।

ব্রজ খুব শুকনো হেসে বলল, তুমি দোকানের কি বুঝবে? বিনয়দা যা ধারকর্য রেখে গেছে তাতে ধরে নাও দোকান উঠে গেছে।

—তাই নাকি? ইশ, তা হলে তো তালা খোলাই ঠিক হয়নি। যাক, ব্রজকা একটু চা খাওয়াও সঙ্গে লেড়ি বিস্কুট। বাবাকে যেমন এনে দিতে। ব্রজদাস একটু ইতস্তত করছিল, দোকান ফেলে যাই কি করে?

—ফেলে আর যাচ্ছ কোথায়? আমিই তো আছি। বেশ একটু কড়া গলাতেই ছুটকী বলল, যাও।

ব্রজদাস ফিরে এসে দেখল উনিশ বছরের ছুটকী অর্ডারের আর হিসাবের খাতা নিয়ে বসে গেছে। সেই থেকে শুরু। মার মৃত্যুর পর হেঁসেলের ভার নিয়েছিল, বাবার মৃত্যুর পর দোকানের।

ময়নার পরীক্ষা পর্যন্ত খুব সকালে উঠে রান্নাবান্না করে বোনটাকে খাইয়ে ও নিজে খেয়ে দোকানে চলে যেত। ফিরত সন্ধ্যায়। আবার রান্না খাওয়া ঘর-সংসারের কাজ সেরে শুতে শুতে রাত এগারটা-বারোটা। পরীক্ষার পর ময়নাকে ডেকে বলল,

—এখন থেকে রাতের ভাতটা তুই করিস।

ময়না গলার স্বরে রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, তা হলেই হয়েছে আর কি।

—হয়েছে মানে?

—পরীক্ষার খাটুনী গেল। কোথায় একটু রেস্ট পাব। তা না রাঁধ-বাড়-খাও। না না ওসব হবে না।

ছুটকী ভয়ানক দুঃখ পেল। অনেকটা অভিমান নিয়ে ও আর কোনও জোর-জবরদস্তি না করে যেমন চলছিল চালাতে থাকল। ব্রজদাসের কাছে এরমধ্যে ও অনেক কাজ শিখে নিয়েছে। মাপ জোক, বিভিন্ন ছাঁট, সেলাই মেশিনের ছোটখাট যান্ত্রিক গোলযোগ সারাই করা, দর্জি হিসেবে ওর বাবার সুনাম ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রাহক কমে গিয়েছিল। এখন ক্রমশ বাড়ছে। ব্রজ একদিন বলল, বিনয়দার মেয়ে তো, এরমধ্যেই ছাটের ব্যাপারটায় আমাকে ডিঙিয়ে গেছে। যেরকম চাপ বাড়ছে তাতে পুজোর মধ্যে এলে এবার অর্ডার ফিরিয়ে দিতে হবে।

অর্ডার ফিরিয়ে দেব কেন? রেট একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। ধর টাকায় দশ পয়সা। তাতে যাদের পোশাবে তারাই আসবে। তাতেও যদি সামলে ওঠা না যায় তো আর একটা মেশিন কিনে ফেলব।

মেশিন কিনলে তো আবার একজন কারিগরও রাখতে হয়।

—তা রাখব। ভাল লোক দেখ। পূজার আগেই নূতন মেশিন এসে যাবে। তা তোমার ভাইপো অঞ্জন এখন কি করছে?

ব্রজদাস কিছুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবল। তারপর প্রায় মনে মনে বলার মতো নীচু স্বরে জবাব দিল, উড়চুন্ডে ছেলে। টেলারিং-এর কাজ তো অনেকটাই শিখে নিয়েছিল। ভেবেছিলাম আমার কাছে কাছে থাকবে। ছেলেপুলে নেই। তা ভাইপো আর ছেলেতে কতটুকু তফাৎ। থাকল কই? এখন না এদিক না ওদিক। কোনটাতেই মন বসে না। এই শুনলাম বালুরঘাট রাইসমিলে কাজে লেগেছে। তারপরই খবর এলো শিলিগুড়ি হংকং বাজারে জুতা-ছাতা-টর্চ বিক্রি করছে।

তখন ছেলে মানুষ ছিল। ওই বয়সে কাঁহাতক আর বসে বসে মাথা নীচু করে বোতাম ঘর শেলাই করতে ভাল লাগে? এখানে যখন ছিল মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে গিয়ে ছোটদের সঙ্গে গোল ছুট খেলায় জমে যেত। কাজে গিয়ে অমন খেলায় লেগে গেল তোমরা বকাঝকা করতে বোধহয়। তা অঞ্জনকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য খবর দাও।

—আসবে কিনা কে জানে।

—আমি ডেকেছি শুনলে আসতেও পরে।

তা শুনল এবং প্রোঃ ছুটকী সরকারের ভারত টেলার্স-এ বহাল হয়ে দুটি বছর পার করে দিল। ব্রজদাস দেখল উড়চুন্ডে ভাইপোটার কাজে গভীর ভাবে মন বসে গেছে। সেই পালাই পালাই ভাবে ভাটা পড়ে, একজন দায়িত্বশীল কাজ পাগল মানুষের চেহারা ফুটে উঠেছে। নতুন কোনও ডিজাইন কোথাও দেখল কি মাথায় এলেতো ওই নিয়ে ডুবে থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। ছুটকীর সঙ্গে আলোচনা তর্ক বিতর্ক করে। দোকান ক্রমশ বাড়ছে। এমব্রয়ডারি মেশিন এসেছে একটা। মিস্ত্রি

লাগিয়ে কাটারের টেবিলের ঠিক পেছনে ছোট একটা কাঠের খুপরি করে লিখে দেওয়া হয়েছে ট্রায়াল রুম। এ বুদ্ধিটা অঞ্জনের।

আজ দুপুরে বর্ষাশেষের দলছুট হাঁসের মতো সাদা ধবধবে মেঘপালক ঝরানো বৃষ্টি ফেলে গেছে। তার মানে পুজোর আর দেরি নেই। ছুটকী শিউলির বোঁটার মতো বাসন্তী রঙের কাপড় ছাটতে ছাটতে মুখ তুলে দেখল ওপাশে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অঞ্জন মেশিনে পাঞ্জাবির বুকে কাঁধে এমব্রয়ডারি করছে। কখন বৃষ্টি এলো কখন গেল এসব চোখ মেলে দেখেও না হয়ত। কাজের মরশুম আসছে। চাপ ক্রমশ বাড়বে। আজই একটা কথা ওকে বলতে হবে। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। এরপর সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। অঞ্জনের শ্যামলা রঙ, চওড়া কাঁধ আর লোমশ বুক। গলার আওয়াজ গম্ভীর। পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। এইরকমই দরকার। হ্যাঁ ঠিক এইরকম। এর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে?

এই দু'বছরে ময়নাকে নিয়ে একটার পর একটা অশান্তি ভোগ করছে ছুটকী। একদিন দুপুরে ধুম জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল ঘর ভরতি দশ-বারোজন ছোকরা। মাঝখানে ময়না একজনের কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকেই চড়াগলায় কথাবার্তা হুল্লোড় শুনতে পেয়েছিল। এখন এই দৃশ্যটা দেখে ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

—এসব কি হচ্ছে ময়না?

ময়না কোনও উত্তর না দিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রদীপ নামে পাশে দাঁড়ানো ছেলেটি জবাব দিল, রিহার্সাল দিদি।

—রিহার্সাল? কিসের রিহার্সাল?

—আমাদের নাটকের

—ময়না আমাদের নায়িকা

—আমার বাড়ি কি তোমাদের ক্লাবঘর?

ময়না ফোঁস করে উঠল, ওরা আমার বন্ধু। আমি ওদের ডেকেছি। এ বাড়ি তোমার যেমন আমারো তেমনি।

জয়ন্ত নামে ছেলেটি বলল, থাক ময়না। রিহার্সাল আজকের মতো শেষ।

ওরা চলে গেলে ছুটকী আর কোনও কথা না বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। অঞ্জন কদিন থেকেই বলছে, 'ঠিক একই সময়ে মাথা ধরছে দিদি, চোখ দেখাও। সেলাই-এর কাজে চোখে বড় চাপ পড়ে। তা দেখাতে হবে। একটু বিশ্রাম নেবে বলে বাড়ি ফিরে এ কি হুজ্জুতি।

ময়না দাঁতে আঁচলের প্রান্ত চেপে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল, আমার বন্ধুদের কেন তুমি অপমান করলে? কেন?

ছুটকী শুয়ে থেকেই আস্তে আস্তে জবাব দিল, অপমান আমি কাউকে করতে চাইনি। তবে এও বলে রাখছি এখানে কিছু করতে গেলে আমার অনুমতি দরকার।

যেভাবে তুমি চলছ সেভাবে চললে ঘর-সংসার বলে কিছু থাকে না।

—কি থাকে না তাকে সে বোঝার বয়স আমার হয়েছে দিদি। আমার ওপর কোনও খবরদারী করতে এসো না।

ছুটকী এবার উঠে বসল।

—খুব বড় হয়ে গেছিস, না? ভালমন্দের কতটুকু বুঝিস তুই?

তিক্ত হেসে ময়না দিদির চোখে সোজাসুজি চাইল।

—অসম্ভব। এ ভাবে বাঁচা যায় না দিদি। রাত নটা-দশটা পর্যন্ত বাইরে কাটাও। কোথায় কি কর তার খোঁজটাই-বা কে রাখছে? তুমি রাত করে বাড়ি ফিরতে বেয়ারাপনা হয় না? আমি কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি তাই নিয়ে প্রায় দিন তদন্ত করতে বস। আমি কি ঘরে খিল দিয়ে থাকব? একা একা আমার দিন কাটবে কি ভাবে?

ছুটকী একটা গভীর খাদের অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট তলটা দেখতে পেল। কেন ময়না দিনে দিনে অবাধ্য, জেদী হয়ে উঠছে; কেন সে হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করে আর একবার পরীক্ষায় বসতে কিছুতে রাজি হল না।

বলল, পড়ে কি হবে আমার? কেন সে কোথায় কোথায় আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে ইদানিং, সমস্ত কিছুর কারণ ওর নিঃসঙ্গতা। সত্যিকার বন্ধু চায় একজন, যার উপর ময়না ওর শরীর মনের সমস্ত ভার নামিয়ে হালকা হয়ে যেতে পারবে। সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল ছুটকীর। বোনটার জন্য গভীর মমতো বোধ করল। চেয়ে চেয়ে দেখল একটা গামছা কাঁধে ফেলে ও পেছনের দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে—তার মানে ঝোপঝাড়ে ঢাকা পুকুরটায় যাচ্ছে। কিছু বলল না ছুটকী। ও জানে ভীষণ মন কারাপ করলে খেজুর গাছের কাটা গুঁড়িটার ওপর বসে জলের দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু একটা দেখতে পায় ময়না। ঘণ্টা খানেক ঝাপাঝাপি করে হাসি মুখে ফিরে আসবে।

ব্রজদাস কিছুক্ষণ আগেই বাড়ি চলে গেছে। বয়স হয়েছে। আজকাল রাত আটটাতেই যাই যাই।

অঞ্জন মুখ তুলে ডাকল, দিদি।

ছুটকী উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি?

—দেখত এই ডিজাইনটা এখানে মানাবে কিনা।

—খুউব। বেশ হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে কাজটা নিয়ে ডুবে আছ। তোমার সঙ্গে অন্য কথা আছে। অঞ্জন জিজ্ঞাসু চোখে চাইল। ছুটকী একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি বিয়ে কর।

অঞ্জন মাথা নীচু করে তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। মুখ তুললে ছুটকী একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি আমার কথা রাখবে? যা বলব না করবে না?

অঞ্জন এবার হাসল, ও বাবা। না শুনেই কবুল করতে হবে?

—কবুল করার মতো কথাই বলব অঞ্জন। তুমি বিয়ে কর; ওই একটা বোন ছাড়া আমার আর কে আছে। ওকে তুমি নাও। আমি নিশ্চিন্ত হই।

অঞ্জন মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। মুখ তুললে ছুটকী দেখলো

সেখানে অন্ধকার নেমে এসেছে—চোখের আলো নিবলে যেমন হয়। কোথায় গেল ওর গমগমে গলার আওয়াজ। কথা বলছে যেন বহুদূর থেকে।

—দিদি, আমি ভেবেছিলাম অন্যকথা। এটা তোমার হুকুম মনে করেই মেনে নেব। শুধু তোমার বোন যদি তোমার মতোই হত। তবে যা করবে তাড়াতাড়ি কর। ভাবনা-চিন্তার সময় দিয়ো না আমাকে।

কনের অভিভাবক হিসেবে ছুটকী অঞ্জনদের বাড়িতে গিয়ে কথা পাকা করে এলো। দেয়া-থোয়া, বিয়ের লগ্ন, আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে অঞ্জনের বাবা-মা, জ্যেঠা, পিসি সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করল, সিদ্ধান্ত নিল। ছুটকীকে ওরা সেভাবেই সম্মান দিল।

ময়না হ্যাঁ না কিছুই বলল না। বিদায় বেলায় মেয়েরা কাঁদে, ময়নার শুকনো ডোবার মতো চোখ দুটোয় শেকড় ছেঁড়ার কষ্ট বা সুখের স্বপ্ন কোনটাই ছিল না। ছুটকী সেদিকে তাকিয়ে বড় বিভ্রান্ত হল। ভালমন্দ কিছুই সে পড়তে পারল না।

গ্রামের বাড়িতে দুমাস কাটিয়ে ময়না ছোট্ট শহরটার প্রান্তে ছুটকীর ঠিক করা একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে এলো। মাঝে একবার কদিন পর ছুটকী গিয়ে দেখল কাকডাকা ভোরে ময়না ঝাঁটা হাতে কাজে লেগে যায় শেষ করে গভীর রাতে বাসন মেজে। দিদির সঙ্গেও দুদণ্ড কথা বলার সময় পায় না। সকলের খাবার মিটিয়ে রাতে একা একা খেতে বসেছে। নিরিবিলিতে বোনের সঙ্গে কথা বলবে বলে রান্না ঘরে পিঁড়ি টেনে মুখোমুখী বসে দেখল ডাল-তরকারী প্রায় কিছুই নেই। মুখ নীচু করে খাচ্ছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, কেন এইতো বেশ সুখে আছি দিদি।

—অঞ্জনকে আমি বলে যাব এ সময় তোর যত্নআত্তি করতে। একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া, একটু বিশ্রাম।

—না দিদি আমার কোনও অযত্ন হয় না। আর কি করবে? খেটে-খুটে রাত করে ফেরে। মালিক তো না খাটিয়ে পয়সা দেয় না। একটু বিশ্রাম, একটু দুধ-মাছ ওরই তো দরকার। তাই-বা জোটাতে পারছি কই? উল্টে খামোকা আমার জন্য ভাবনা-চিন্তায় অস্থির করে তুলব কেন?

—তুই কিছু টাকা রাখ আমার কাছ থেকে। আমার যা আছে সবই তো তোর।

—আমার কিছু দরকার নেই দিদি। ও যা দেয় তার চেয়ে বেশি কিছু আমি চাই না।

বাচ্চাটা জন্মের পর ময়নার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। এরই মধ্যে রান্নাবান্না সংসারের পাঁচটা কাজ। রাতে বাচ্চাটা ঘুমোতে দেয় না। তার মধ্যে এবার বর্ষাটা জাঁকিয়ে বসেছে। ভিজে কাঁথা শুকানো যায় না। একচিলতে বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। থেকে থেকে জলের ঝাপটা আসে। বাজ পড়ার ঠা ঠা শব্দে বুকের ভেতর শিশু

চমকে চমকে ওঠে। একদিন ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে এসে অঞ্জন বলল, ক'দিন দিদির কাছে থেকে এসো। বাচ্চা নিয়ে একা এই অসুস্থ শরীরে পারবে কি করে?

—না।

—না কেন?

—বলছি তো বাবা যাব না। এ নিয়ে আমাকে একটি কথাও বলতে এসো না।

পরের দিন রবিবার। দোকান বন্ধ। অঞ্জন সকালে উঠে বলল, তুমি শুয়ে থাক। যা করার আমিই করছি। ময়না মাথাটা একটু তুলে ম্লান হেসে বলল, কর। আজ আমার ছুটির দিন।

রান্নাবান্না করে অঞ্জন ঘরে ঢুকে দেখল ময়না বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। বাচ্চার হিসিতে কাপড় ভিজে গেছে। প্রবল জ্বর। হাড় জিরজিরে বুকে শুকনো স্তনের বৃন্তে শিশুর ঠোঁট দুটো থেকে থেকে নড়ছে।

হাত দিয়ে কপালে আস্তে একটু চাপ দিয়ে অঞ্জন ডাকল, ময়না।

জবাফুলের মতো লাল দুটো চোখ মেলে ময়না জ্বরের ঘোরে বিরবির করে বলল, উঃ আবার এসেছ? কেন? আর কি চাই?

অঞ্জন দুপুরেই ছুটকীর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হল, দিদি এক্ষুণি আমার সঙ্গে চল।

অঞ্জন ক'দিন দোকানে একা গেল। ছুটকী এসে বোনের সংসারের সমস্ত দায় কাঁধে নিয়েছে। রুগীর সেবা যত্ন, বাচ্চার পরিচর্য্যা, ঘর-দোর পরিষ্কার করে তোলা এইসব। অনেক দিন পরে ঝকমকে রোদ উঠেছে। বিছানাপত্র উঠানে মেলে দিয়ে ময়নাকে বলল, আয় তোর চুল বেঁধে দিই। জট পাকিয়ে গেছে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে রোগ একেবারে চেপে ধরছে যে। একটু আলো হাওয়া লাগা।

ময়না ছেলেকে বুকে নিয়ে বাইরে এসে মাদুরে বসে বলল, আমি আর ভাল হবনা দিদি।

—ওসব হা-হুতাশ আমার শুনতে ভাল লাগে না। মনে জোর আন তো। রোগ হয়েছে সেরে যাবে।

—আমি জানি আমার কি হয়েছে। সেদিন তোমরা বারান্দায় বসে গলা নামিয়ে কি আলোচনা করছিলে শুনেছি। চিরকাল পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে আমাকে।

—দূর বোকা মেয়ে। আজেবাজে ভেবে মাথা খারাপ করছিস! দেখত কি সুন্দর রোদ উঠেছে আজ। ওই দেখ বাবলাগাছ ফুলে ছেয়ে গেছে। তার পেছনে ওই দেখ টাঙ্গন নদীর জল চিক্ চিক্ করছে। ভাল হয়ে এমন সুন্দর ছেলে নিয়ে ঘরকন্না কর। আমার দেখে দেখে চোখ জুড়োক। ময়না ঘাড় একটু উঁচু করে বলল, তাই তো, টাঙ্গন এত কাছে চলে এসেছে।

—ছেলেটাকে ধরতো দিদি, একটু বাইরে থেকে আসি বলে ময়না সেই যে গেল আর ফিরল না। কাজেই ছুটকীর আর বাড়ি যাওয়া হল না। অঞ্জন উদ্‌ভ্রান্তের মতো

এখানে-ওখানে খোঁজ করে। টাঙ্গন নদীর পাড় ধরে বিশ-ত্রিশ মাইল ঘুরে এসেছে। জাল ফেলে তোলপাড় করেছে বাবলাতলার ঘাট। কতদূর যেতে পারে অসুস্থ পঙ্গু মানুষটা? অনুসন্ধান তোড়জোড়ে এক সময় ভাটা পড়ে। কিন্তু অঞ্জন আর স্বাভাবিক হতে পারল না। ক্রমশ ওর মধ্যে সেই আগেকার উড়নচণ্ডী স্বভাব ফিরে আসতে থাকে। না বলে কোথায় কোথায় চলে যায়। দশ-বিশ দিন পরে হঠাৎ ঝড়ো কাকের মতো ফিরে এসে গুম হয়ে বসে থাকে। ছেলেটাকে নিয়ে থাকতে হয় বলে ছুটকীও দোকানে যেতে পারে না। অঞ্জন যায় না, ছুটকীও নেই, দোকানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।

এইটুকু বাচ্চা মাইটানার জন্য ছুটকীর বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে থাকে। না পেয়ে প্রবল চীৎকার আরম্ভ করে কিছুতেই থামান যায় না। মার দুধের নেশা। নিরুপায় হয়ে ছুটকী একদিন শুকনো স্তন মুখে তুলে দিয়ে শান্ত করে। তারপর মধ্যরাতে অনুভব করে শিশুর ওষ্ঠের টানে ওর স্তনের ভেতর শির শির করছে এক অজ্ঞাত সুখ। ভারী হয়ে উঠেছে মাংস-পিণ্ড।

সেদিন ভোর রাতের ট্রেন ধরে অঞ্জন কোথায় যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। ছুটকী ওকে মশারীর ভেতর থেকে ডাল দিল, শোন।

—কি?

—এভাবে উড়ুক্কু হয়ে ঘুরে বেড়ালে চলবে? ব্যাগ নামিয়ে রাখ; চা-খাবার করে দিচ্ছি! দোকানে যাও। ওটা যে লাটে উঠতে চলল।

—আমি আর পারব না দিদি।

ছুটকী গলা চড়িয়ে বলল, পারবে না মানে? তোমার বাচ্চা, ঘর-সংসার এসব চিরকাল আমি সামলাব না কি? কাজে-কম্মে আবার মন দিয়ে লেগে যাও। বছর কাটাতে আর দুটো মাস আছে। ও ছুঁড়ি আর ফিরবে না। আর একটা বিয়ে কর। এইটুকু শিশুর মা চাই।

অঞ্জন হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, আবার? কি ভেবেছ তুমি? বার বার আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বলি দেবে, আর আমি তাই মাথা পেতে নেব?

ছুটকী বলল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেই দায়-দায়িত্ব ঘুচে যাবে? চিরকাল পরের বোঝা টেনে যাব আর তুমি গাঙ-ফরিঙের মতো এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াবে না কি? আমি থাকতে তা হতে দিচ্ছি না। মা মারা যাওয়ার পর সংসার কাঁধে নিয়েছিলাম, বাবা মারা গেলে দোকানের। এমন কারো সঙ্গে বিয়ে দেব তোমার যে নাকি ময়না ফিরে এলে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারে। তাতে তোমার ময়নার জন্য অপেক্ষা করা ও ঘর-সংসার দোকানটাকেও বাঁচান হবে। মশারি তুলে দেখ বাচ্চাটা আমার বুক টানছে। কি বলব দুধের বোঁটা মুখে তুলে দেওয়া মাত্র কান্না থেমে যায়। আমি ওর মা হব। হ্যাঁ। এই আমার হুকুম।

ভাঙ্গাচোরা মানুষ আর সোজা জীবনের বৃত্তান্ত

এবার দুর্গার মা ফিরে এলো যায় যায় বেলায়। তেঁতুলতলা পেরুবার সময় মেয়েটা দেখতে পেয়েছিল। তবু গতবারের মতো মা বলে ছুটে গেল না। মানে যেতে পারল না। ডাগর হয়েছে। সব বোঝে। দুরন্ত অভিমানে হেঁসেলের বেড়ার পিঠে লেপটে থাকল।

পায়ের শব্দে বোঝা গেল মা উঠান পেরিয়ে দাওয়ায় উঠল। ওখানে বুড়ি শাশুড়ি বসেছিল। চোখে কম দেখে।

—কে বটে?

—মা, আমি, আপনার বেটার বউ। ফিরে এলম!

—অ, বউমা। এসো এসো বাছা। তিন বচ্ছর তোমার পথের দিকে চেয়ে আছি।

হাতের পুঁটুলি আর কোলের বাচ্চাটা শাশুড়ির পায়ের কাছে নামিয়ে বলল, তা এখেনে সবাই ভাল তো? ওরা কোথায়?

—কে দুগ্‌গা? এইতো এট্টু আগেও ছিল। কোন বাঁগে গেল ফের। ও দুগ্‌গা। দেইখে যা। তোর মা এয়েছে।

—আস্‌লাম?

—অ তোমার বেটা? ওতো মোরলদের ঠাঁই বাগাল খাটতে লেগেছে। গেল মাস থেকে। গরু বেঁধে জাবনা দিয়ে আসতে আসতে আকাশে তারা ফুট্যে যায়।

এরমধ্যে বাচ্চাটা ওঁয়া ওঁয়া করে উঠতে বুড়ি চমকে উঠে বলল, ইটা আবার কে বটে?

—আপনার নাতি।

বুড়ি দুহাতে সাপটে বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিল।

—নতুন মানুষ গ। চোখেও দেখিনা। ও ও কান্দে না। পায়ের গোড়াকে রেখেছ আর আমি ভাবি কি বটে। টোপলা হবে বা। তা মান্‌ষের বাচ্চা ঠিক বুঝেছে অনাদর হল। ঠানমা কোলেও নিলনা।

দুর্গার মা ততক্ষণে হেঁসেল ঘরে ঢুকে মেয়েকে দেখতে পেল। মুখ গোঁজ করে পিছন ফিরে রয়েছে। হাত ধরে টানতে ঝপ ঝপ করে কেঁদে ফেলল—মা না ছাই। এদ্দিন বাদে এলে। যদি মইরে যেতম তো ফিরে এসে দেখতে পেতে?—তুই কত বড় হয়েছিস দুগ্‌গা। ঢেঙা আর পাতল। চল্যে এলম। একেবারে। হঁা ঠিক। এখানেই থাকব। আর যাবনা, দুর্গা চোখ মুছে বলল, সত্যি?

—সত্যি। আয় তোর ভাই দেখাই। পাঞ্জাবী। ওর নাম জার্ণাইল। ত'র জন্য শালোয়ার কামিজ এনেছি। আর চাঁদির পায়েল। ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম যে

গোড়ালির মাপ এই হবে। আর দেখ আস্‌লামের জন্য ফুলপ্যান্ট। হবেনা? দুর্গা মাথা নেড়ে বলল, মনে হয় হবে। ভাই এতটাই ঢেঙা হয়েছে বটে। এই আমার কাঁধ ছোঁয়া।

—তবে ঠিক হয়ে যাবে। তিন বছর চোখে না দেখলেও মনে মনে দেখেছি। মাসে মাসে ঠিকমতো মনিওডার পেয়েছিলি কিনা?

—হুঁ দেড়শ টাকা। এ মাসেরটা ডাক পিয়ন এখনো দে যায়নি।

—আমিই তো এসে গেলম।

বুড়ি দুয়ারে বসে শুনছিল। বলল, জিনিসের দাম বেড়েছে গ। দেড়শ টাকায় আর চলে না। না পেরে আসলাম কাজে লেগে গেল।

—এবার কাজ ছাড়িয়ে দেব। ইস্কুলে পড়বে। বড় হয়ে মিলিটারি হবে। পাম্প কিনবে। টিলার কিনবে। তোর ভাই জার্ণাইলের বাবা আগে মিলিটারি ছিল। লোকটা বড় ভাল ছিলরে। আস্‌লামের বাবার মতো টাকা নিয়ে খিচমিচ করত না। জার্ণাইল পেটে আসার পর রেজিষ্টি করে আমাকে বিয়ে করেছিল। ভাগ্যি করেছিল। নয়তো পেনশন পেতাম না। মাসে সাতশ টাকা। আমাদের চলে যাবে বটে কোনওরকমে। পোড়া পেটের জন্য আর কোথাও কারো সঙ্গ ধরে যেতে হবে না। মরা মানুষটার আর কিছুতে হাত দিতে দিলনা ওরা। পেনশনটা পেলাম। ওর বড় ভয় ছিল খালিস্তানীরা কবে খুন করবে। আগেভাগে আপিসের কাগজপত্রে বউ বলে আমার নামটা লিখিয়ে দিয়েছিল। এখানকার ঠিকানা দিয়ে বই করে এনেছি। মাসে একবার বাঙ্‌রো গিয়ে টাকা তুলে আনলেই চলবে।

এসব ব্যাপারে মা মেয়েতে আলোচনা খুব সহজ ভাবেই চলল। শাশুড়ি একটু দূরে বসে সবই শুনল। কোনও ভাবান্তর হল না। কেননা এতো বেঁচে থাকার ব্যাপার। সংসার প্রতিপালনের এই প্রক্রিয়ায় সকলেরই কিছু কিছু ভূমিকা আছে। যেমন আস্‌লামের বাবার সঙ্গে দুমকা চলে যাওয়া সময় সাত বছরের দুর্গাকে শাশুড়ির কোলে তুলে দিয়ে বলেছিল,

—মা, আরতো কোনও উপায় নাই। ঘর বৈঠকী হয়ে ভাত জুটবে নাকো। লোকটার সাথে পাকা কথা হয়েছে। মাসে মাসে একশ করে দিবে। দুগ্‌গাকে দেখে রাখবেন। আপনিও সাবধানে থাকবেন। সুযোগ মতো যাব আসব। শাশুড়ি দুর্গাকে বুকে তুলে নিয়ে যথাসাধ্য মার অভাব মিটিয়ে তাকে তেরো বছরের কিশোরী করে তুলেছে। পরিত্যক্ত হয়ে ফিরে এসে কমলা মেয়ের হেফাজতে আস্‌লামকে রেখে আর একবার বিদেশ রওনা হল। এবার হোসিয়ারপুর। যাওয়ার আগে বলে গেল—ওর বাপটা হঠাৎ করে ছেড়ে দিয়ে বড় বিপদে ফেলছে। বড় হয়েছিস মা, ভাইটাকে দেখে রাখিস। মাসে মসে তোর নামে টাকা পাঠাবো। তাই পাঠিয়েছে এতদিন! তবে আগের বার অল্প দূরত্বে ছিল। সুযোগ সুবিধা মতো এসে দু-চার দিন থেকে যেতে পারত। অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর সব চুকিয়ে পাঞ্জাবী ছেলেকে কোলে নিয়ে কমলা এই ফিরে এলো। আর যাবে না। এবার পেনশন।

বুড়ি শাশুড়ি আর সন্তানদের ভাত-কাপড়ের সংস্থানের জন্য যে নারীকে আরও দুজন পুরুষের ঘর করতে হল তার জীবনে বিচিত্র কাহিনী থাকে। বাতাবি ফুলের

গন্ধে মাতাল রাতে যখন দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভ সঞ্চার করে তখন প্রথম স্বামীর আদি স্পর্শের আশ্চর্য যাদুর জন্য তার হৃদয় প্রান্তরের হাওয়ায় হা হা করতে থাকে। স্মৃতি তিনজনের জন্য তিন টুকরো হয়ে ওর সত্বাকে দীর্ণ করেছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এক হাজার কুটিল চোখে দেখেছে। ফেলে আসা সন্তানের জন্য যখন বুকের ভেতর বোবা কান্না জমেছে তখন প্রেম প্রেম খেলতে হয়েছে। কিছু ভাতের জন্য। শাশুড়ি এসব বোঝে। কাজে তার কাছে কমলা কিছুতেই অশুচি হয় না। দুর্গা জানে, আস্‌লাম জানে মা রোজগার করে টাকা পাঠায় কাজেই মার জন্য দীর্ঘ প্রতিক্ষা তাদের অভিমানী করে তোলে কিন্তু কিছুতেই বিরূপ করে না। মমতা মাখা চোখ দুটিতে ওরা কোনও অশ্লীলতার ছায়া দেখে না। এ ছাড়া কমলা আর কি ভাবেই-বা জননী হতে পারত এবং তাদের লালন করতে সক্ষম হত? কোনও কোনও উদাস দুপুরে যখন বহুদূর বিস্তৃত মাঠের তপ্ত বায়ু ফড়িং-এর ডানা সঞ্চালনের মতো দপ দপ করতে থাকে, জলের পাম্পের ঝাঁ ঝাঁ শব্দ যখন শরীরে রক্ত চলাচলের শব্দের অনুরূপ হয়ে ওঠে তখন কমলা নানা ভাবে নিজেকে প্রশ্ন করেছে কোথাও কি পরাশর হাজরা, ফজলুর রহমান এবং দয়াবন্ত সিং এই তিনপুরুষের জন্য ওর কিশোরী কালের কল্পনার সেই দিগ্বিদিক অন্ধ করা প্রণয় আছে? উঁহু কারো জন্য মাছ-ভাত, কারো জন্য গোস্ত-তন্তুরি, কারো জন্য রুটি-তরকা বানিয়ে শাড়ি দুপাট্টা বা কামিজ পড়ে সেজেগুজে রাতের অপেক্ষা করা। বিনিময়ে খাদ্য-বস্ত্র-নিরাপত্তা। এরমধ্যে কোনও জটিলতা নেই। কাজেই পাপ-পুণ্য কিছু নেই। বউ সাজার চাকরি সবাই করে। ওর ক্ষেত্রে পরপর তিনজনের। প্রথমজন জমির লড়াইয়ে জেলে গিয়ে আর ফেরেনি, দ্বিতীয়জন কাঠের কারবারী। যেখানে জঙ্গল ইজারা নেয় তার পাশে কিছুকালের জন্য ঘর বানায় এবং সাময়িক ঘরওয়ালী রাখে। বন শেষ তো সংসারও শেষ। এ ভাবেই একদিন দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গে ওর সম্পর্ক চুকে বুকে গিয়েছিল। তৃতীয়জন সম্পর্কটা স্থায়ী করতে চেয়েছিল। সামান্য সরকারি চাকরি। ছোট্ট এক টুকরো ক্ষেত। পরিত্যক্ত কমলা তখন এক ধাবায় বাসন মাজার কাজ ধরেছিল। সেখানেই আলাপ এবং কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রাকে উঠে নতুন সংসার পাততে চলে যাওয়া। এবার টিকে যেত। কিন্তু লোকটাই টিকল না। খুন হয়ে গেল। ব্যস। এইতো সহজ সরল বৃত্তান্ত। চেহারাটা ওর সত্যি ভাল। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের দেয়ালে টেরাকোটার রাধারানীর মতো। ও চেহারায় ধুলো ময়লা লাগলেও একপশলা বৃষ্টিতে ফটফটে। দাগ থাকে না।

রাতে কমলা রান্না করল। আস্‌লামের প্যান্ট বেশ ফিট করেছে। পায়েল পড়া পা দুর্গা কতবার যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। বুড়ি লুধিয়ানার তুষের চাদর মুড়ে বড় আরামে একটু নাক বের করে ঝাল লঙ্কা দিয়ে মাখা বেগুন পোড়ার ঘ্রাণ নিচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার পর মেঝেতে ঢালা বিছানা। মার পিঠের কাছে আস্‌লাম রহমান। কোলের কাছে জার্ণাইল সিং। আর ছোট্ট নরম শরীরটার পাশে দুর্গা হাজরা। আর এক প্রান্তে প্রথম স্বামীর জননী। পৌষের অল্প অল্প ঠান্ডা। বাইরে চাঁদ। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে জোছনা দেবতাদের রাস্তার মতো ওদের শিয়রের পাশে নেমে এসেছে। আসলাম আর দুর্গা তন্ময় হয়ে শুনছিল শতদ্রু নদী-পাড়ের কথা। হোলা-মহল্লা উৎসবে খোলা তরোয়াল হাতে শত শত যুবক ঘোড়ার পিঠে চেপে কতরকম কসরত

দেখায়। দ্রিম দ্রিম শব্দে বাজনা বাজতে থাকে। মেয়েরা কি করে? মালা ছুঁড়ে দেয়। হাওয়ায় আবির ওড়ে। দয়াবন্ত খুব ভাল ভাঙরা নাচত। দ্রুত ঘুরতে থাকা মানুষের ঘূর্ণি, ছুঁটতে থাকা রঙীন পোশাকের চোখ ধাঁধানো স্রোত কখনও ঢেউয়ের মতো ছলাৎ করে ওঠা। কমলা সত্যি সত্যি এক সোনার মন্দিরে গিয়েছিল। হ্যাঁ। মন্তর-টন্তর নয় রে গানের মধ্যে দিয়ে মানুষ মানুষের সুখ দুঃখের কাছে চলে আসে। কিছু পদ মনে আছে—দুঃখী জনাকে বেদন বেদন/সুখী জনাকে আনন্দ এ/বন বনামেঁ সাঁওয়ল সাঁওয়ল গিরি গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত/সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল/সাগর সাগর গম্ভীর এ।

দুর্গা বলল, সুরটা ভারি মিঠে। আমাকে শিখিয়ে দিয়ো। মনে দুঃখ হলে গাইব।

আস্‌লাম বলল, এ কি দুঃখের গান, দিদি? কতদিন পরে মাকে গাইতে শুনে আমার তো আনন্দ হচ্ছে।

কমলা বলল, ঠিক। এর মানে তুমি দুঃখে সুন্দর সুখে সুন্দর। বনের সবুজ রঙ পাহাড়ের খাড়াই, নদীর স্রোত, সমুদ্রের বিরাট ভাবটার মতো।

বুড়ি শুনছিল। বলল, কি সুন্দর। ওরা কি হিন্দু—না শিখ। তবে এই কথাগুলি কার নয়? টিটোয়ালী মন্দিরের দেয়ালে কেষ্ট ঠাকুরে লীলার কত ছবি। সেখানে যারা যায় তারাই আবার খাজা দেওয়ান চিস্তির মাজারে মানত করে। কি না ছেলে পুলে যেন ভাল থাকে, মাঠ যেন সোনার বরণ গমে ঢেকে যায়। সবইতো ভাল করে বাঁচার জন্য। পাঞ্জাবী লোকটা বাঙ্গালী বউ নিয়ে ভাল করে বাঁচতে চেয়েছিল। পারল না। নিজের খামারে খালিস্তানীদের গুলি খেয়ে ডাঁই করা গমের উপর বুক চেপে পড়ে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল কমলা, গোবিপনির রান্না কর, ফিরে এসে খাব। আর খেল না।

বিবরণের এই জায়গাটায় দুর্গা ফোঁপাচ্ছিল। মা বলল, তবে থাক। রাত হয়েছে। ঘুমা।

আস্‌লাম ক্ষুণ্ণ হল, দিদিটা নরম বটে। যারা আমাদের পাঞ্জাবী বাবাকে গুলি করেছে বড় হয়ে আমি তাদের মারব।

আজ বড় সুখের রাত। ছেলেমেয়েদের কাছে শুয়ে মা পার হয়ে আসা দুঃখের কষ্টের কথাগুলি কত নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারছে। আর কোনও দূর দেশে ভাতের খোঁজে যেতে হবে না। ছাড়াছাড়ি হবে না। না রে কোনও চিন্তা নেই। সব হবে। এখানেই সবাই একসঙ্গে থাকব।

ওরা যখন এইসব গল্প-সল্প করে ঘুমিয়ে পড়ল তখন একশ-দেড়শ বছরের তেঁতুল গাছটার কোটরে পেঁচা বুড়ো আর পেঁচানী বুড়ি জেগে উঠল। যত রাত হয় তত ওদের নজর চোখা হয়। নিঝুম দুনিয়াটার আনাচে-কানাচে কে কোথায় আছে, কার গালে চোখের জলের দাগ মরা নদীটির মতো শুকিয়ে আছে, কার ঘুমন্ত ঠোঁটের ভাজে এক চিলতে হাসি আটক পেয়েছে সব দেখতে পায়। পেঁচানী বলল, ভূতভুতুম। আজকের বৃত্তান্ত কি? পেঁচা জবাব দিল, কমলা ফিরেছে। কোলে গেঁদা

বাচ্চা। এটা শিখ, আগেরটা মুসলমান, প্রথমটা হিন্দু। পেঁচানী আবার ভূতভুতুম করল, ওসব বুঝতে নারছি। তার মানে কি ওরা ভেন্ন ভেন্ন রঙের বুকের দুধ খেয়েছে? না। কমলার বুকের দুধ তিনবারই শাদা ছিল। ওদের তিনজনেরই চুল কালো। একই রকম মায়া লাগা ঘ্রাণ। এখান থেকেই পাচ্ছি।

আমিও দেখতে পাচ্ছি আস্‌লাম মার গলা জড়িয়ে শুয়েছে। দুর্গার কোল চেপে ছোট্ট ভাইটার কুসুম কুসুম নরম শরীরটা। বুড়ির ঘুম খুব পাতলা। হঠাৎ ভেঙে গিয়েও একটু ঘোরে পড়েছে। মনে করছে যেন পঞ্চাশ ষাট বছর আগেকার বউটি। ছেলে খেলতে খেলতে পিছল ডোবার কিনারে চলে গেছে। এই ধর ধর। কমলা জেগে উঠে বলল, কি হল মা? কিছু নয়তো। কু স্বপন।

প্যাঁচা বলল, বুড়ির জীবনটাই এ রকম কু স্বপনের ঘোরে কেটে গেল। ছেলে মেয়ে মা ওরা দেখছে সু-স্বপন। আজ রাতে। একসঙ্গে থাকবে। পেট ভরে ভাত খাবে। দুর্গার বিয়ে হবে। ওই যে রাস্তাটা ডান দিকে বাঁক নিয়েছে তার মাথার বাড়ির কৈলাশ নামে ছেলেটার মতো সুন্দর বর হবে এই সু-স্বপন। ফলবে?

উঁহু। ওদের বাকুলের পাশের জমিটা সোহরাব মুন্সীর। ধানকল করবে। কিন্তু মাপে কম পড়েছে। বুড়ির বাকুলের অর্ধেকটা পেলে হয়ে যায়। কিন্তু তার একটাই উপায়। দশদিন আগে সদানন্দ ঠাকুর ভেজা শাড়িতে ফুটে ওঠা দুর্গার শরীর দেখে জ্বলতে লেগেছে। বউ মরেছে। ছেলেরা বিদেশে। এই বয়সে সেবা যত্ন করার জন্য একটা নধর নরম মেয়ে চাই। দুর্গাকে কাজে লাগাবার একটাই উপায়। সেই উপায়টার কথা ভেবে একটু আগে সোহরাব আর সদানন্দ জাত হারানো কমলার ফিরে আসা নিয়ে আলোচনা শেষ করল। কি ভয়ানক পাপ। মরলে ছেলেরা কবর দেবে না পোড়াবে? কি বলগো? যা হোক একটা ধর্ম না থাকলে সমাজ থাকে? এই যে আকাশের পাণি নেই, মাঠে থোর আসা ধান লালচে হতে লেগেছে, এসব খোদার গজাব। তওবা, আস্তাক ফেরেল্লা। বটেইতো। স্ব ধর্মে নিধনং শ্রেয়। মাগীর পাপে রাজ্য নাশ। সবাইকে ডেকে ডুকে বসাও হে কাল। এমন মোটা টাকা ফাইন করে দেব যে বাড়ি ঘর বেচতে মাগী আমাদের কাছেই ছুটে আসবে।

—ভূতভুতুম, ভূতভুতুম, হায় হায়

—উঁহু উঁহু পেচানী, আর একটু আছে। জমায়েত বসবে। সব ঠিকঠাক কিছুদূর এগুবে। তারপর

—তারপর কি? তারপর কি?

—সবাই জানে কৈলাশের ভাই বীরেন হুড়কা ছোকরা। মিটিং-এর মধ্যে লাফিয়ে উঠবে—খবরদার। দুর্গা আমার দাদার বউ হবে কথা হয়ে আছে। তাদের নিয়ে কথা বলা চলবে না। সে হলে আমাদের ঘরে অপমান। কেউ মুখ খারাপ করলে জিব ছিঁড়ে নেব। আরেব্বাস পেঁচানী এরপর কি ভয়ানক ধুমধারাক্কা লেগে যাবে। সবাই মিলে কৈলাশকে চেপে ধরবে। কৈলাশ ঘাবড়ে গিয়ে বলে বসবে, ও সব পুরনো কথা। এখানে বসে গণিমান্যি পাঁচজনের হুকুম অমান্য করি কি করে?

বীরেন বলবে, তবে নতুন কথাটা বলছি। দুর্গা যদি চায় তো ওকে আমি বিয়ে করব। কি দুর্গা আমার বউ হবি?

পটের বেহস্ত, দোজখ

কালাচাঁদ ওরফে কলিম পটুয়া দৃশ্যটা দেখেই চমকে উঠল। ওর আঁকা ময়নামতি কখন জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে রেল-লাইনের পাশের জলায় ভ্যাট তুলেছে। ভ্যাট এক ধরনের জলজ ফল। গরিব মানুষেরা খোলায় ভেজে বা পুড়িয়ে খায়। কিন্তু ময়নামতি কি গরিব? পটের ময়নামতি তো রাজার বেটি। অবশ্য শনিঠাকুরের কু-নজরে বনে যেতে হয়েছিল। সেখানেও কি হেনস্থা। গোদা যম এলো ঘুমের মধ্যে জীউ চুরী করতে। শেষে কিন্তু ভালটাই জেতে। ময়নামতির কাছে ছিল মন্ত্রপড়া সোনার ছুরি। পিছু পিছু ছুরি ধায় গোদা যায় আগে। শনির আড়ালে গিয়ে লুকাইয়ে থাকে। শনিকে তাড়ায় ছুরি ভয়ে শনি ভাগে। বাঁচাও বাঁচাও বলে কন্যাকে ডাকে। তা এ কাহিনীটাই এবার এঁকেছে কালাচাঁদ। যাবে গঙ্গাদশেরার মেলায়। চৈত্র মাসের চড়া রোদে চাঁদি ফেটে যাওয়ার অবস্থা। রেল-লাইনের ধারে গাছের ছায়ায় একটু জিরুতে বসে এ কি দেখল। মনে মনে ভেবে নিয়ে আঁকা ময়নামতির মতোই টানা টানা চোখ। কানের পেছন বেয়ে লাউ লতার মতো ঝাপিয়ে নামা গালের দু'পাশে দু'গোছা চুল। এমন কি থুতনির তিলটা পর্যন্ত এক। পটের ময়নামতি গলা পর্যন্ত জলের মধ্যে ডুবে ও-পারের ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে দেখতে পায়নি। কালাচাঁদ জলের ঠান্ডা হাওয়াতেও ঘামতে আরম্ভ করল। যুবতীর ব্যাপার, কি জানি কার পথ চেয়ে আছে। লুকিয়ে দেখলে গোনাহ্ হবে। ঝোলা আস্তে করে কাঁধে তুলে নিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় ঝোপের আড়ালে পায়ের শব্দ শোনা গেল তারপর 'মা' বলে ছোট্ট একটা ডাক। পটের ময়নামতি জল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে শাড়ি নিঙরে এগিয়ে গেল। আট-ন বছরের স্কুলের ছেলে (বইয়ের ব্যাগ দেখলেই বোঝা যায়) রোদে টকটকে লাল মুখ। এসেই আঁচল টেনে নিয়ে মুছে আবার বলল, মা।

—কাল আসিস নি কেন নুরু?

—বা রে কাল স্কুল ছিল? রোববার না?

—সকালে নাস্তা করেছিস?

—দুধ চিড়া। মা ইস্কুলে পাউরুটি দিয়েছে। তোমার জন্য এনেছি।

—তুই খা।

—না। নেও না মা। না নিলে আমি পানিতে ফেলে দেব।

—খ্যাপা ছেলে। আচ্ছা দে। এখন যা, দেরী হলে তোর বাপ ফের সন্দেহ করবে।

কালাচাঁদ দেখল পটের ময়নামতির একটা পড়ুয়া ছেলে আছে। ভদ্দর লোকের বাচ্চাদের মতো পোশাক পড়ে স্কুলে যায়। ভ্যাট তুলুনী কাদামাখা, ছেঁড়া আঁচলে

গিঁঠ দেওয়া মার জন্য স্কুল থেকে পাওয়া পাউরুটি এনে দেয়। তারপর দুজন দুদিকে চলে যায়। ময়নামতির যে কাহিনীটা বাপ মহিউদ্দীন ওরফে মহিম এবং মা আমিনা ওরফে আমলার কাছে শুনেছে তাতে কোনও ছেলের কথা নেই। কাজেই এই সুন্দর ছেলেটাকে পটের কোথায় কি ভাবে ঢোকানো যায় সেটাই ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। আল্লার আরসের নীচে কত কি ঘটে। রেল-লাইনের জলার ধারে চৈত্রের ঝাঁ ঝাঁ করা বেলা দশটায় মউলে ছেয়ে যাওয়া একটা জিগা গাছের নীচে মা-ছেলের রুটি বিনিময়ের এই তসবিরটা ও গড়বে। দৃশ্যটা বাবলার কাঁটার মতো ওর চোখের ভেতর গেঁথে গেছে। কলিজার ওপর তারই রক্ত ঝরছে টপটপ। পটুয়াদের এ রকম যন্ত্রণা যত হয় তত ভালো তসবির এসে যায়। এবার ঝোলা ঝামটা নিয়ে উঠে দাঁড়ানো মাত্র ঝাঁ ঝাঁ একটা শব্দ পেল বহু দূরের ঝড়ের মতো। ঝড় কোথায়? আকাশ ফিট পরিস্কার। তবে কি এই শব্দটা ওর নিজের ভেতর থেকে উঠে আসছে? যাঃ বাবা, এতক্ষণ একটা ভাবনায় এমন ডুবে ছিল যে খেয়াল করেনি কাছে রেল-লাইন। আওয়াজটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মাটি কাঁপতে লেগেছে। হুড়মুড় করে দানোর মতো ইঞ্জিন ছুটে গেল। পেছনে একটার-পর-একটা বগি। এত লোক কাঁহা কাঁহা মুলুকে যায়। মল্লিক মাস্টারের কাছে শুনছে এই দুনিয়াটা এক জনমে কেউ ঘুরে শেষ করতে পারবে না। এত বিশাল। বাবা বর্দ্ধমান শহরের ওপারে যায়নি কখনো। ও অবশ্য কোলকাতা ঘুরে এসেছে একবার। দিল্লি তার চেয়েও দূরে। আরও দূরে বিলেত। ওখানে সাহেবরা থাকে। ওরা এক সময় এদেশের রাজা ছিল। ওদের এক পূর্বপুরুষকে সাহেবরা ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ডাঙা জমির ওপর টেনে হিঁচড়ে ছুটিয়ে ছাল ছাড়ানো মাংসের দলা করে দিয়েছিল। তিনি নীল বাঁদরের পট এঁকে গাঁয়ে গাঁয়ে দেখিয়েছিলেন। এটাই অপরাধ, ছোটরা যখন আঁকায় হাতে খড়ি নেয় তখন মায়েরা পুরনো পট খুলে আঁকার কায়দা-কানুন দেখায়। বেত্তান্ত শেখায়। তারপর এক সুনসান রাতে জানালা-দরজায় আগল দিয়ে টেমির লালচে আলোয় নীল বাঁদরের পটটা ঘুম ভাঙানো চোখের নীচে মেলে ধরে। ধনদৌলত পটুয়াদের থাকে না। তবে এরকম গর্বের দু-একটা জিনিস থেকে যায়। পটটা কয়েক পুরুষ ধরে গোপনে ওরা রক্ষা করে এসেছে। কালাচাঁদ কতদিন ভেবেছে এ রকম একটা কিছু করে যাবে। সেই না করা ছবির টুকরো টাকরা মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দেখা দিয়ে যায়। এই যেমন আজকে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পটুয়া রায়চকে পৌঁছে গেল। নয়নচাঁদের বুড়িমা যেন ওর জন্যই পথ চেয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকল, ও কালী পোটো, আয় বাবা আয়। কখন থেকে এক ঠেঞে দাঁড়িয়ে আছি। মেলা পানে এ পথ দিয়েই তো যাবি। তখন তোকে ডেকে নিয়ে পট দেখে বেত্তান্ত শুনে মুখে জল দেব ভেবেছি। কাল আমার তিলমঞ্জরি ব্রতের ওপোস ছিল রে। পটুয়া একগাল হেসে এগিয়ে গেল, হ্যাঁ পিসি, সেই মনে করেই পা চালিয়ে আসছি। গেলবারওতো শুনিয়ে গেছলাম।

—তা বটে। আর আগের বার তোর বাপ শুনিয়ে গিয়েছিল। আহা মহি বড় ভাল লোক ছিল। দিদি বলে প্রাণ ভরে ডাক দিয়ে দাঁড়ালে নেউলের বউ বলত মা তোমার বাপের ঘরের লোক এয়েছে।

—জলের গারু আনো পিসি। ছিটিয়ে ভুঁই শুদ্ধ করে নি। বুড়ি খুব ব্যস্ত হয়ে বলল, না বাবা এখানে না। নাছ দোরে চল। মানুষের মন ভাল নাই। কে কোথাকে কি টুকবে। তার চে একা শুনব। বার বছরের ব্রত। আর একটা রইল।

পটুয়া একটু আশ্চর্য হল। পট দেখাবার সময় মেয়ে-বউ কচি কাঁচারা আসে। গামছা বিছিয়ে দিলে এদিক ওদিক থেকে দশ-বিশ পয়সা পড়ে। যে ডাকে সে দেয় চাল কলার ভুজ্জি। পয়সাগুলি উপরি আয়। আশেপাশের গাঁ ঘরে পটুয়াদের এ আর একরকম চাহিদা। ঠাকুর দেবতার পট দেখে বেত্তান্ত শুনে ব্রতের উপাস ভাঙে। কবে কিভাবে মানুষের বিশ্বাস পটকে আশ্রয় করেছে কে জানে। তবে পটের রঙ আর মাধ্যম যেমন খুব সহজ সরল, উঠোনের বেড়াটার এদিক ওদিক খুঁজলেই পাওয়া যায়, এই যেমন শিউলির বোঁটা, হলুদ, পুঁইয়ের গোটা আর রেশমা ডাঙার মাটি সঙ্গে কাঁই বিজ সিজনো জল, তেমন তার ভাবটাও সহজিয়া। চোখের ভেতর দিয়ে সোজা কলজেতে ঢুকে যায়। চেনা-জানার রীত কি না খোলা মেলা। কিন্তু বুড়ি আজ পোটোকে ডেকে আড়ালে বেত্তান্ত শুনছে। তিল পুষ্পের কাহিনী। চৈত্র মাসের মাঠ ভরা তিল ফুল। চাঁদনি রাতের দামোদরের ঢেউয়ের উপর ফেনার মতো ঝিকিমিকি। লক্ষ্মী নামে বউটির সাজতে মন গেল।

নারায়ণ বলল, ছিঁড় না। কোথায় মালিক ঘাপটি মেরে বসে আছে।

লক্ষ্মী বলল, এক গোছা তো নেব মোটে। সোনা নেই রুপা নেই কুশুমে সাজলে রূপ ফেটে পড়বে।

—তবু নিয়োনা।

লক্ষ্মী শুনল না ফুলে সাজতে গিয়ে মালিকের হাতে ধরা পড়ল। সাজা হল বার বছর দাসীবৃত্তি। আহা চোখের জলে দিন যায়। রাঁধে-বাড়ে-খাওয়ায় আর নিজে দুমুঠো ভাত না খেয়ে জমায়। মুক্তিপণ দিতে হবে যে। ফুলের ঋণে মালিক মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। সেদিন গঙ্গা দশেরার উৎসব। সবাই গেছে মেলায়। লক্ষ্মী একা একা শেষ দিনের সব কাজ সেরে রাঙা পাড় শাড়িটা পড়ে নারায়ণের কুটিরের দিকে পা বাড়াল। যাওয়ার বেলা হাঁক দিয়ে গেল, কে কোথায় আছ গো বলে দিয়ো, আজ আমার মুক্তি। নিত্যি ওপোসের ভাত কটা পুঁতে রেখেছি ডালিম তলায়। এতদিনে সোনা হয়ে গেছে। তুলে যেন পণ শুধে নেয়।

মজুরী এক কাঠা চাল আর একটা বেগুন। একে সিধে বলে। গামছায় বেঁধে তোলার সময় বুড়ি প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, তোরা নাকি বিদেশি?

কালাচাঁদ ওরফে কলিমুদ্দিন পটুয়া খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, তার মানে কি পিসি?

—সেটাই তো শুধুচ্ছি। পাটনা থেকে এক শনি ঠাকুর এসেছে। কয়েকটা ছোকরা জুটিয়ে খুব হুরুম-দুরুম লাগিয়েছে। কাল বক্তিমে দিল, হিন্দুস্থান শুধু হিন্দুদের। আর সব বিদেশি। গরম গরম কথা বলে সবাইকে তাতিয়ে মন্দির বানাবার টাকা চাইল। ভক্তি ভালোবাসার কথা নয় কেবল মার আর কাট। তুই আমার ভাইপো বলে এতগুলি কথা বললাম।

কি বলবে পটুয়া? বাবা বলত আমার রায়চকের দিদি। সেই সুবাদে ওর পিসি। কত শতাব্দী ধরে এরকম সম্পর্ক চলে আসছে। পটুয়ারা ঠাকুর দেবতার পট গড়ে আবার মসজিদেও যায়। নামও থাকে দুটো করে; যে কলিমুদ্দিন সেই কালাচাঁদ। কলিমুদ্দিন বা মহিউদ্দিন পছন্দ না হলে কালাচাঁদ বা মহিম বলে ডাক না কেন?

—হঠাৎ করে বিদেশি হব কেন পিসি? বাপ পিতেমর দশ পুরুষের হাড় এই মাটিতে আছে না?

—তাই তো বলি বাবা। তবু তুই রাত বিরেতে একা একা চলাফেরা করিস না। সাবধানের মার নেই।

—আমার জন্য ভেবনা পিসি। সম্পর্কটা চিরকালের। ও সব দু'দিনের। সেই ময়নামতির বেত্তান্তে আছে না পিসি, লোকের মন্দ করতে গিয়ে শনি ঠাকুর তাড়া খেয়ে দৌড় লাগায়?

এদিকেও যে আর এক শনির নজর পড়েছে দু'দিনেই টের পেল কলিমুদ্দিন ওরফে কালাচাঁদ পটুয়া। এমনিতে বিবির ঘুম খুব গাঢ়। বালিশে মাথা রাখলেই অচেতন। এ নিয়ে ওর মনে কিছু অনুযোগ আছে। অথচ সে রাতে কিছুতেই বানুর ঘুম আসছিল না। কিছুক্ষণ এ পাশ করে উঠে বসল। কলিমুদ্দিন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হল তোর?

—ডর লাগছে।

—কেন?

—আমাদের নাকি কেটে ফেলাবে?

—দূর খেপী, খামোকা আমাদের কাটবে কেন? কে কাটবে? কোন দৌলত আছে যে ডাকাত পড়বে?

—না গো ভাল লোক বলেছে।

—কে সে ভাল লোক?

—ওমা তুমি জানো না! আলিগর থেকে এক বুজুর্গ মৌলানা এসে মিটিন করে গেছে।

কলিমুদ্দিন চিন্তায় পড়ল। এদিকেও তা হলে বাইরে থেকে সন্দেহ অবিশ্বাসের বিষ ছড়াবার লোক এসে গেছে। এত কালের শান্ত গ্রাম ঘর ভেতরে ভেতরে অশান্ত হয়ে উঠছে। বানুকে বলল, ভালই হল। ঘুম আসছে না যখন আয় একটা তসবির গড়ি। দুজনে মুখোমুখি বসল। বানু রঙ গুলে দেয়, তুলি ধুয়ে দেয় আর পটুয়া একটু

একটু করে ময়নামতির নতুন পট গড়ে তোলে। রাত গাঢ় হতে থাকে। নদীর পাড়ে প্রহর ডাকছে শেয়াল। অন্ধকারে জোনাকিগুলি যেন তুলির টানের ঝিকিমিকি রেখায় ছোটাছুটি করে। একবার সেই দিকে তাকিয়ে কলিমুদ্দিন ভাবল ভোরে ছবিটা স্পষ্ট হবে। বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা মানুষের সুখ-দুঃখ — সব। পটের দিকে তাকিয়ে বানু দেখল ঘুমন্ত ময়নামতির কোলের কাছে একটা ছেলে।

—একি আঁকলে গো? ময়নামতির ছেলে?

—দেখতে ছেলে আসলে ওটা ওর জীউ।

—জীউ তো আগুনের গোলার মতো সীনার ভেতর থাকে।

—হাঁ বাইরে এলে ছেলে হয়ে যায়। তোর বেটা হলে বুঝবি জীউ মানে কি।

তারপর আঁকল গোদা যম। পটের নীচে আঁকল ময়নামতির পায়ের কাছে নতজানু শনি। এই তসবিরটা দেখে বানু খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল—কেমন শাস্তি। তারপর পটুয়ার কোলে মাথা রেখে গভীর ঘুমে জুড়িয়ে গেল।

পরদিন মাদ্রাসার জলুস ডাকা হয়েছিল। নামাজের পর আলোচনা উঠল। মৌলানা বসিরুদ্দিন বললেন—বেরাদরানে ইসলাম, কিতাবে আছে খোদার গজব নামলে দুনিয়া গুনাগারিতে ভরে যায়। নামাজ নেই, রোজা নেই, হজ নেই, জাকাত নেই, ছেলে বাপকে মানে না, তালাকী আওরত স্বামীর নামে খোরপোষের মামলা করে। এই গ্রামের কেউ কেউ আছে হিন্দু-দেব-দেবীর তসবির গড়ে। তওবা, আস্তাক ফেরুল্লা। ইসলাম বিপন্ন। আজ এখানে পারুল্যের সোহরাব সাহেব শামিল হয়েছেন। তিনি মুসলিম নেতা। প্রতিকারের উপায় হাসিল করবেন।

কলিমুদ্দিন শুনতে শুনতে ভাবছিল নেতা যখন শেষমেষ ভোটের কথা উঠবে। তবে পারুল্যে তো রায়চকের আগের গাঁ। ওই যেখানে রেল-লাইনের ধারের জলায় তসবিরের ময়নামতি ভ্যাট তুলছিল। নেতা হলেও সোহরাব সাহেবের বয়স অল্প। দেশের রাজনীতি হিন্দু-মুসলমান কত কথা তিনি বললেন। লোক চুপ করে আছে বটে আসলে নিজের নিজের কথা ভাবছে। ওই তো আমানুল্লা। তিন বেটা বিবি নিয়ে সংসার। যেদিন কাজ জোটেতো দুটি খায় নয়তো উপোস। এইসব কথা দিয়ে ওর কি হবে? বেশিরভাগ লোকের কি হবে? সোহরাব বলতে বলতে নিজের উদাহরণ দিচ্ছিল বারবার—ভাইসব, ধর্মের জন্য কঠোর হতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের ধর্মে হাত দিয়েছে। তালাকী বউয়ের খোরপোষ মঞ্জুর করেছে। ইসলামে তিন তালাক উচ্চারণ করলেই বিবি পর হয়ে যায়। তার মুখ দেখাও তখন গোনাহ্। যার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না তার আবার খোরপোষ কি? এ সব রুখতে হবে। লোকে ধর্মের পথ থেকে সরে গেলে জোর করে ফেরাতে হবে। এখানে পটুয়ারা আছে।

শুনেছি এ গাঁয়ের অর্ধেক পটুয়াদের ঘর ছিল। এখন তিন ঘর। খোদার গজবে তাই হয়।

কলিমুদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কিসের গজব সাহেব? সোহরাব সাহেব অর্ধনিমিলিত চোখে চাইলেন—অঃ। তোমাদের নাকি একটা করে হিন্দু নামও থাকে।

—হ্যাঁ। পটুয়াদের দুটো করে নাম থাকে একটা হিন্দু একটা মুসলমান।

—কিসের তসবির গড়?

—রাম-রাবণের যুদ্ধ, বিজয়-বসন্ত, সাবিত্রী-সত্যবান।

হাজি সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, দোজখের ভয় করে না? কিতাবের হুকুম জান?

—পট ছাড়লে খাব কি? আপনি খেতে দেবেন?

আর হাজি সাহেব বজ্রপাতের আগের আকাশের মতো থমথমে হয়ে গেলেন। আমানুল্লা কিছু না বুঝে চিৎকার করে উঠল, হক কথা।

হাজি সাহেব নরম গলায় বললেন, অন্য পট আঁকতে পার না? পাপ-পুণ্যের, বেহেস্ত-দোজখের?

কলিমুদ্দিন হাসল, তাইতো আঁকি। দেখবেন? এইসব আলেম মুসলিমদের কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঝোলা থেকে বের করল বানু আর ও রাত জেগে যে পটটা এঁকেছিল, সেটা। কলিমুদ্দিন ছবিটা মেলে ধরা মাত্র কাদামাখা, ভ্যাট কুড়ুনী ময়নামতি আর তার কোলের কাছে ঘাসের ওপর ঘুমন্ত ছেলেকে আর জীউ চুরি করতে আসা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ানো গোদা যমকে দেখে ভয়ানক গর্জন করে উঠলেন রক্ত মাংসের গোদা যম অর্থাৎ সোহরাব সাহেব। ও-পাশে কাতার দেওয়া গরিব-গুর্বো লোকগুলি ফের একটা গোনাহ্ করে বসল। গোল করে ঘিরে দাঁড়ালো। জলুসের নিয়ম ভেঙে নানা মন্তব্যের গুঞ্জন তুলল।

সোহরাব সাহেব দেখলেন তার তালাক দেওয়া বিবির সঙ্গে পটের ময়নামতির আশ্চর্য মিল, এমন কি সন্তানের, এমন কি নিজের। বিচলিত হয়ে হাঁটু কাঁপছিল।

কলিমুদ্দিন অল্প অল্প হাসছিল।

—কি দেখছেন সাহেব? পাপ-পুণ্যের চেহারাটা? আপনাদের কিতাবে কি আছে জানি না। আমি মূর্খ পটুয়া। তবে আমাদের তসবিরেতে এ রকমই উঠে আসে।

যুধিষ্ঠিরের কুকুর

যুধিষ্ঠিরের কুকুর দুজন পুলিশকে কামড় দেওয়ার পর ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হলো। কুকুর ও মানুষের সম্পর্ক মহাভারতের যুগের এমনকি তারও আগের। এবিষয়ে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির বিদগ্ধ চেয়ারম্যান বলছিলেন, আদিতে এক জোড়া বুনো কুকুর গুহাবাসী মানব-মানবীর নৈশভোজের আসরে ঝলসানো মাংসের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে হাজির হয়েছিল। গুহার মুখে আগুন। কষ্টি পাথরের পাহাড় নিকষ কালো। তার গায়ে দপদপানো আগুনের আভা থেকে সোনা ঘষে দিচ্ছিল। অন্ধকারে কালো কুকুর দুটিকে দেখা যাচ্ছিল না। কেবল তাদের চার চোখে চার টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার। কুকুর দম্পতি ফেলে দেয়া হাড়গোড় খেয়ে লেজ নেড়েছিল। হ্যাঁ। ক্রমে পোষ মেনে গিয়েছিল। কয়েকশ মাইল ভূ-সম্পত্তির নিদারুণ দরিদ্র মালিক-মালকানী দেখেছিল এ রকম জানোয়ার ওদের সঙ্গে খাদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। কাজেই কোনও ক্ষতি করে না বরং অন্য বদমেজাজী জানোয়ারদের তাড়িয়ে দেয়। তবে কিনা পাগল হলে মুশকিল।

স্যানটারি ইন্সপেক্টার হোসেন বললেন, এন্টির‍্যাবিট ইন্‌জেকশন। নাভি ঘিরে। আগের কোর্স ছিল চৌদ্দ। বর্তমানে—

চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ হোসেন তখন কোথায় ছিলে তুমি আর এই পুলিশ দুটি? সেই আদিম কালে?

হোসেন সাহেব সামলে নিয়ে বললেন, ইয়েস স্যার, তখন আমি এখানে ছিলাম না। আমার পড়াশুনা কোলকাতায়।

আমি অর্ডারের ডিক্টেশন নিতে নিতে ভাবছিলাম, লোকটার নাম যুধিষ্ঠির। আশ্চর্য। তার আবার ভক্ত কুকুর। এ যুধিষ্ঠির অবশ্য একালের। উপাধি সহ পুরো নাম যুধিষ্ঠির কাহার। যদি প্রশ্ন করা যায় যুধিষ্ঠির তুমি কাহার। উত্তর—কুকুরের। মহাভাতের কাল থেকে এ পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছে নাকি? যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুর স্বর্গে গিয়েছিল। তার মানে নরক দর্শনের সময়ও কুকুরটা নরকে গিয়েছিল। যা হোক চেয়ারম্যান সাহেবের হুকুম হয়ে গেল — কনজারভেন্সির চারজন তাগড়া ডোম জেলখানার গেটে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে কুকুরটাকে মারবে। হত্যার রিপোর্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চাই।

অভিযান শুরু হল সকাল ছ'টায়। ময়লা ফেলা গাড়িতে চেপে জেলখানার মুখোমুখি কালীর থানের পাশে নেমে এলো বাচ্চাই, বিশু, সোমবারী ও নকুল ডোম। কনজারভেন্সি সুপারভাইজার আসেননি। যদিও গোটা ব্যাপারটা তিনি পরিচালনা করছেন। ফিরে গিয়ে মুর্দা দেখিয়ে নিতে বলেছেন। তা হলেই হবে। কুকুরদের

ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে কিছু আছে কিনা কে জানে। এ শহরে কিন্তু কুকুর মারা গ্যাং বেরুনো মাত্র সারমেয়-সমাজে কারফিউ জারি হয়ে যায়। কি করে যেন আসন্ন বিপদ টের পায়। কোথায় যে আত্মগোপন করে। কাজেই জেলখানার ফটকের পাশে, অশ্বত্থতলায়, রাস্তায়, ব্যারাকের পেছন ছাইয়ের গাদায় বা পুলিশ কো-অপারেটিভ স্টোর্সের বারান্দায় ওদের একটাকেও দেখা গেল না। সমস্যা সম্পর্কে গ্যাং-এর চার সদস্য নিজেদের মধ্যে একটু মিটিং করে নিল—

—শালা সব কুত্তা ভাইগাছে। কি করা যায় বে নোকলা?

—ঢুঁইরা দেখতে হইবে। ঢুঁর ঢুঁর। কুত্তা কি লিজে থিকা হামাদের হাতে জান দিতে আইসবে?

—কুণ্ঠে ঢুঁইরবো? ই বাগে উ বাগে তো একটাকেও দেখতে পাইছি না। সুপুরভাই বাবু কহে দিয়াছে উ হারামী কুত্তা ফাটকের লেকট থাকে। দিনরাত। হাঁ। দুদিন দুটা পুলুশকে পাছায় কাইমড়া দিয়াছে।

—তো ওই পুলুশগুলানকে শুধার করি উরা কহিতে পারে।

অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ওরা জেল গেটে গিয়ে রক্ষীদের জিজ্ঞেস করল, হাঁ জি কুত্তাটা কুণ্ঠে? চারজন তাগড়া মানুষকে লাঠি হাতে এগিয়ে আসতে দেখে বন্দুকধারীরা ম্যানুয়াল অনুযায়ী কতটা সতর্ক হতে হবে ভাবছিল। বিশুর প্রশ্নটা বুঝতে একটু সময় নিল।

—কুত্তা?

জি হাঁ পাগলা কুত্তা। যিটা দুটা পুলুশকে কাইমড়া দিয়াছে।

—ওঃ তাই বল। যুধিষ্ঠিরের কুকুর। এইতো একটু আগেও আমাদের দিকে তাকিয়ে কালীর থানের পেছনে পা তুলে মুতছিল। তখনি জানি শালার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। জাগ্রত দেবী সঙ্গে সঙ্গে তোদের পাঠিয়ে দিয়েছে। মারতে পারবি তো?

—হাঁ, হাঁ, ঠাটিয়ে ম্যারে দিব। দেখেন কেনে। কহে দিন কুন দিকে ছুপাই গেল।

—বেশ বেশ। তাইতো ভাবি হঠাৎ দৌড় লাগানো কেন। তাজ্জব জানোয়ার। পুলিশের হাতে বন্দুক দেখে ভয় পায়না, ডোমের হাতে লাঠি দেখে চোঁ-চা দৌড়! ওই দিকে পালাল। মনে হয় জেলখানার পেছনে আছে।

কুকুর মারা গ্যাং দুজন দুজন করে ভাগ হয়ে দুদিকে থেকে শাঁড়াসী আক্রমণ চালাল। অনেক হই হল্লা ছুটোছুটি এবং বিস্তর দর্শক জড়ো করে জেলখানার পেছনে আধ কিলোমিটার দূরে অবশেষে একটা কুকুর মারল। লালচে রঙ। লেংড়া। চেয়ারম্যান খুশি হয়ে বললেন, এরপর একটা বড় অভিযান চালিয়ে এই শহরটাকে বেওয়ারিশ কুত্তার হাত থেকে মুক্ত করব। ভারতের একমাত্র জলাতঙ্কমুক্ত শহরের গৌরব আমাদের চাই। অবশ্য তার আগে কুকুরের লাইসেন্স চালু করতে হবে। তাতে আয় বাড়বে। আচ্ছা হোসেন জলাতঙ্কে সত্যি কি জল দেখে ভয় পায়?

—পাওয়ারই কথা। আমি সবাইকে জল ফুটিয়ে খেতে বলি। এখানকার যতরোগ প্রায় সবই জল থেকে। হিপাটাইটিসের প্রধান দুটো ধরন হল—

চেয়ারম্যান তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন, আঃ হোসেন হচ্ছে জলাতঙ্কের কথা, চলে এলে হিপাটাইটিসে।

আমি ডিকটেশন নিচ্ছিলাম এস. পি-কে, চেয়ারম্যান এতদ্বারা জানিয়ে দিচ্ছেন যে পুলিশলাইন থেকে গ্রীণপার্ক পর্যন্ত আর কোনও পাগলা কুকুর নেই। যুধিষ্ঠিরের কুকুর আজ সকালে নিহত হয়েছে।

লেখা হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কুকুরটা কি সত্যি পাগলা হয়েছিল?

হোসেন সাহেব হাত মুঠ করে টেবিলে পেপার ওয়েটের ওপর রাখলেন এবং সেই দিকে চেয়ে বললেন, অসম্ভব।

চেয়ারম্যান বললেন, অসম্ভব কেন? এমনি এমনি কামড়ে দিল?

—পাগল না হলেও কুকুর কামড়ায়। ওটাকে বেঁধে অবজারভেশনে রাখলে বোঝা যেত খ্যাপা কি না। প্রথম পুলিশকে কামড় দিল তিন তারিখ। ঠিক?

—তাতে কি হয়েছে?

—দ্বিতীয় পুলিশকে কামড়াল চব্বিশে। কুকুরটা নিহত হল আজ সাতাশে। তাও পাউরুটির টোপ ফেলে। খেতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পাগল হলে এতদিন বাঁচে, না খায়?

চেয়ারম্যান বললেন, পুলিশ হতে হলে তো ডাক্তারি পড়তে হয় না। ওরা পাগলা কুকুর বলে উল্লেখ করেছে অতএব আইনত পাগল। আমরা সেই অনুসরে পাগল ধরে নিয়ে মেরেছি। মানেকা গান্ধীর সার্কুলার অনুযায়ী সুস্থ কুকুর মারলে পুলিশ কেস হয় তা জানো?

—এ ক্ষেত্রে পুলিশ কেস দেবে না, তাইতো? পুলিশ যা করবে সেটাই ঠিক? যুধিষ্ঠিরকে ধরে রেখেছে সেটাও ঠিক?

চেয়ারম্যান মাঝে মাঝে খুব স্নেহ-প্রবন হয়ে পড়েন। যেমন এখন। হোসেনের পিঠে হাত রেখে খুব নরম সুরে বললেন, পাগল কোথাকার। সত্যি তুমি, তুমি খুব আজেবাজে ভাব হোসেন। যুধিষ্ঠির তোমার কে আর আমারই-বা কে? সেদিন থেকেই দেখছি যুধিষ্ঠিরের ব্যাপারে খুব মনমরা হয়ে আছ। ছিঃ ভাই এসব মনে রাখতে নেই। রাখলে খিদে কমে যায়, ঘুম কমে যায়। একদম ভুলে যাও।

আমিও দেখেছি ডগরেসের মাঠ থেকে ফিরে এসে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হোসেন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ভুটুর চায়ের দোকানে ঢুকে গুণে গুণে তিন চামচ চিনি খেয়েছিলেন। সাধারণ বিষন্নতায় এক চামচ খান। অধিকতর হলে দু'চামচ। অত্যধিক হলে তিন চামচ। দীর্ঘদিন তাঁর কাছে থেকে ডোজটা জেনে ফেলেছি।

ব্যাপারটা আমিও ভেবেছি। অত বিচলিত হওয়ার কি ছিল? দশ বছর আগে ভি. সি. শর্মা এ জেলার ডিষ্ট্রীক্ট জাজ হয়ে আসেন। তার পর থেকে আমাদের ছোট্ট শহরের রাস্তায় নানা চেহারার বিদেশী কুকুর দেখা দিতে আরম্ভ করে। জজ সাহেবের আশ্চর্য রকমের ছ'টা কুকুর ও সারমেয় বিষয়ে তাক লাগানো জ্ঞান ছিল। তিনি নাকি একবার প্রবীন এ্যাডভোকেট জলধর রায়কে বলেছিলেন, যে লোক কুকুর

ভালবাসেনা সে সবরকম অপরাধ করতে পারে।

এই প্রেরণা থেকেই ডগলাভার্স এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। গোড়া থেকে জলধরবাবু তার সম্পাদক। উকীলবাবুরা এবং তাদের সম্পত্তিবান মক্কেলরা এসোসিয়েশনের সদস্য। আমাদের শহরে তাঁদের উদ্যোগে বছর বছর ডগ-স্পোর্টস হয়ে আসছে। উদ্যোক্তাদের বাড়ির কাজের ছেলেরা, যাদের কোনও খেলাধুলার সুযোগ নেই, তারাও সেদিন ছুটি পেয়ে কুকুরের খেলা দেখতে আসে। বাইরের লোকেদের কাছে আমরা সগৌরবে এ রকম একটা অভিজাত ব্যাপারের উল্লেখ করে থাকি।

এ মাসের প্রথম রোববার তিন তারিখ। ডগ-স্পোর্টস দেখতে আমিও গিয়েছিলাম। নামিদামী কুকুরদের দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার। ঘটনাটা ঘটল শেষ ইভেন্ট পাঁচ হাজার মিটার রেসে। আটটি আলসেসিয়ান, একটি সেন্টবার্নাড, একটি বুল ও দুটি টিবেটান ট্রাকে ছুটছিল। চমৎকার উত্তেজক দৃশ্য। আমি সেন্টবার্নাডের পক্ষে। মনে মনে বললাম হে যীশু ওকেই জিতিয়ে দাও। চমৎকার দিন। মাঠ ঘিরে নানা রঙের পতাকা। প্রাইজ টেবিলের সামনে অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েরা। পুলিশ ব্যাণ্ড। সাদা স্পোর্টস টুপি পড়া অফিসিয়াল্‌স। স্মার্ট ঘোষক। বাইরের দিকে আইসক্রিম বেলুন আর ফুচকাওয়ালাদের চটজলদি বেচাকেনা। মেলা মেলা ভাব। হঠাৎ হই হই কাণ্ড। একশ মিটার পেছন থেকে একটা দেশি কুত্তা গেঁয়ো সারল্যে হঠাৎ পুলকিত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। অদ্ভুত ব্যাপার। পারবে নাকি? কোনও ট্রেনিং আছে না আভিজাত্য? কিন্তু কি আশ্চর্য তৃতীয় ল্যাপে ও প্রতিযোগীদের মাঝামাঝি চলে এলো এবং চতুর্থ ল্যাপের পর ওই সবাইকে টপকে গেল। মলিন জামা কাপড় পরা সাধারণ মানুষ যারা মজা দেখতে এসেছিল দেখা গেল তারা ওই দেশি কুকুরটার পক্ষে। চিৎকার করছে উৎসাহ দিচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবকদের ঠেলে ভেতরে এগিয়ে আসছে, গামছা ওড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে। উটকো কুকুরের এমন হঠাৎ নিয়ম ভাঙা যোগদানে কর্মকর্তাদের কিছু করার ছিল না। এর পরিণামে সত্যি বলতে কি শৃঙ্খলা বলতে কিছুই মাঠে রইল না। সবাইকে বহু পিছনে ফেলে দৌড় শেষ করা দেশি কুত্তাকে ঘিরে ওই সব কালো রোগা মলিন লোকগুলির মাঠ জুড়ে কি উল্লাস। আমি তাকিয়ে দেখলাম ভি. আই. পি. টেন্টের নীচে সার সার বাংলা পাঁচের মতো বিব্রত মুখ। এরমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হল। প্রথম, নয় নম্বর আলসেসিয়ান ডেভিড। দ্বিতীয়, চার নম্বর বুল। তৃতীয়, এগারো নম্বর টিবেটান। মালিকদের বলছি মিস্টার এন্ড মিসেস্ আপনারা এদের নিয়ে ভিক্টরি স্ট্যান্ড-এ যান।

হোসেন সাহেব আমার পাশে বসে বিড়বিড় করে বলছিলেন, অন্যায় অন্যায়।

আমি বললাম, অন্যায় কী? ঠিকইতো হয়েছে, ওই কুত্তাটা কি বৈধ প্রতিযোগী।

—কেন নয়?

—নাম দিতে হয়

—আর সব কুকুররা কি নিজেরা এসে নাম দিয়েছিল?

—ওদের মালিকরা দিয়েছিল।

—তা হলে তো মালিকেরা দৌড়ালেই বৈধ হত। মালিকদের ইচ্ছাই যে কুকুরদের ইচ্ছা তার কি প্রমাণ আছে?

—ধরে নিতে হবে। কুকুরদের স্বতঃ ইচ্ছা প্রকাশ করার ক্ষমতো নেই।

—আছে। যেমন এই কুকুরটা। স্বেচ্ছায় যোগদান করেছে। বলা যেতে পারে ওই একমাত্র স্পোর্টসম্যান। চাবুকের ভয়ে বা পাঁঠার ঠ্যাঙের লোভে নয়, স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে খেলায় যোগ দিয়েছে ; কে জিতেছে? চোখের সামনে কি ঘটল? এগার নম্বর ডেভিড যদি রেকর্ড ব্রেকার হয় লাল কুত্তাটা কি করল?

যাই হোক, কুকুরটার মালিকের নাম যুধিষ্ঠির কাহার। ইতিমধ্যে কয়েকশ খেটে খাওয়া লোক ওকে আর ওর কুকুরটাকে নিয়ে ভিক্টরি স্ট্যাণ্ডে একনম্বর দাগে দাঁড় করিয়ে 'কে জিতেছে?—লালুয়া বলে শ্লোগান দিতে শুরু করেছে। ঘোষক বারবার মাইকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন গোলমাল করবেন না। ভিক্টরি স্ট্যান্ড ফাঁকা করে দিন এক নম্বর দাগে প্রথম স্থান অধিকারী ডেভিড......। কে কার কথা শোনে হইহল্লা, শ্লোগান, নাচ এবং তারপরই হঠাৎ পুলিশের লাঠি চার্জ। দাঙ্গা বাঁধাবার অভিযোগে যুধিষ্ঠির কাহার বিচারাধীন বন্দি হয়ে জেলে আছে। জেলখানা মানুষের জন্য। কাজেই ওর কুকুর জেল গেটের বাইরে প্রভুর অপেক্ষায় ছিল। তা হুজ্জোত কিন্তু থেকেই গেল। দৌড়বাজ কুকুরটা যুধিষ্ঠিরের পেছন পেছন থানায় গিয়ে একজন পুলিশকে আচমকা কামড়ে দিল এবং জেলখানায় দ্বিতীয়জনের প্যাণ্ট ছিঁড়ে দাঁত বসাল। নিহত বলে ঘোষণা করার পরদিনই তৃতীয়জনের ওপর ভরসন্ধ্যায় হামলা করে দিল। তলব পেয়ে আমি চেয়ার ম্যানের ঘরে গেলাম, ডেকেছেন স্যার?

উনি চেয়ারের হাতলে একটা চড় মেরে বললেন,

—কুকুর!

—আমাকে বলছেন স্যার?

—বলছি যুধিষ্ঠিরের কটা কুকুর ছিল?

—একটার কথাই তো মহাভারতে আছে।

—মহাভারতে নয়, পার্টিশন হওয়া বর্তমান ভারতে?

—ওঃ আপনি যুধিষ্ঠির কাহারের কুকুরের কথা বলছেন? সে তো আইনত মৃত।

—এবার যেটা কামড়াল সে কি আগেরটার প্রেতাত্মা?

হোসেন সাহেব বললেন, স্যার ইসলাম অনুসারে কুকুরের কোনও আত্মা নেই। যাই হোক ভূত যদি হয়েই থাকে তো আর কি ওকে মারা যাবে?—

যাবে। এ শহরে একই সঙ্গে সমস্ত পারিয়া লাল কুত্তা খেপে গেছে। কাজেই ওদের মারতে হবে। বৃহত্তম অভিযান। ঘিরে ফেল কুম্বিং অপারেশন। কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক এইমাত্র শেষ করে এলাম। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়। মাইকে প্রচার করে দাও যার যার পোষা কুকুরের গলায় যেন বেল্ট বাঁধা থাকে। না থাকলে লাল রঙের সমস্ত মুক্ত কুকুরকেই মারা হবে। যুধিষ্ঠিরের কুকুরের প্রতি যদি কারো কোনও

গোপন সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া যায় তা হলে গ্যাং-এর সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ স্যাক করা হবে। ডগ লাভার্স এসোসিয়েশান এই অভিযান সুপারভাইজ করতে রাজি হয়েছে।

সেই ভয়ংকর অভিযান আজ শেষ হল। মৃতের সংখ্যা একশ ষোল। সাপ্তাহিক অঙ্গন তীব্র ভাষায় এটা রাজনৈতিক স্টান্ট বলে অভিহিত করেছে। গোপাল মঠের মোহান্ত চেয়ারম্যানকে আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন। আমি একটা লাশ দেখেছি। স্প্রিং-এর মতো পেঁচানো পেঁচানো নাড়িতে ঝোলানো চোখ প্রসারিত জিবের ওপর। মৃত্যুর আগে কুকুরটা কি নিজের রক্তের স্বাদ পাচ্ছিল? ওদের তো জীবন ব্যাপী খিদে। হোসেন সাহেব গভীর মনোযোগের সঙ্গে কুড়ি মিনিট ধরে একটা বিজ্ঞপ্তি পড়ছিলেন এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল,

—হ্যাঁলো, হ্যাঁ চেয়ারম্যান বলছি.........কি? ..... আবার? ....অসম্ভব না মানে ঘটেছে যখন তখন ঘটনা তো বলতেই হবে। তবে অবিশ্বাস্য........মনে হয় এবারের কুকুরটা অন্য রঙের ....নয়? এটাও লাল? ....তা হলে নিশ্চয় গলায় বক্‌লশ ছিল.........তাও নয়? এটাও মুক্ত? তাজ্জব কথা......দেখুন তাহলে ট্রেনে-বাসে চেপে বাইরে থেকে এসেছে কিনা। এ শহর তো একটাও লাল পারিয়া কুকুর নেই। হ্যাঁ আমি বলছি নেই.........হুঁ......হুঁ হাতে বন্দুক থাকতে ওটার ব্যবহার করছে না কেন পুলিশ? হ্যাঁ এটা আমার অভিযোগ ....আইন নেই? পুলিশ মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হলে গুলি ছুঁড়তে পারে কিন্তু রাস্তায় কুকুর মারতে পারে না?......কি?.........কি? রিভোল্ট হবে? তা পুলিশ রিভোল্ট করলে আমি কি করতে পারি? ....না......কিছু করার নেই......আচ্ছা ভেবে দেখি। নমস্কার।

হোসেন সাহেব অল্প হাসছিলেন। রিসিভার নামিয়ে রাখার পর বললেন,

—এ বার পুলিশ কাউণ্টার রিভোল্ট করবে?

—হ্যাঁ। ডিউটিতে বেরুলে যদি আচমকা কুকুর কামড়ে দেয় তো ওদের নিরাপত্তা কোথায়?

—স্যার একটা কথা বলব?

—বল

—পুলিশদের ইউনিফর্ম পাল্টাতে বললে হয় না?

—ধ্যাৎ

—তা হলে?

—আর কিছু করার নেই। একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়া গেল।

—স্যার, আর একটা কথা বলব?

—বল

—যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে দিতে বলুন স্যার, ওর নরক দেখা হয়ে গেছে। এবার কুকুর নিয়ে স্বর্গে চলে যাক। প্লিজ। বলুন না স্যার। ওরা তো কত খুনীকেও ছেড়ে দেয়। যুধিষ্ঠির কোন ছার। কি অপরাধ ছিল ওর? হুঁ?

গুহা

তপতী,

আগের চিঠিতে লিখেছিলাম পাথরে খোদাই করা কিন্নর-কিন্নরীদের সাফাই চলছে। গুহার ছাদচোয়ানো জলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ধুলোবালির পুরু প্রলেপ পড়ে নাক-মুখ এবং দেহকাণ্ডের তীক্ষ্ণ খাঁজগুলি প্রায় বুজে এসেছিল। ধৈর্যের সঙ্গে খুঁটে খুঁটে আসল চেহারা ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। আমি যে প্যানেলে কাজ করছি তাতে মিলনমুগ্ধ নারী-পুরুষ আছে। পাথরের যুবতীর কালো জঙ্ঘা ছুঁতে আমার গা শিরশির করছিল। তোমাকে ছুঁলে যেমনটা হয় তেমন নয়। অন্যরকম অনুভূতি। কামনার উত্তাপ নেই, এতে আছে বহু শতাব্দীর হিমস্পর্শ।

এই ন্যাড়া পাহাড়টাকে এখানকার লোকেরা গাব্বু ডুংরি বলে। গাব্বু শব্দটা কি গর্ভ শব্দ থেকে এসেছে? গর্ভের মতোই সঙ্কীর্ণ মুখ। ভেতর দিকটা প্রশস্ত। একজন একজন করে কোনওক্রমে ঢুকতে পারা যায়। এতকাল ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা ছিল। তাই মানুষের নজর এড়িয়ে গেছে। ছ'মাস আগে পরশুয়া নামে এক বালকের ছাগল না হারালে আরও কতকাল এই কলাবতীদের আত্মপ্রকাশের জন্য একালের মানুষদের অপেক্ষা করতে হত কে জানে। দেহের প্রথম বাস তো গর্ভেই। রহস্যময় গোপন অন্ধকারে। এইসব মূর্তি যারা পাথর খোদাই করে ফুটিয়ে তুলেছে তারা বোধহয় জীব সৃষ্টির নিয়ম মেনে গর্ভবাসের ব্যবস্থা করেছিল। প্রথমে যখন মই বেয়ে টর্চ হাতে এখানে নামি—কি অন্ধকার, কি স্তব্ধতা। মূর্তিগুলির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম ঃ অদ্ভুত। শব্দটা দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভূত ভূত শোনাচ্ছিল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তারক দাস ফিস ফিস করে বলল, আমাদের আগে যারা এখানে বছরের পর বছর খোদাই করে এইসব বানিয়ে গেছে তারা কি নির্বাসন দণ্ডের আসামী? আমি হাসলাম, বন্দিরা এমন মুক্তমন পাবে কোথায়? দেখছ না চোখ আর হাত খোলা রেখে কি দরদ দিয়ে এইসব ফুটিয়ে তুলেছে।

—হয়ত ঠিকই বলছ অসীমদা। আমি কিন্তু ওরকম দশ-বিশ বছর এমন নির্জন গুহায় কাজ করতে বাধ্য হলে পাগল হতুম, নয় আত্মহত্যা করতুম।

আমিও ভাবছিলাম সেদিনকার জনসংখ্যার বিচারে মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার একেবারে বাইরে মাইল মাইল মালভূমির ভেতর এই যে গোপন জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছিল—কেন? দূর ভবিষ্যতে কেউ মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করবে এই ভরসায়? আমরা কি একটা ছবি এঁকে বা কবিতা লিখে তা কফিনে পুরে রাখার কথা ভাবতে পারি? আসলে ওরা আমাদের আবিষ্কারের ওপর কোনও ভরসা রাখে নি।

তাহলে?

কাল বিকেলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ডক্টর চক্রধারীকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বিয়ার ফুরিয়ে যাওয়ায় খুব চিন্তিত ছিলেন। কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন,

—মানুষের জন্য এত যত্ন করে এসব করেছে নাকি?

—মানুষ দেখবে বলে নয়?

—দেবতারা দেখবেন বলে। তাঁদের প্রীতির জন্য। এ এক ধরনের রিচুয়াল।

তবে তো আমরা স্বর্গের চিত্রশালায় এসেছি। কিন্তু এখানেও স্নেহ কামনা এত মধুর? মান্টিসোনা সকালে উঠে বা-বা বলে ডাকে তো? এবার আমি বাড়ি ফিরে ওকে তোমার কোলে রেখে এখানকার রীতিতে একটা ম্যাডোনা গড়ব। টেবিলল্যাম্পে একগাদা পোকা পুড়ে মরেছে। রাত হয়েছে মৃতের সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

তোমার অসীম

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি আগাপাছতলা দু-তিনবার পড়েও বুঝতে পারলাম না কি বলতে চাচ্ছ। বুঝলাম কিন্নরীর ময়লা সাফ করতে ভালই লাগছে। ওখানে যদি বেশিদিন থাকতে হয় তো আশেপাশে বাসা ভাড়া নিয়ো। একা থাকতে ভয় ভয় করে। ঘুম হয় না। মান্টিকে নিয়ে চলে যাব। তা ছাড়া তোমার মতো অগোছালো লোককে ছেড়ে দিয়ে ভরসা হয় না। কি খাচ্ছ, কি করছ কে জানে।

মান্টি আজ সকালে বা-বা বলে ডেকেছে। তোমার কথা বললে এদিক-ওদিক তাকায়। ভারি ছটফটে হয়েছে। রবার ক্লথ থেকে গড়িয়ে বিছানায় পেচ্ছাব করে দেয়। আর আমার হয় কষ্ট। ভারী তোষক শুকোতে ছাদে টানাটানি করা কি আমার একার তাগদে কুলোয়?

শনিবার মার ওখানে গিয়েছিলাম। অনুর জন্য খুব দুঃখ করছিলেন। ওর যা উড়ুক্কু স্বভাব তাতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হবে কিনা কে জানে। একের-পর-এক ধরছে ছাড়ছে। কারো সঙ্গে প্রেমপর্ব বিয়ে পর্যন্ত গড়াচ্ছে না। এমন চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত কোনও পুরুষ ওকে বিশ্বাস করতে পারবে? কি অশান্তি। ওকে আড়ালে ডেকে বললাম—বিয়ে করছিস না কেন?

—সময় হয় নি। বিয়ে করলেই তো ফিনিস। কেন ছোড়দি, কারো কাছে বাঁধা পড়ার আগে তাকে একটু বাজিয়ে দেখব না?

—কি আর দেখবি? সব পুরুষই একরকম।

—কি করে জানলে ছোড়দি? কটা আর পরীক্ষা করে দেখেছ। এ কথা জামাইবাবুকে বলো না। শুনলে রাগ করবে।

—রমেনের কি ব্যাপার?

অনু মাথা নিচু করে হাসল।

—ছোড়দি আমি ভালভাবে বাঁচতে চাই। গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, ইচ্ছেমতো

কেনাকাটা করতে চাই। ও যা চাকরি করে তাতে বড়জোর তোমাদের মতো থাকা যায়। দারুণ বেঁচে আছ তুমি, তাই না?

ও আমাকে অপমান করতে চাইছিল। গাধা। কি চায় অনু? রূপ বিক্রি করে মোটা একটা টাকার থলে? ও জানে না আমি কতটা সুখী।

ইলেকট্রিকের বিল মিটিয়ে দিয়েছি। শুনেছি ওখানে বড় এলাচের বন আছে। নিশ্চয় খুব শস্তা হবে। আসার সময় এক কেজি নিয়ে এসো।

তোমার তপতী

তপতী,

এখানে আশেপাশে কোনও লোকালয় নেই। শহর তো দূরের কথা কাছের আদিবাসী গ্রামটাও দু'মাইল ব্যবধানে। মালদায় এত লোক। অথচ এখানে সহজে মানুষ চোখে পড়ে না। বহুদূর পর্যন্ত ঢেউ খেলানো মাটিতে ছোট ছোট আগাছা। দুপুরের রোদে ছায়ায় বসা যেতে পারে এমন বড় গাছও কদাচিৎ মেলে। এত অনুর্বর বলেই বোধহয় গুহাবাসী কিন্নর-কিন্নরীদের পাথুরে সংসারে সন্তান-সন্ততি নেই।

মূর্তিগুলি যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। প্রাচীন শিল্পীরা এনাটমি সম্পর্কে এমন নিখুঁত ধারণা পেল কোথা থেকে?

তারক দাস বলল, ওরা ঘরের নারীকেই খুঁটিয়ে স্টাডি করত বোধহয়। আমার মনে হয় না। কাজ করতে করতে মডেলের দিকে চোখ না রাখলে এত নিখুঁত অঙ্গ সংস্থান আনা যায় না। তারক মাথা নাড়ল—উঁহু। ওরকম রীতি ছিল না। আর একটা কারণে তা অসম্ভব বলে মনে হয়। এত নির্জন অন্ধকার গুহায় কোনও নারী বছরের পর বছর নগ্ন হয়ে শিল্পীর চোখের সামনে পোজ দিতে পারে?

ডক্টর চক্রধারীও বললেন, আজকের স্টুডিওর ধারণা দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করবেন না। এসব প্রথাসিদ্ধ। প্রাচীন শিল্পীরা বাৎসায়নের চৌষট্টি কলার রূপারোপ করতেন।

হয়ত তাই। অথচ সেদিনের নর্ম সহচরীর যন্ত্রণা ও আনন্দের স্পর্শ এই মূর্তিতে আছে। আমি জানতে পেরেছি, আছে। তুমি ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকে বোঝাতে পারব না। সেদিন কাজ করতে করতে জেনারেটরে গোলমাল দেখা দেওয়ায় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গুহায় মোমের ক্ষীণ আলোয় যেন নিশুতি রাত। অথচ বাইরে আগুন মাখা দুপুর। আমি যক্ষিনীর স্তনে হাত দেওয়া মাত্র মনে হল কোমল মাংসপিণ্ড শিউরে উঠছে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের এমন অভিজ্ঞতা তোমাকে দিয়েই আমার আছে। আছে বলেই শরীরের ভাষা চিনতে পারলাম। ফিসফিস করে বললাম—ওগো কামমোহিত নারী, তুমি কে? আবার হাত দিলাম। সেই একই অভিজ্ঞতা। স্তব্ধ হয়ে আমি আলো আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। লাইট জ্বলে উঠলে খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি পাথরের গ্রেন ও কিছু সূক্ষ্ম রেকার বিন্যাসে এইরকম অনুভূতি আনা হয়েছে। এবার ফিরে গিয়ে তোমাকে কাছে পেলে দেখে নেব সুখ এবং বেদনার গ্রেন এবং

রেখাগুলির বিন্যাস তোমার শরীরে কি রকম। অনুভূতির এনাটমি। আমি নিশ্চিত, যক্ষিনীর কোনও রক্তমাংসের প্রতিরূপ ছিল। দেখার চোখ ও হাতের স্পর্শ যত প্রখর হয়ে ওঠে মানুষের কষ্ট তত বেড়ে যায়। মান্টিকে আমরা কোনও শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলব না। ওযদি ওর অনুমাসির মতো হয় বরং তা হোক। আমাদের ভীষণ অর্থহীন বেদনা থাকে। ও সুখী হোক। অনুর মতো মেয়েরা অন্যাকে দুঃখ দিতে পারে—নিজেরা দুঃখ পাওয়ার মতো মনই ওদের নেই। ওর সম্পর্কে মিছে চিন্তা করো না।

তোমার অসীম

পুনশ্চঃ

এখানে এক ধরনের অদ্ভূত বাঁদর আছে। ভয়ানক চোর। আমরা কাজে গেলে দুপুরে তাঁবুতে ঢুকে কলা, বিস্কুট, মাছ ভাজা খেয়ে ফেলে। গজেন কাল বিকেলে একটাকে আমার তাঁবুর পাশের বাবলাগাছে বসে থাকতে দেখেছে।

তোমার অসীম

শ্রীচরণেষু,

তেইশ তারিখ এখানে খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল। চৈত্রে কালবৈশাখী। বিকেলে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে বেশ ভিজেছিলাম। তখন ভালই লাগছিল। মেঘের জলে শরীর জুড়োয়। তারপরই জ্বর। ছেলেবেলায় ইচ্ছে করে কত ভিজতাম। তখন কিছু হত না তো। এ বয়সও চলে যাবে। চুল পাকবে। দিনে দিনে দেখতে আরও খারাপ হয়ে যাব। মেয়েরা মা হলে কি থাকে শরীরে? জ্বরের জন্যই তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হল।

চিঠি পড়ে জানলাম ওখানে দু-মাইলের মধ্যে একটা কুঁড়েঘর পর্যন্ত নেই। যাওয়া চলবে না। মান্টির জন্মের আগে হলে লিখতে ঃ গুহায় থাকার চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেছে তপতী। শিগ্‌গীর চলে এসো। পাথরের যক্ষিনী কি আমার সতীন যে ওর কাছাকাছি তাঁবুতেও থাকা চলবে না? আমার জ্বর কিছুতে না সারলে ভাল হয়। লিখেছ অনুর মতো মেয়েরা দুঃখ পায় না। ভাল। কেমন মেয়ে তোমার পছন্দ তা জানা গেল। ওই পাথরের মেয়েটাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে যা লিখেছ তাতে আমার কাঁদছে ইচ্ছে করছে। রং তো জানলাম কালো। নাক কি বেশ থ্যাবড়া? ঝিঙে-পোস্ত রান্না করতে জানে? ময়লা গেঞ্জি কাচে ? অনেক বাজে কথা লিখলাম। রাগ করো না। অসুবিধে থাকলে আমাকে নিয়ে যেয়ো না। কিন্তু তুমি একবার এসো। ছাদে বসে তোমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে তারা ভরা আকাশ দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তুমি বলেছিলে না ওভাবেই আকাশটা ঠিকমতো দেখা যায়?

তাঁবুতে খাবার চুরি হচ্ছে জেনে খুব চিন্তিত হচ্ছি। গজেন আবার চোর বাঁদরটাকে দেখেও ফেলেছে লিখেছ। আমার তো মনে হয় আয়নাতে ও নিজেই নিজেকে দেখেছে। বাঁদর কখনো মাছ ভাজা খায়?

তোমার তপতী

শ্রীচরণেষু

ভেবেছিলাম অসুখ করেছে জেনে ছুটে আসবে। আমার কপাল। এত কাজ, পুরনো বউয়ের জন্য সময় কোথায়? চিঠিটা খুলে পড়েছিলে তো? পনের দিন হয়ে গেল। তপতী মরলে নিশ্চিন্ত হও, না? অত সহজে মরছি না। মেয়েমানুষের জান, কই মাছের প্রাণ। সহজে ছেড়ে দেব না। ওগো, তোমার যে একটা মেয়ে আছে অন্তত সেই কথাটা মনে রেখ। আগের চিঠিটা লিখে মান্টিকে বলেছিলাম, বাবা আসবে। ও খুব মাথা নেড়ে বলেছিল—না। বাচ্চারা কি সব বুঝতে পারে? আমরা দিব্যি ভাল আছি।

তোমার তপতী

তপতী,

তোমার দুটো চিঠিই সময় মতো পেয়েছি। আগেরটা পড়ে ভেবেচিলাম জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছ। পরেরটা? এমন বিচ্ছিরি সব ইঙ্গিত দিয়েছ ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে। অত্যন্ত নোংরা মন তোমার। সত্যি বলতে কি আমি তোমার অসুখ নিয়ে খুব একটা চিন্তায় পড়ি নি।

জলে ভিজে সর্দিজ্বর হলে দু-পাঁচ দিনেই সেরে যায়। গেছেও। কত বড় একটা কাজ নিয়ে আছি তার মর্ম বোঝার মতো বোধ থাকলে ঘ্যানঘ্যান করতে না। এখন কোনওভাবেই যাওয়া চলবে না।

সামনের মাসে ষোল তারিখ রাষ্ট্রপতি গাব্বু চিত্রগুহার উদ্বোধন করবেন। হাতে মাত্র কুড়ি দিন সময়। এরমধ্যে মূর্তিগুলির পুনরুদ্ধারের কাজ সেরে ফেলতে হবে। গুহার মুখ চওড়া করা হয়েছে। সিঁড়ি গাঁথা হয়েছে। মঞ্চে যেমন আলোক-সম্পাত করা হয় তেমন সব ব্যবস্থা হয়েছে। নেড়া পাহাড়টার চেহারাই পাল্টে যাচ্ছে। অন্ধকার নেপথ্যে কয়েক শতাব্দী কাটিয়ে এবার লক্ষ লক্ষ দর্শকের চোখের সামনে যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নরদের দাঁড়াতে হবে। তারই জন্য আমরা ওদের সাজাচ্ছি। ডক্টর চক্রধারী বলেছেন বিদেশ থেকেও কয়েকটা টিভি কোম্পানী আসবে। আমাকে ওখানে বসেই দেখতে পাবে। বিশাল ব্যাপার। কাজের চাপ এত বেশি যে মাঝে মাঝে সূর্যের উদয়-অস্ত পার করে রাতটাও কাবার হয়ে যাচ্ছে। গুহাতেই খাবার খেয়ে নিতে হচ্ছে। পরশু রাতে ভাত জোটে নি। বাঁদর যদি নাও হয় তবে কোনও বুদ্ধিমান চোর আছে। গজেন রান্না করে রেখে অন্য তাঁবুতে রহমতের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। সে-ফাঁকে সবটুকু ভাত হাপিস হয়েছে। যক্ষিনী বড় পাষাণ। সেই প্রাচীন শিল্পীর মহৎ সৃষ্টিতে হাত দিতে পারছি এ যে আমার দারুণ লাভ। এইসঙ্গে আমার নিজের একটা আবিষ্কার যোগ হয়ে হইচই ফেলে দেবে, দেখ। যাচাই না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য বাইরে বলা যাবে না। আমার প্যানেলটা পরিষ্কার করতে করতে একটা আলগা পাথরের টুকরো উঠে এসেছে। মূর্তিগুলি অখণ্ড পাথরের দেয়াল খোদাই করা। কাজেই ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। সিমেন্ট দিয়ে জুড়ে দেব বলে রেখে

দিয়েছিলাম। জলে ভেজানোতে ময়লা ধুয়ে কিছু ক্ষুদে অক্ষর ফুটে উঠেছে। লেখার দিকটাই দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছিল। মানে শিল্পী নিজের কিছু কথা এই পাহাড়টার একেবারে হৃদয়ের ভেতরে গোপন করে গেছে। ডক্টর চক্রধারীকে দেখালাম। উনি বললেন খুব মূল্যবান আবিষ্কার। সপ্তম শতকের ব্রাহ্মী লিপি। পড়ে দিলেন—বিশাআ চুম্বি অবজ্‌জ গলল পিঅ। মানে বিশাখা নামে এক নারীকে চুম্বন করে বজ্র নামে এক পুরুষ গরল পান করেছে।

তারক দাস বলল, এ যে রোম্যান্টিক ব্যাপার। প্রেম করে বেচারি শিল্পী মরেছে।

আমি বললাম, তাহলেই দেখ এসো মূর্তির পেছনে সত্যি এক রক্তমাংসের মডেল ছিল কিনা।

ডক্টর চক্রধারী বললেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এই একছত্র লেখাকে নিয়ে ফুলিয়ে মস্ত উপন্যাস বানানো যায় কিন্তু তাতে সেদিনকার বাস্তবতা ধরা পড়বে না। সেদিনকার শিল্পীরা সমাজের নিচু থাকের লোক বলে গণ্য হতেন। স্বভাবতই দরিদ্র। কোনও প্যাসন নয় রাজার হুকুম তাদের চালিত করত।

আমি মনে মনে বললাম, তাহলে কি কোনও আরণ্যক নারী চোরের মতো এই গুহায় উঠে আসত? কি বলত তারা? রাজার লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার কৌশলের কথা? ঘর-সংসার সন্তানের কথা? পালিয়ে যাওয়ার কথা? ওই নারীর চুম্বনের সুখ হলাহলের মতো তীব্র। সেই সুখের যন্ত্রণা মহাকালের বুকের ভেতর সঞ্চয় করে রাখার মতো। কাজ শেষ হলে সেই পুরুষ আমারই মতো কোশল বা গৌড়ে ফিরে গেছে। আর অরণ্যচারী নারী সে কোথায়? রাগ করো না তপতী, লিপিটা পড়ার পর এই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার ঘোর লেগেছিল। আমি সেই বজ্র, কাজ শেষ হয়ে এসেছে। আর কুড়ি দিন পর ফিরে যাব। শুধু পার্থক্য এই অরণ্য কন্যা বিশাখাকে আমার কিছুই বলা হবে না।

তোমার অসীম

তপতী,

কাল চিঠিটা ডাকে দেওয়ার এক ঘণ্টা পর এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে না জানিয়ে পারছি না।

যক্ষিনীর পেছনের রক্তমাংসের মেয়েটাকে পাওয়া গেছে। ঘোর সন্ধ্যায় চোর চোর বলে ভয়ানক হল্লা উঠল। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম কিচেন টেন্টের পেছন থেকে গজেন এক আদিবাসী মেয়েকে হাত ধরে টানতে টানতে আনছে। বয়স পনারো-যোল। কাছে যাওয়া মাত্র আমার সমস্ত শরীরে যেন ঝাঁ ঝাঁ করে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আরে এই তো সেই বিশাখা নামে যক্ষিনী। ওর মূর্তি নিয়ে গত তিন মাস কাজ করছি। বহু শতকের ব্যবধানেও সেই অপাপ বিদ্ধ চোখ ঠোঁটের কোণে রহস্যময় ভাঁজ। আমি ওর শরীরের প্রত্যেকটি ভঙ্গিল অংশ মুখস্ত করে রেখেছি। ক্ষীণ তনু ছিন্ন মলিন বাস। মনে মনে বললাম, বিশাখা। এই কি তোমার দীর্ঘ বিরহের রূপ? গজেন বলল, স্যার। চোর ধরেছি। হারামজাদি ভাত চুরি করে পালাচ্ছিল।

হাঁসেদের দিনকাল

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা সেদিন পড়ন্ত বেলায় ঘটে গেল। মোটে বৃষ্টি হচ্ছে না। আষাঢ় মাসেও। ধুলো উড়ছে মাঠে। জল না লাগলে চাষের জো নেই। মুনিষ মান্দারের মজুরী জুটলে তবে তো চুল-দাঁড়ি কাটতে ডাকবে। কাজেই তিলক তিনটে হাঁসের মধ্যে দুটো নিয়ে হাটে বিক্রি করতে চলে গেল। ভোট আসছে। তার খরচ জোগাতে চিনিকলওলারা তাদের মালের দাম বাড়িয়ে চলেছে তাই কিছু খ্যাপা লোক বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আর বাস থামিয়ে গুলি করে খানেওলা কমাচ্ছে। রামিয়া এসব কথা ভাল ভাল ঘরের বউদের কাছে শুনেছে। ডর লাগছে। তিলক আবার যেখানে ভিড় সেখানে সেঁদিয়ে দেখতে যায় ভেতরবাগে কি হচ্ছে। বদ অভ্যেস। রামিয়া সাবধান করে দিয়েছে, ওরকম কোরো না গো। মাথা খাও। কারো হাতে বন্দুক দেখলে অযাত্রা। পিছু ফিরে বাড়ি চলে আসবে। তিনটি হাঁসের মধ্যে রইল এক। সবচেয়ে ছোটটা। এটা, মনে লয়, থেকেই যাবে। কারণ দুটোর বিক্রি করা টাকা ফুরোতে ফুরোতে আকাশ ঝামর করে মেঘ কি আসবে না? এইসব ভাবতে ভাবতে রামিয়া দেখল সূর্য ডুবু ডুবু আর বুকের ভেতরটা ধরাস ধরাস করতে লেগেছে আর ওই একটা মাত্র ছোট হাঁসের পেচনে তাড়া করে হুটপাট প্যাঁক প্যাঁক চারটে তাগড়া হাঁস উঠোনে ঢুকে পড়ল। রামিয়া প্রথমটা খেয়াল করেনি। মানুষটা না ফেরা পর্যন্ত কি রকম অশান্তি, না? তবে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। এ সময় কি রকম ভয় পাওয়া গলায় ছোট হাঁসটা খ্যাশ খ্যাশ করছে আর বড় চারটে ওকে খুব শাসাচ্ছে। রামিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, কি হচ্ছে এ সব? ছোট হাঁসটা ওর দিকে মুখ তুলে কি যেন বলার চেষ্টা করল আর বড় চারটে চেঁচামেচি করে বাধা দিতে থাকল। খুব হয়েছে, খুব হয়েছে থাম এবার। কান ঝালা পালা করে দিলি। তোদের ভাষায় মোটে তো একটাই শব্দ তায় আবার এত মামলা। তবে অন্যভাবে ওরা বুঝিয়ে দিল। হাঁসঘরে বড় চারটে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ল। ছোটটার আর জায়গা নেই। বাইরে এক পা তুলে বিষণ্ণ দাঁড়িয়ে। ওঃ এই ব্যাপার। জায়গা দখল। তা আমি কি করব? কার বাড়ির হাঁস তোরা? লোকটা না ফেরা পর্যন্ত বড় উদ্বেগে আছি। ভোট আসছে। চারদিকে খুনোখুনী। তা তোদের যে চলে যেতে বলব সেওতো ভাবছি। সন্ধ্যায় কার ধন শেয়ালে খাবে। যার ঘর তাকেই ঠেলে বার করে দিলি? তোদের ওপরে যে শেয়াল তা জানিস? আমার তিনটে হাঁসের মাপে ঘর। চারজনের কুলোবে না। ছোটটাই বরং ওখানে থাক। তোরা আয় আমার শোবার ঘরের মাচার তলে। কিন্তু তোদের তো চিনতে পারছি না। থাক। একটা রাত। কাল কেউ নিশ্চয় খোঁজ করতে ভোরবেলা পুকুর পাড়ে চৈ চৈ ডাকবে। তখন চলে যাস।

রাত বাড়ছে। হে আখড়ার গোঁসাই, হে দরগার পীর, তোমরা কে কার বড় তা নিজেরাই জানো, কারণ আমি মুখ্যু মেয়ে মানুষ। আমার লোকটা যেন হাঁস বেচো টাকায় চাল, তেল, লঙ্কা, হলুদ আলু কিনে ভালয় ভালয় বাড়ি ফেরে। এই প্রার্থনাটা কয়েকবার করার পর মনে পড়ল আসল দেবতা বনবিবির কথা এবং খুব আশ্চর্য তেনার নাম করার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসদের চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে চারদিক সুনসান। এই তো চুপ করলি তোরা। নিজেদের মধ্যে এত লড়াই। হাবলাগোবলা দুবলা প্রাণী, কি তোদের খ্যামতো? আসল শত্তুর লেজ ফুলিয়ে ঝোপে ওঁত পেতে বসে আছে। তোদেরও বিপদ। এসে পড়েছিস, থাকতে চেয়েছিস, তো থাক। আমাদেরও বড় দুর্দিন। কোথায় থেকে গেল লোকটা। বাইরে এত অন্ধকার। কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে বন্দুক বাজ। একটা জোনাকির ঝিলিক টুক্ করে ডান চোখের ভেতর দিয়ে মগজে সেঁদিয়ে আলো করে দিল। সবচেয়ে ভাল বুদ্ধিটা দেখা গেল। আজ শনিবার। আয়েশার বর হাসান বাড়ি ফেরে। সোমবার সকালে শহরে চলে যায়। হাকিমের চাপরাশিতো, কাজেই আসল উপায়টা করে দিতে পারবে। যাই তার কাছে।

—এত রাতে? আয়েশার যেন রাগ রাগ ভাব। নিজেকে দিয়ে ও জানে হাসান মেয়েমানুষকে দিনে এক চোখে আর রাতে অন্য চোখে দেখে। মদ্দদের তাইতো হয়। অন্ধকারে কালো না ধলা বুঝতে পারে না। শরীরের গন্ধে ঘোরে পড়ে। ব্যাকুল হয়ে যেমন ছুটে এলো ছুঁড়ি, ঘামে জাবড়া জোবড়া বুক পেট থেকে মাতলা ঘ্রাণ ছুটেছে। পাখির পালক ছাড়ালে ওরকম পাওয়া যায়। তা হাসান মন দিয়ে শুনে-টুনে বলল, এখন রাত দশটা সাত। সন্ধ্যায় লুঠতরাজ, কাজেই হাট ভাঙার পর রওনা হলেও বড়জোর সাতটা দশে পৌঁছে যাওয়ার কথা। অফিসে আলোচনা চলছিল চারজন খালিস্তানী এদিকে চলে এসেছে। যে চিনতে পারছে তাকেই খুন করছে। চেনা অবশ খুব দুষ্কর। ছদ্মবেশে ভালমানুষের সঙ্গে মিশে যায়। সরকারী নোটিশ আছে—ধরিয়া দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার। যদি সেরকম কাউকে সন্দেহ হয় আমার কাছে গোপনে বলে যেয়ো। আমি তোমাকে তা হলে পাছা পেড়ে শাড়ি কিনে দেব একটা। মনে থাকবে? চারজনের দল। লম্বা চুল দাড়ি। পাগড়ি। সবাইকে বলেছি। তোমাকেও বললাম। যে খবর দেবে তাকে পাছা পেড়ে শাড়ি। ধরার দায় আমার।.......আচ্ছা আচ্ছা গোপনেই বলতে আসব। কি রকম গোপন? আয়েশা জানবে? সেই কথাই রইল। তবে শাড়ির সঙ্গে একটা ধুতিও দিতে হবে কিন্তু। আমার মানুষটা ছেঁড়া ধুতি পড়ে হাটে গেছে। যেমন বললে তেমনটি দেখলে নিশ্চয় জানিয়ে যাব। ছদ্মবেশ থাকলেও ঠিক চিনব। খারাপ লোকের চাউনি আমি চিনতে পারি। হাসান হা হা করে হাসল, চোখ দেখে লোক চেনার দিন চলে গেছে। মানুষ ভেতরে এক বাইরে আরেক। আমাদের হাকিম বলে ইলেকট্রনিক যুগ। কি না করে দিচ্ছে। মানুষকে গরু কি বাঘ। শরীরের সবচেয়ে নরম জায়গায় শক দেয়। তখন খুব চিৎকার করতে থাকে আর স্বীকারোক্তি দেয়। এই শেষের শব্দটার মানে আর বোঝা হল

না। আয়েসা খামোকা ফেটে পড়ল। রামিয়া, তুই কি গপ্পে গপ্পে ওর সঙ্গে রাত কাটাতে এলি? যার মাথার ওপর এতবড় বিপদ তার রঙ্গ দেখ। হাটে যাওয়ার সময় লোকটার পরনের ধুতির পাড় কি রঙের ছিল? চট করে বল। লাশ হয়ে গেলে দেখে চিনতে পরবি তো? রামিয়া কেঁদে উঠল, তা কেন? তা কেন? তারপর ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে দেখে শুনে থ। আষাঢ় মাস তবু বৃষ্টি নেই। আকাশের লক্ষ কোটি চোখ। কিন্তু কোনটাতেই সুখ-দুঃখ-রাগ কি ভয় ফুটে ওঠে না। ভয়ংকর ভোট আসছে। আমার এখন চার মাস। পেটেরটা নড়াচড়া করছে টের পাই আর তখনি বুক শুকিয়ে যায় বাছা কোথায় রাখব তোকে নিশ্চিন্ত হয়ে? ইলেক্‌টনি না কিসের যুগ বললে মানুষকে জন্মের জায়গায় শক দিয়ে পালটে দেয়। তো এতই যখন পারে সবাইকে খেষ্টান কবরখানার মতো পাথরের পরী বানিয়ে দেয়না কেন? উঠোনে পা দিয়েই দেখল হাঁসের পালক হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। ঘরে ফিশ ফিশ করে কথা। এত রাতে কে কার সঙ্গে কথা বলছে? দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল তিলক ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে চুল-দাড়ি কাটতে বসে গেছে। টকটকে ফরসা একটা লোক পিঁড়ির ওপর হাটু মুড়ে মাথা পেতে দিয়েছে; রামিয়াকে দেখে তিলক হাসি হাসি মুখে বলল, রান্না ঘরে যাও। আমাদের ছোট হাঁসটার পালক ছাড়িয়ে রেখেছি। ওটা রাঁধ আর ছজনের ভাত। রামিয়া চৌকাঠের পাশে সরে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, লোকটা কি গো, এত রাতে চুল ছাঁটতে লোক ধরে এনেছে। তাও উঠোনে নয় শোবার ঘরে দরজা ভেজিয়ে। তাদের জন্য আবার ভোজ। ছজনের ভাতের কথা বলছে তার মানে বাড়তি চারজন। আর তিনজন কোথায়? ব্যাপারটা যেমন খাপছাড়া তেমন বাজে। দুটো হাঁস বিক্রি করে কদিন চলবে? তায় আবার খদ্দেরদের খাওয়াতে বসলে? শেষ সম্বল ছিল ছোট হাঁসটা সেটাও আমি না থাকতে কেটে-কুটে বসে আছে। একটা কথা মনে পড়ল। সর্বনাশ। সন্ধ্যায় চারটে অতিথি হাঁস এসেছিল। কেটে বসেনিতো? ওদের অবশ্য শোবার ঘরের মাচার তলে রেখে গিয়েছিলাম। দেখতে হচ্ছে। রামিয়া ঘরে ঢোকা মাত্র দেখতে পেল যে লোকটার চুল কাটা হচ্ছিল তার হয়ে গেছে আর মাথায় চুড়ো করা চুল লম্বা দাড়ি আর একজন মাচার তল থেকে বেরিয়ে এসে পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছে। প্রথমজন গামছা দিয়ে ঘাড়- মুখ মুছে আয়না দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে একসময় সুট করে ভেতরে সেঁদিয়ে গেল। তিলক লোকটাকে পিঁড়িতে বসিয়ে গালে-মাথায় জল মাখিয়ে অন্ধকার উঠোনে নেমে এলো। রামিয়া এবার চাপা গলায় বলল, এরা এখানে কেন? তুমি কি এদের চেন?

—না

—তবে?

—তবে আর কি? নাপিতের কাছে লোক আসে যায়।

--কিন্তু, কিন্তু আমি যে শুনেছি সেরকম হলে...

—কি শুনেছিস?

—সে যাই হোক। এরা এখানে কেন? চলে যেতে বল। এত রাতে আমি কিছু করতে পারব না বলে দিচ্ছি। আমার শরীর ভাল নেই জানো না?

তিলক একটু ইতস্তত করে বলল, ইস্ ফুলের শরীর। চার মাসতো মোটে।

রামিয়া ফোঁস করল, আমার ভাল-মন্দে তোমার কিছু আসে যায় না, না? এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে? আমার ভয় করে না? তুমি কি মানুষ নও? আমি তোমার জন্য ভেবে ভেবে মরে যাব আর তুমি আমাকে একা ঘরে এত রাত ফেলে রেখে নিশ্চিন্তি ছিলে। কেন? খুব দুঃখ হচ্ছে আমার। ঘরে-বাইরের চারজন লোক ঢুকিয়ে দিলে। তাও মাচার তলে। কেন? ওটা কি থাকার জায়গা? রাতেও কি তাই থাকবে? আমরা মাচার ওপরে আর ওরা নীচে? কি বিশ্বাস আছে ওদের? ওরা যদি তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আমাকে......আমাকে

—না। ওরা তোকে কিছু করবে না। খাবে-দাবে চলে যাবে। আমি কি ওদের এনেছি? তুই ওদের মাচার তলে রেখে যাসনি? কোথায় গিয়েছিলি? আমাকে খুঁজতে? হাটের পথে? হিঃ। বললেই মেনে নেব? ওদিকে গেলে তোকে আর ফিরতে হত না। হাটে আজ হ্যাঙ্গাম হয়েছে। বড়রাস্তা পর্যন্ত কারফিউ। পুলিশ যাকে দেখবে তাকেই গুলি। মাঠে মাঠে কত ঘুরপথে ফিরে আসতে হল। তাই দেরি হল। রামিয়া, সোনামনি আমার, রাগ করিস না। চোখ মোছ। মধ্য রাতের আগেই তোর রান্না-বান্না, লোকগুলির খাওয়া-দাওয়া বিদায় নেওয়া শেষ হবে। তারপর আমরা জড়াজড়ি করে শোব। এই চারজন চুল-দাড়ি কাটার জন্য চারশ টাকা কবুল করেছে। ভাবতে পারিস কত টাকা? পুরো আষাঢ় মাসে বাদল না নামলেও পরোয়া নেই। তা ছাড়া বড় হাঁস দুটো বিক্রি করে যেখানে মাত্র চল্লিশ টাকা পেয়েছি সেখানে এরা ছোট হাঁসটার দাম ধরেছে তিরিশ। সব নগদ। তোকে এবার একটা পাছা পেড়ে শাড়ি কিনে দেব। এত লোক মরছে যে কামাবার মতো মাথা আর গাল পাওয়া এরপর দুষ্কর হবে। এত লোক আবার গুরু-পাঞ্জাবি পড়ে লম্বাচুল রাখতে আরম্ভ করেছে। তার ভেতর তুই যে চারজন দামী খদ্দের মাচার তলে রেখে গেছিস এ কি কম কথা। রামিয়া, রামিয়া, শোন, রাগ করিস না। দুটো পয়সার জন্য কত কাণ্ড করছে লোকে আর আমি তো বাপ-ঠাকুরদার মতো ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাঁচি চালিয়ে এই রাতে কিছু উপার্জন করছি। ওরা দুদিন খায়নি। বনে-জঙ্গলে ঘুরেছে। তুই শুধু মা-ঠাক্‌মার মতো টগবগ দুটি ফুটিয়ে পাতে বেড়ে দিবি। আমরা কি পাপ করছি? না চিরকাল যা করে এসেছি তাই করছি? আর কোনও কথা নয় সোনামনি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওরা ছটফট করতে লেগেছে। বাস্ বাস্। সব শেষ করে যখন আমরা একসঙ্গে শোব তখন বাকিটা।

—ঠিক আছে রান্না ঘরে যাচ্ছি............কিন্তু সে হাঁস চারটে?

—তার মানে? কি পাগলের মতো বলছিস?

রামিয়া খুব ধন্দে পড়ে গেল। রান্না করতে করতে খোলা দরজা দিয়ে একটা

তারা খশে পড়তে দেখল। কোথাও একটা ছেলে জন্মাল তা হলে। মরে গেলে ঠিক উল্টো। একটা নতুন তারা হয়ে ফুটে ওঠে। এর মাঝে একটু ভাল করে দিন কাটাতে পারে না? কিন্তু সেই হাঁস চারটা? কোথা থেকে এলো? কোথায় গেল? ভোজবাজির মতো ওপর থেকে খশে পড়েনি তো? দরজা কি খুলে রেখে গিয়েছিলাম? শেয়ালে খায়নি তো?

খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথি চারজন মাচার তল থেকে ফুটো ফুটো নলওয়ালা একটা বন্দুক বের করে তিলককে বলল, চল।

—কোথায়?

—পথ দেখিয়ে বন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আমাদের।

—এ তো কথা ছিল না।

—আরে বেকুফ, এসব কথা আগে থাকে না।

এই নাও মজুরি। বউকে দাও আর চল। টাকাটা রামিয়ার হাতে দিয়ে গলায় মোচড় দেয়া ছোট হাঁসটার মতো লালচে করুন চোখে তিলক চেয়ে দেখল বউটা ঝাপসা হয়ে আসছে। বলল, তা হলে যাই, কি বল? এর কিছু পরে কোথায় একটা শেয়াল ডাকল, হঠাৎ হাওয়ায় ঝর ঝর করে উঠল গাছপালা, পেটের বাচ্চা মোচড় দিল আর পাখিদের ভয় পাওয়া কিচিমিচি আর অনেক দূরে সেই যে সর্ব্বনাশ হওয়া গুলির দুউম্ ম্ম্.....

অন্য উপেন

এই উপেনেরও শুধু বিঘে দুই জমি। মালকানা নিজের বলা যায় আবার নাও বলা যায়। তিন বছর আগে দেশী মদের লাইসেন্সী বাণেশ্বর পালের কাছ থেকে চারশ টাকা ঋণ নিয়ে খাইখালাসী দিয়েছিল। এ এক বিচিত্র ভূমি ব্যবস্থা। কোনও লিখিত দলিল থাকে না। মুখে মুখে। উপেন কিস্কুরা আদিবাসী। আইন আছে, হ্যাঁ, ছাপানো আইন আছে ওদের জমি দিকুরা সরকারের বিনা অনুমতিতে কিনে নিতে পারবেনা। সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের ঝামেলার পরে এই আইন হয়েছে। তবে যারা তিল থেকে তাল পরিমাণ জোতদারী করে ফেলে তাদের বুদ্ধি কম নয়। খাইখালাসীর ফাঁক বের করে ফেলেছে। জমি তোমার নামেই রইল। দখল আমার। কোন্ আদিবাসী কবে দশ-বিশ গুণ সুদ সহ টাকা ফেরৎ দিয়ে জমি ছাড়িয়ে নিতে পারে?

কিন্তু উপেন কিস্কু পারল। এই মাত্র। পেপার মিলের জন্য অধিগ্রহণ করা জমির লপ্তে ওরটাও পড়ে গিয়েছে। সদরে তাদের অফিসে এসে ন'টা টিপ সই দিয়ে চব্বিশশ টাকা পেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছু ধরা বায়েশ্বর পালকে তা থেকে অর্ধেক দিনে খাইখালাসী ছাড়িয়ে নিল। উপেন যদি কিস্কু না হয়ে পাল হত এবং বাণেশ্বর পাল না হয়ে কিস্কু তা হলে অস্বীকার করে বসতে পারত! খাই খালাসী ছাড়িয়ে জমিটো কি মোর কাছে ফিরৎ এলো বটে যে টাকা দুব? না এ ব্যাপারে জোর করার মতো কোনও আইন নেই। তবে কয়েক হাজার বছর ধরে যারা শুধু মুখের কথায় সমাজ- সংসার চালিয়ে এসেছে তাদের কাছে লেখার চেয়ে কথা বড়।

বাইরে ওর বউ সুমড়ী তিন বছরের ছেলে কোলে ঠা ঠা রোদে দাঁড়িয়ে ছিল। উপেন বারশ টাকা বাঁধা গামছার প্রান্ত দিয়ে সুমড়ীর মুখের ঘাম মুছে দিয়ে বলল, হই গেল বটে। চল।

—কোথাকে?

—ভুখ লেগেছ্যে তোর আর ছ্যেলার। হয় কি না?

—হঁ। ঝট ঘর চল। চাইল-ডাইল কিনতে হবেক কিন্তু। উপেন হা হা করে হাসল। এমন হাসতে সুমড়ী ওকে বহুদিন দেখেনি। পাখাল ওড়া হাসি। একঝাঁক পাখি চমকে উড়াল দিলে যে আওয়াজ হয়। বিড়াল আঁচড়ানো হাসিও আছে। ইস ইস করে একটু শব্দ মাত্র। ঝামট হাসি এক পশলা বৃষ্টির মতো। মানুষের হাসিতে বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছু আছে গো। আদিবাসী কাহিনীতে শোনো নি?

তা উপেন কিস্কু এমন করে হাসল কেন, সুমড়ী তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল।

—কি বটে?

—হঃ। ঘর যাব তেবে রাণবি তেবে খাব কত্ত বিলম হবে রে মেঝেন। রাত হই যাবে। টাকা আছে টাকা। ভাতের দুকানে চল।

স্টেট বাস গ্যারেজের আশেপাশেই কত ভাতের দুকান। দিকুরা বলে হুটেল। তার সবচেয়ে বড়টায় সুমড়ীর হাত ধরে ঢুকে পড়ল। বউটা ভয় পাচ্ছিল। ভাবছিল মুড়ি- তেলেভাজা কিনে খেতে খেতে চলে যাই। তা মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া ওই ছোটটায় ঢুকলেও স্বস্তি পেত। তা না এই এত-তো বড়। উপর তলায় নীচ তলায় লোক গিজ গিজ করছে। ছোট ছোট খুপড়িতে খাও কি লম্বা চওড়া ঘরে। তো ওরা একটা খালি কেবিনেই ঢুকে গেল। সুমড়ীর পা সরছিল না কিন্তু উপেন কি রকম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চেয়ার টেনে বসল। যেন কত অভ্যাস। যেন নিত্য এভাবেই বসে। জোছনার মতো নরম আলো আয়না মসৃণ টেবিলে ঠিকরে যাচ্ছে। সুমড়ী এমন আশ্চর্য পরিবেশে এর আগে কখনো খায়নি। উপেনের দিকে তাকিয়ে থুতনিতে হাত রেখে গরবিনীর মতো বসল। এ রকম বসায় ওর নাকের পাটা স্ফীত হয় ও চোখ দুটো বেনে ঘাসের ডগার মতো লম্বা সরু দেকায়। উপেন হাঁক দিল, ইদিকে তিনটো ভাত। সুমড়ী বলল, দুটো লাও। তিনটোর পয়সা বেশি লিবেক। ছ্যেলা মোর সাথে খাক।

উপেন আবার সেই পাখান-ওড়া হাসল। কেনে উঁ কি মানুষ লয়?

—সি বটে। কিন্তুক

—খা খা। মুরগার মাংস আর মাছ দাও হে।

উপেন অন্যরকম হয়ে গেছে। ফুলপ্যান্ট পরা মানুষদের মতো। একমুঠো চাল সংগ্রহ করতে যে প্রাণান্ত হয় যে আজ কত অনায়াসে তিনথালা ভাত চেয়ে বসল। টেবিলের ওপর হাত রেখে অল্প অল্প পা দোলাচ্ছে। কতক্ষণ কোদাল চালিয়ে কোথা থেকে একটা টাকা জুটবে ও কিভাবে সেটা খরচ করলে ক'বেলা খিদে ঠেকিয়ে রাখা যাবে এই হিসেব মেলাতে মেলাতে যে লোকটা নিত্য জেরবার হয়, শুধু মুখের সোয়াদের জন্য কিছু খাবার কথা সে ভাবতে পাবে? অথচ আজ সে মাছ-মাংস দুটোর হুকুম দিয়ে বসল। খাবার এসে গেলে কিন্তু সুমড়ীর মনটা ভাল হয়ে গেল। পেট ভরে ভাল খাওয়া-দাওয়া তো মানুষেরই জন্য। কত লোক খাচ্ছে। তাদের মতো সুমড়ী তার ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে খেতে বসেছে। তফাৎটা কোথায়? কেন এই অধিকার ওদের নেই না কি?

উপেন বলল, হাত তুল্যে বস্যে রইলি যে? খা খা। যা মন চায় খা। টাকা আছে। এ হুটেলভাই মাছের মুন্ডাগুলা আছে কি না? একটা কর‍্যে দু জনাকে দিয়ে যাও।

কত অনায়াসে হুকুম দিচ্ছে উপেন। স্বামীর এই আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গীটি ভাল লাগছে সুমড়ীর। পুরুষ তো এ রকম মাথা তুলে এমন গলার আওয়াজেই কথা বলবে। পেট ভরে ছেলে বউকে খাইয়ে সুখী করবে। তাইতো ওর কল্পনার মধ্যে আছে। বদলে যাওয়া উপেনের জন্য সুমড়ীর গর্ব হল। তার স্বামী কোমর ভাঙা

দীন হীন কেউ নয়। অভাবের ছাইয়ের তল থেকে গনগনে মানুষটা বেরিয়ে এসেছে। এই তো ওর মরদ। খেতে খেতে উপেন রসিকতা করল, শহরে বাঘ, ভালু, শিয়াল, মুরগা সব খাঁচায় থাকবে। জঙ্গল কুথা পাইবে? একদিন এক শিয়াল আগল খোলা পাইয়া বাহারে আইল। ঘুরতে ঘুরতে পড়বি তো পড় মুরগার খাঁচার সুমুখে। তো কি হইল?

সুমড়ী বলল, হিঃ ইটা আর কি হবে? শিয়াল মুরগা খাইবে

—তা লয়। ই শিয়াল জেবনে মুরগা দেখে নাই। উয়ার বাপও দেখে নাই। তো মুরগার লাল ঝুটি দেইখা এমন ডরাইয়া গেল কি ছুটতে ছুটতে ফের লিজের খাঁচায় সিন্ধাই গেল।

রসিকতা শুনে সুমড়ী হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—কেমুন শিয়াল গো মুরগা দেইখা ডরায়? খাঁচার শিয়াল কি আর শিয়াল থাকে। কিন্তু মুরগা কি কহিল?

—মুরগা কহিল উটা কেমুন কুত্তা বটে? ছুঁচুলা মুখ। হ্যাংলা পানা। উয়ার মালিক কি উয়াকে দুধ ভাত কম খাইতে দিছে?

—হিঃ হিঃ শিয়াল খাইবে দুধ ভাত? থামাতো। হেস্যে হেস্যে পেট ফাটি যাইছে।

শেষে হোটেলওয়ালার নাকের ডগার সামনে একগোছা নোট ঝাঁকিয়ে উপেন বলেছিল, লাও গো। দামটা লাও।

দর নয় দস্তুর নয়। যা চাইল দিয়ে দিল। রাস্তায় নেমে সুখী সচ্ছল জনস্রোতের মধ্যে সুমড়ী মিশে গেল। বস্তুত অনুভব করল এই জীবনটাই ওর। সুখের অধিকার আছে বটে। উপেন খেতে পাওয়া পড়তে পাওয়া মানুষগুলির মতোই লম্বা লম্বা পা ফেলে আগরবাতির গন্ধে ম' ম' এক পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—দাওগো দু'খিলি মিঠা পান। যি মশলাটা সবচে ভাল সিটা দিবা। হাঁ। দু'খিলি লয় চার খিলি। দুটা দুজনায় এখুন খাইব দুটা টোপলায় লিব। আঁচলে বাইন্ধা নে সুমড়ী। মন চাহিলে মুখে দিবি। রাঙা ঠোঁটে রাঙা কথা কহিবি। হাঁরে মরদ, তাই কহিব। সুমড়ী কালো পিচের ওপরে লাল ছোপ ফেলে মনে মনে বলল, না তো কি? আমি যোবতী। মন রাঙাতে পারি। যদি না রাঙে তো কিসের যুবক? যদি না রাঙাই তো যুবতী কিসের? সেই বালিকা বয়সে ভাবতাম আমার মরদ হবে মউল গাছের মতো। শক্তপোক্ত। ফল খেলে নেশা। আমাকে সে বাঁচার নেশা দেবে। বেঁচে বড় সুখ পাব। সাজাবে—দেখার জন্য। খাওয়াবে—এই শরীরটা তরতাজা রাখার জন্য। সুন্দর শরীর ছাড়া সুন্দর আসর হয়? এইতো সেই স্বপ্নের পুরুষ। বলছে চল সুমড়ী শাড়ি কিনবি। আর ছ্যেলার জন্য জামা, ইজের। বেলাউজ আলতা পাউডার কত কি। ভারি সুন্দর শাড়ি বুকের কাছে চেপে ধরে সুমড়ী আধবোজা চোখে স্বামীর দিকে চাইল। টাকা দেবার সময় উপেন কিন্তু এবার বলল, দাম কমাও গো। তার মানে সেই হিসেব ফিরে আসছে। হিসেব মানেই টানাটানি। ধক করে উঠল ওর

বুকটা। বলল, ইর চেয়ে কম দামের একটা লাও। উপেন ওকে ধমক দিয়ে বলল, যিঁটা তোর পশিন হয়েছে সিটাই লিবি। কেনে আমি কি গরিব আছি?

—না শেষে যদি।

দোকানদার বলল, নে নে মেঝেন। যেটা মাঝি দিতে চায় সেটাই নে। এই রঙটা তোর শরীরে মানাবে ভাল।

সুমড়ীর মনটা ভাল হয়ে গেল। কোথায় আড়ালে এক টুকরো মেঘ আছে। মনের মতো কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে টুক করে ছায়া ফেলে যায়। যা মেঘ দূরে যা। এই রঙটায় আমি ঝলমল করে উঠব। ওইতো কি গাঢ় চোখে তাকিয়ে আছে উপেন।

তারপর ওরা সিনেমা হলে ঢুকল। দেখতে দেখতে মনে মনে আলাপ হল। আমাকে অমন ভালবাসতে পারিস মরদ? হ্যাঁ পারি। তোর কারণে দুনিয়া উথালপাথাল কর‍্যে দিতে পারি। পেট ভর‍্যে খাব আর মন ভর‍্যে শুব। নতুন শাড়ির টাটকা বাস উঠতে লাগবে। কি বলবি তখন? অত ধামস কর‍্য নাকো। খোপার শালফুল ছিঁড়্যে যাবে। যাক। শালফুলের জনম তো কুটি কুটি হয়্যে বিছানায় ছড়াই যাবার লেগে। ফুলের বিছানায় কালো মুখে শাদা দাঁতের ঝিলিক। ঠিক তখনই চাপা গর্জন করে সুমী লাফিয়ে উঠল। উপেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হল্য বটে?

—জানুয়ার। বাহার চল। কহিছি—। হির হির করে উপেনের হাত ধরে টেনে বাইরে এসে সেই অপমানের কথা শোনাল। পাশের মোটাসোটা ফর্শা বাবুটা ওর শরীরে হাত দিয়েছে। এরকম আচরণ কোনও অচেনা আদিবাসী পুরুষ করে না। গরিব মেয়েদের উপর ভদ্রলোকের লোভ থাকে। শস্তার জিনিস। হুজ্জোত কম। সেই অন্ধকারে আর ফিরে গেল না ওরা। পাশাপাশি নীরবে হাঁটতে থাকল। কোথাও যাবে বলে নয়, এলোমেলো। এ শুধু সময় কাটানো। তাছাড়া আর কি-বা করতে পারে ওরা। কোথায় যে কেটে গেল সুখের সুতোটা। সুমড়ীর কষ্ট হচ্ছে। অথচ উপেন একবারও মুখ তুলে ওর দিকে চাইছে না। কেন? আমাকে একটা থাপ্পর মেরে মন ভাল করে নিতে পারতে। নয়ত ফিরে গিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে মারপিট করতে পারতে। তাই করলে কি বেশি খুশি হত সুমড়ী? না না, তা কেন? তা হলে? দোকানে দোকানে কত পশরা। তখনতো এটা-ওটা কিনে দিয়ে সুখী হয়েছে উপেন। আদিবাসী বউটা ভাবল তাই আর একবার করলে মন খোলসা হবে মরদের। একটা লোহার দোকানের কাছে এসে স্বামীর গা ঘেষে আদুরে গলায় বলল, ধান সিজোবার একটা কড়াই নিব। দিবা?

উপেন বিমনা ভাবেই জবাব দিল হঁ।

এটাই শেষ কেনাকাটা। বিশ নম্বরী লোহার কড়াই। একবারে পাঁচিশ সের ধান সিজোনো যাবে। কত দিনের সখ। নিজস্ব একটা কড়াই। ভারি পছন্দের জিনিস। আস্তে আস্তে সুমড়ীর মনের ভেতরটা জুড়িয়ে গেল। উপেনের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অপরাধ বোধ এলো। সিনেমা হলের ব্যাপারটা স্বামীকে দুঃখ দিয়েছে।

আহা সেই দুঃখ তো আমারই জন্য।

বাস থেকে কাঁকড়াইলে যখন নেমে এলো তখন সূর্য ডুবে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সেখান থেকে ওদের গ্রাম ছোট জুড়ি আলপথে দেড় ক্রোশ। সামনে গাঢ় অন্ধকার। প্রথম রাতের চাঁদের সময় এটা। আজ জোছনা দেখা দেবে আরও এক ঘণ্টা পরে।

উপেন বলল, চান্দ উঠলে যাব সুমড়ী। আয়, ই গাছের তলায় বসি। ছ্যেলাকে শুতি দে। মুই ঘুর্যে আসছি।

যাবে আর কোথায়? ওই দিকে তাড়ির ঝুপড়ি। ফাঁকফোকর দিয়ে লম্ফের লালচে আলো লক লক করে আশপাশের অন্ধকার লেহন করছে। এই নির্জন মাঠে ঘুমন্ত সন্তানকে পাশে নিয়ে অপেক্ষা করতে একটুও ভয় করছে না আদিবাসী বউটার। অথচ সিনেমা হলের অন্ধকার এখনও কেমন আতঙ্কের স্মৃতি হয়ে আছে। যাক, সেসব কেটে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। থেকে থেকে এক এক ঝলক হাওয়ায় পাতার ওড়াউড়ি। কত জিনিস কিনেছে আজ। সব ওর নিজের। সঙ্গেই আছে। পোটলায় বাঁধা। আর এই কড়াইটা। উপেন ফিরে এলো এক ভাঁড় তাড়ি নিয়ে।

—বড় হুজ্জোত গেল বটে মেঝেন। আয় শরীলটো তাপাই। খা খা। ছ্যেলা ঘুমাই গেছে? ঘুমাক—ঘুমাক বাপোই। ই জেবন কুথা থিকা পাইল ও? আমি দিয়াছি। ই শরীল কুথা থিকা পাইল ও? তুই দিয়াছিস। হুঁ। বড় হইলে, জুয়ান হইলে উ তার ছেল্যাকে মোর দেয়া জেবন টুচুক ভাইঙ্গা দিবে। সব শরীল পেরথম মা পিলচু বুড়ি থিকা হইতে হইতে যাইছে। খা খা। ই মদ কে বানাইতে শিখালছে? পিলচু বুড়ি। কেনে? যাতে কি জুয়ান কালে শরীল থিকা শরীল গড়তে মোদের মন যায়। খা সুমড়ী। মোদের সুখ-দুখ আঙা আর ছাড়ানের পেছনের কথাটা সব পেরথম বাবা পিলচু বুড়া ছ্যেলাকে কহি গেছিল। সে আর ছ্যেলা থিকা ছ্যেলাকে কহিতে কহিতে মুই তক এস্যে গেছে। সিটা কি? আবেগে বোঙার কথা। মোর ছ্যেলাকে মরণ কালে কহি যাব। হাঁ। তাড়িটা বড় ভালরে। খুব দুমাইছে। মিছা মিছা ঘোরটা কাটি যাইছে। আজ দিনমান যা হয়্যে গেল সব মিছা। এই যে কড়াইটা কিনলি মিছামিছি। কি দিয়া ভরবি? এক ছটাক জমি আছে আর যে ধান হবে ধান সিজোবি?

তাই? নেশায় সুমড়ীর কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। সত্য মিথ্যা। একাকার হয়ে যাচ্ছে। চেনা যাচ্ছেনা কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। এই যে শক্তপোক্ত ওজোনদার লোহার কড়াইটা এটা মিথ্যা না এর পেটের গোল মতো শূন্য জায়গাটা?

দিনমানের টগবগ করা সুখের উপেন না এই এখনকার ঝাপসা হয়ে আসা দুঃখী মানুষটা?

জন্মাষ্টমী

পরের ছেলে পেটে নেওয়ার কথাটা তখনি উঠেছিল। বাসন্তী মণ্ডল দুই নম্বরের বাচ্চাটা বিয়োতে হাসপাতালে গিয়েছিল। শাদা কোট পড়া কাঁচাপাকা চুল ডাক্তারনী একদিন ওর তলপেট, বুক বেশ করে টিপেটুপে পাশের এক যুবক ডাক্তারকে হাসি হাসি মুখে বলেছিলেন,—

—চমৎকার। একে দিয়ে হবে বলে আমার ধারণা। বাসন্তী বুঝেছিল ওর গতর খুব ভাল। তা ভাল হলে কি হবে, ওর সঙ্গে যারা ভর্তি হয়েছিল তারা ছেলে কোলে ফিরে যাওয়ার দশদিন পর ও ছাড়া পেল। এরমধ্যে কতরকম পরীক্ষা। পাড়াতুত আয়া দিদি অবাক হয়ে বলেছিল,—অসুখ নেই, বিসুখ নেই, বেবি ভাল, মা ভাল, তবু এই টানাটানির বেডে দশদিন রেখে দিল?

ছাড়া পাওয়ার দিন ওকে আর স্বামী সুফলকে যেতে হ'ল ডাক্তারনীর কুঠিতে। সন্দেশ খেতে খেতে কথা হল। ডাক্তারনীর মুখে আগল নেই, বললেন,—তোমাকে আবার মা হতে হবে। বাসন্তী লজ্জা পেল। হাসপাতালের দেয়ালে লেখা "আমরা দুই। আমাদের দুই।" সে হিসাব ওর মিলে গেছে। আবার উস্কে দেওয়া কেন? সুফলের তো ভাত কাপড়ের মুরোদ নেই অথচ হামলে পড়তে বাহাদুর।

ডাক্তারনী সুফলকে কাজকর্ম বাড়িঘর এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আসল কথাটা পাড়লেন,—

—আর একটা বাচ্চা পেটে ধরলে উপরের দুটিকে মানুষ করতে সুবিধে হবে। বুঝলে?

বাসন্তী হতভম্ব,—মানে?

—মানে তোমার শরীরটা যেন মা হওয়ার জন্যই তৈরি। হাজারে এমন একটা মেলে। আমরা যা করতে চাই আজকাল বিদেশে হামেশাই হচ্ছে। এখানেও হবে। তোমাদের দুজনের মত পেলে, পাওনা-গণ্ডার কথা চুকলে তুমি অন্যলোকের বাচ্চা গর্ভে নেবে। বাসন্তী দুটি সন্দেশ বালতি ঝুড়িতে সরিয়ে রেখেছিল। সুফলের হাত ধরে টান দিয়ে বলল,—

—কি দেখছ হাঁ করে? চল। অন্য বেটাছেলে আমার গায়ে হাত দিলে তুমি টাকা নিয়ে মজাক ওড়াবে? নাকি তার গলায় হাঁসুয়া চালিয়ে দেবে, হাঁ?

ডাক্তারনী জোরে জোরে হাসলেন, তারপর বুঝিয়ে বললেন গায়ে হাতটাত কিছু নয়। ডাক্তারনী আর সুফল ছাড়া কেউ ওকে ছোঁবেনা। কেবল বীজটা যাকে চোখেও দেখা দরকার হবে না তার। অনেকের মা হওয়ার ক্ষমতো থাকেনা অথচ টাকা-পয়সা অনেক। ছেলে না থাকলে খাবে কে? তারাই খরচ-খরচা দিয়ে অন্যের মাটিতে

পুতুল গড়ে নিয়ে যায়। কত হলে চলবে? হাজার পাঁচেক? না না, এখনি কোনও জবাব চাই না। বাড়ি যাও। ভেবে দেখ। যা করার কোলেরটা বছর খানেকের হলে করা যাবে।

এই হল শুরু। তারপর অনেক গড়াল। পরদিন সকালে বাসন্তী কাজে গেল। ফুরনে কাজ। হাজির হলে বেতন নইলে নয়।

কথাটা কতভাবে ভাবল বাসন্তী। মেশিনের ঝাঁ ঝাঁ শব্দের গভীরে তলিয়ে গিয়ে অনেক সময় আত্মারামের সঙ্গে আলাপ করা যায়। তাই করল। স্তনের বোঁটায় বাচ্চার ঠোঁটের আকর্ষণে চিরকালের জননী প্রবৃত্তির যেসব শেকড়-বাকড়ে টান পড়ে সে পর্যন্ত নেমে গিয়ে ব্যাপারটা ভেবে দেখল। অবশেষে এক শীতের রাতে হাওয়া যখন হা হা করে মাঠময় পাক খেয়ে ওদের ছোট্ট ঘরটার দরজা-জানালা ঠকঠক করে ঢুকে পড়তে চাইছে, তখনই একটু তাপের প্রয়োজনে স্বামীর ভাবনা আর ওর ভাবনা কাছাকাছি এসে গেল। সুফল ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল,—বড্ড শীত বাসন্তী। কাঁথা চাদর যা হোক দাও।

লোকটা সত্যি কাঁপছে। বাসন্তী কি করবে বুঝে পেল না। লেপ একটা, কাঁথাও একটা। গত শীত এতে পার হয়ে গেছে। প্রথমটাকে বুকে টেনে তিনজন একই লেপে শুয়েছে। দরকার মতো কাঁথাটাও ব্যবহার করেছে। এবার ওটা একলাই সুফলকে দিয়েছিল। লেপে চারজন হয় না। বাসন্তী ওর দুটো শাড়ি ভাজ করে কাঁথার উপর চাপিয়ে বলল,—

—আর একটা লেপ কর। লোক বেড়েছে।

সুফল হাসল।

—ছেলেপুলে চাওয়ার এইতো জ্বালা। এখন লেপে টান, দুদিন বাদে ভাতে টান।

বাসন্তী বলল,

—অলক্ষুনে কথা বোলনাত। আহা ওরা খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকুক।

—দুজনের এই আয়ে আর চলেনা বাসন্তী। দুঃখে-কষ্টে তোমারও গতর ঝরে যাবে। এমন কত হয়। তাও যদি আমার নিজের রিক্সা থাকত। যা পাই মালিকইতো সিকি ভাগ নিয়ে নেয়।

বাসন্তী ভাবছিল বাড়িটার টালি নামিয়ে ছাদ দিলে দরজা-জানালা শক্ত-পোক্ত করলে শীতে বর্ষায় স্বামী পুত্রের কষ্ট কমে যায়। মুখে এলো অন্যকথা,

—কত লোকের ছেলেপুলে হয় না। তাদের আবার আলাদা রকম কষ্ট। না?

সুফল হাসল।

—এ তুমি ডাক্তারনীর মতো কথা বলছ।

—তুমি কি বল?

—আমি বলি বড়লোকের উপকার-টুপকার কি হল সেটা কথা নয়। তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমি কিছু চাই না।

—কষ্ট আর কি? সয়ে যায়। দশটা মাসের ব্যাপার। তারপর পরের জিনিস চুক্তিমতো পরকে দিয়ে খালাস। হ্যাঁগো, তুমি খুব দুঃখ পাবে তাহলে? আমাকে ঘেন্না করবে?

সুফল ঢোক গিলে বলল,

—যা বলেছে তাতে তো তোমার খারাপ হওয়ার কথা নয়।

ব্যস এ পর্যন্তই। এরপর দর-দস্তুর করে টাকাটা বেড়ে ছয় হাজার হল। চুক্তি সই করে চার হাজার, বাচ্চা হাতে তুলে দিয়ে দু'হাজার। এইসঙ্গে বাসন্তীর কাজ না করা দিনগুলির বেতন। লেখালেখি হয়ে গেল। এরমধ্যে বেশ ক'বার ওদের দুজনকে একসঙ্গে আবার কখনো সুফলকে একা যাতায়াত করতে হল। ডাক্তার উকিল ওরাই সব করছে। বিয়োবার পর ছ'মাস নার্সিংহোমে থাকতে হবে। তারপর গরিব মার গর্ভে জন্মানো বড়লোকের বাচ্চা কানাডা চলে যাবে।

এ নিয়ে আলোচনা করতে করতে বাসন্তী একদিন সুফলকে বলেছিল,

—কি দারুণ গাড়ি ওদের আর দুজনেই কি সুন্দর!

সুফল বাঁকা জবাব দিল,—

—বড়লোক না হলে কি আর বাসন্তী মণ্ডলের বাচ্চা এত দাম দিয়ে কিনতে পারে? তবে বাবুটা হুমদো আর বিবিটা পোকায় কাটা ফুল।

বাসন্তীর কোথায় একটু খচ করে লাগল। ফুল? আর বাসন্তী বুঝি এতকাল কাদা?

অবশেষে সেই দিনটা এল। আশ্বিন মাস। সকাল থেকে কোথায় ঢাক বাজছে। সুফল ওকে চমৎকার একটা ঘরে আদর করল। কাশবনে আগুন লাগলে অদ্ভুত তপ্ত হাওয়ায় ওলোট-পালট খেতে খেতে সাদা শিষগুলি যেমন দপ করে লাল হয়ে ওঠে তেমন তপ্ত অনুভূতি ওকে গ্রাস করার মুহূর্তে সুফল লাফিয়ে উঠে চলে গেল। ডাক্তার এসে ঢুকলেন। ক'দিন পর ছোট একটা অপারেশন তারপর বাসন্তী সতর্ক পরিচর্যায় আবার মা হল। ওদের ছোট ঘরটার ছাদ হল। সুফল মণ্ডল রিক্সার মালিক হল।

কাল বাসন্তী ছাড়া পাবে। খবর পেয়ে খুশী হয়ে সুফল কেবিনে ঢুকে দেখল ছেলে কোলে বউ মুখটা মেঘলা করে বসে আছে। মেঘ অবশ্য আকাশেও! জোর বর্ষা নেমেছে।

সুফল বলল,—

—ওহ্ এ যেন জেল থেকে ছাড়া পাওয়া!

ওকে অবাক করে দিয়ে বাসন্তী হু হু করে কাঁদল। তারপর বলল,—দুধের বাচ্চা। এই কি দিয়ে দেওয়া যায়? হ্যাঁগো, ওদের বলে দেখ না আমাকে যদি ওরা দুধ মা রাখে।

সুফল রেগে গেল,—

—যাঃ বাবা। তুমি তা হলে এই করতে কানাডা চলে যাও। আর এদিকে আমি

বাবাই টাপাইকে নিয়ে ভেরেণ্ডা ভাজি।

—ছেলে আমি দেবনা।

সুফল কত বোঝাল। আইনের লম্বা হাত। ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাবে। পালিয়ে গেলে নতুন ছাদ দেওয়া সাধের ঘরটাকে ক্রোক করবে।

—ক্রোক করবে? তাতে ওদের দেনা মিটবে? আমাদের কাছে তারপর আর কিছু চাইতে পারবেনা?

দেনা কি বলছ? কতগুণ বেশি চলে যাবে। ওই ভিটেটুকু ছাড়া সারা পৃথিবীতে আমাদের আর আছেটা কি?

বাসন্তীর মুখ যেন এক অপার্থিব আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—বলল, রিক্সা কোথায় রেখেছ?

—গেটের কাছে।

—পার্কের পিছনে নিয়ে গিয়ে বসে থাক। চলে যেয়োনা। গেলে আমি চারতলার ছাদে উঠে ঝাঁপ দেব।

কদম্বের পিতামহীর বয়ঃকাল একশত বৎসর। রাত্রে নিদ্রা হয় না। উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে করিতে অনন্ত কাল স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া কবেকার বিস্মৃত এক একটা চিত্র অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইতে দেখেন।

আকাশ বিদীর্ণ করিয়া শ্রাবণের বারিধারা নামিয়াছে। মত্ত দাদুরির রব ঝটিকার একেকটি তরঙ্গোৎক্ষেপে দূর হইতে নিকটে আসিয়া পুণরায় দূরে চলিয়া যাইতেছে। মুহুর্মুহু অশনি সম্পাত। মেঘমন্দ্র। জল কল্লোল। ক্ষণপ্রভায় অকস্মাৎ একটি চিত্র ক্ষণকালের জন্য প্রস্ফুটিত হইয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কদম্বের পিতামহী অনুচ্চ স্বরে কহিলেন,—

—আরে ওইতো সেই লোকটা না! জল ছপছপ করে চলেছে। বুকে সাম্‌টানো মানুষের বাচ্চা গ। আগে আগে ওটা কি? শেয়াল?

শিকার

ডাঙা যেখানে ভাতিয়ার বিল ছুঁয়েছে তার কিছু দূর পর্যন্ত দলকলমি, পাতিয়াল, কচু আর এটা-সেটা জলজ গাছগাছালির ঘণ সবুজ আস্তরণ। তারপর নিস্রোতা জল। বাদশাদের আমল পার করে সেই যে থমকে গেছে আর তার নদীর সঙ্গে দেখা নেই। পাঁক জমে এমন কালচে হয়েছে! আগে টলটল করত।

এখন ভাতিয়ার বিলের ওপারটা বাংলাদেশ, এ পার ইণ্ডিয়া। তীর ঘেঁষে এঁকে-বেঁকে টানা গড় চলে গেছে গৌড়ের এ মাথা থেকে ও মাথা। উপরে তেঁতুল, নিম আর বাবলা নীচে ওই হোথা একটা গ্রাম। বিশ-বাইশ ঘরের ধানোক পাড়া। এ সব জনপদের যা হয় বাঁশ-বাখারি মাটির ছড়ানো-ছিটানো ঘর। সামনের দেয়ালে লাল মাটিতে আঁকা লতা ফুল আর হাতির ছবি। পিছনের দেয়ালে ঘুঁটে। জমিটমি কারও নেই। মজুর খাটে।

কেউ দিনে কেউ রাতে। পাতিয়াল ঝোপের মধ্যে লুকোনো নৌকো সর সর করে বেরিয়ে এসে এ পার ওপার করে। মাল আসে যায়। কিছু দূরে গৌড় রোডের কোথাও অপেক্ষায় থাকা ট্রাক লোড-আনলোড হয়। মাঝে মাঝে বর্ডার পুলিশ দু-চার জনকে তুলে নিয়ে যায়। ওরা মজুরী পায়। যেভাবেই পাক। মাল তোলার জন্য বা জেল খাটার জন্য। তবে যাদের জন্য খাটাখাটুনি তাদের চ'খে দেখা যায়না'গ। আর কি করে? মেয়েরা শাক তোলে, ভাত রাঁধে আর বাচ্চা বিয়োয়। কালো রোগা রোগা ছেলেগুলি গাই-বকরী চরতে দিয়ে তেঁতুলগাছতলায় দিনভর খেলে। মাঝে মধ্যে ছুটে গিয়ে এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়া পশুদলে ভিড়িয়ে দেয়। এতো হ'ল বাইরের কাজ-কম্ম খেলা-ধুলো জন্ম-মৃত্যু এইসবের হিসেব। জনপদের ভেতরের কথাটা কি? হ্যাঁ? একদম ভেতরের কথা?

যাদের চোখে দেখা যায় না তাদের দুজন একদিন হাজির হ'ল। একজনের কাঁধে পাখিমারা বন্দুক, আর একজনের গলায় বাইনোকুলার। হাতে এটাচি। শীতের দুপুর। ওরা গড়ের উপর উঠে এল। যত দূর চোখ যায় রোদ ঝলমল করছে। যার নীল ভেস্টের বুকে 'লাভ মি' লেখা তার নাম মুনেশ্বর প্রসাদ। সঙ্গী রাইহাণ চৌধুরী। মোটর বাইক নিয়ে জাম্প দিতে পারে।

মুনেশ্বর বাইনোকুলার দিয়ে অনেকক্ষণ বিলের বুক ও পারের ঝাপসা গাছপালার মধ্যে কি খুঁজল তারপর রাইহাণের হাতে দিয়ে বলল, মুশকিল হবে মনে হচ্ছে। দেখ। রাইহাণ দেখল। হুঁ। খবরটা ঠিকই। ওপারে লম্বা একফালি চর জাগছে। তার মানে মাল চলাচলের খরচ বাড়বে। ওরা আলোচনা করতে করতে তেঁতুলতলার দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে দশ থেকে ষোল বছরের পাঁচটি ছেলে মেয়ে খেলছে। কি খেলা কে জানে। পাতু, জলধর, টেনু, তুলাবতী আর লখিয়া। খেলা থামিয়ে একে অন্যের গা ঘেঁষে তেঁতুলগাছের আড়ালে দাঁড়াল।

পাতু বলল, ডর লাগছে।

লাগতেই পারে। সকলেরই গা কেমন ছম ছম করছে। বড়সড় অচেনা জানোয়ার দেখলে ছোট জন্তুরা যেমন পালাতে চায়। লখিয়া ওর হাত ধরে ছিল। বলল, হামাদের কাঁহুকে ধইরা লিয়া যায়তো কি করবিটে? টেনু মাটিতে একটা লাথি মারল।

—লিকনা। দেখি কে লিছে।

তুলাবতী এমন ফুলো ফুলো ফিট সাদা ঝকঝকে পোশাক পরা লোক দেখে অবাক। কোনদিন গাঁয়ের বাইরে যায়নি। এইতো জলধর কি ধানোক পাড়ার অন্য ছেলেরা। কি চেহারা! কালো কুলো। ভোঁতা নাক। এই ওকেই যদি ধরে তো খেয়ে ফেলবে? লোক দুটো কিছুটা এগিয়ে নিমগাছের নীচে দাঁড়ালো। পেছনে ভাঙা গম্বুজ। হয়ত সে-আমলের ওয়াচ টাওয়ার। মেলে ধরা থাবায় এঁটে যায় এমন ছোট ছোট গৌড়ী ইঁটের ভাঙাচোরা স্তূপ।

জায়গাটা ওদের পছন্দ হল। এটাচি থেকে চাদর বের করে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিল। মুখোমুখী আয়েস করে বসল দুজন। মাঝে হুইস্কি আর সোডার বোতল, ভাজা মাংস, চানাচুর, আদার কুচি এইসব।

মুনেশ্বর বোতলের মুখ খুলতে খুলতে বলল, এক্সকারশনের পক্ষে দারুণ স্পট মাইরি। তেঁতুলগাছের নীচে ওই ছেলে মেয়েগুলি বোধহয় রাখাল। ফিল্মের রাখাল বাঁশী বাজায়। রাধা নাচে।

—দুটো রাধাও আছে।

—হেই। উসকে দিয়ো না। মাত্র বিয়ে করেছি। তবে এসব হল বনের খাঁটি মাল। ফিগার ভাল। একটা একটু ফর্সাও আছে। চাইতো ডেকে নাও।

এরা বোধহয় ধানোক পাড়ার। তিন কিলোমিটারের মধ্যে গ্রাম বলতে ওই। মাঠে একটা লোক নেই দেখছ। ফসল কাটা শেষ হলে সব সুনসান।

সত্যি। অনাবৃত মাঠের গোপন করার কিছু নেই। বাধাহীন শীতের হাওয়া দু-একটা শুকনো পাতা নাচাতে নাচাতে কিছু দূরে নিয়ে ফেলে চলে যায়। ফিরেও তাকায় না। বিলের উপরের আস্তরণ শিউরে উঠে শির শির করে। ওরা বসে বসে মদ খেল আর পাঁচটি ছেলে-মেয়ে কিছুতেই খেলা জমাতে পারল না। ছাড়া ছাড়া হয়ে গেল। লোক দুটিকে ওরা চোরা-গোপ্তা দেখে নিচ্ছিল আর চোখে চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে হুই বাহা বলে গাই-বকরী সামাল দিচ্ছিল।

সূর্য নিমগাছের ডাইনে আস্তে আস্তে হেলে পড়ল। রোদের তাও লরমে গেছে। ভুখ লাগছে। ভাত খাউকি বেলা। ঘরে ফেরার সময় অথচ যাই যাই করেও ওরা দেরী করছিল।

লোক দুটোর মাথায় রঙিন বুদ বুদ টুশ টুশ ফাটছিল। রাইহাণ বলল, আর না, এরপর ড্রাইভ করে ফিরে যেতে অসুবিধা হবে। মুনেশ্বর শেষ মালটুকু দুটো গ্লাসে উপুর করে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—এই শেষ। ওই যে গাছে ঠেশ দিয়ে আছে মেয়েটা, রাতে ও পরী হয়ে যাবে।

রাইহাণ বলল, তোমার মাইরি নেশা হয়েছে। অত ফ্যাচ-ফ্যাচের কী আছে? যাওয়ার সময় তুলে নিয়ে যাব। যা ভাল লাগবে লুটে খাও।

ওরা দুজন ফুরফুরে মেজাজে জলের ধারে নেমে এল। রেঞ্জের মধ্যে কয়েকটা বেলে হাঁস। বড় চালাক পাখি। সাড়া পেল কি হু-উ-শ! মুনেশ্বর প্রায় শুয়ে পড়ে তাগ করল। ধোঁয়া। শব্দ। সবগুলি ডানা ঝটপট করে উড়াল দিল। একটা পারল না। কিছু দূর গিয়ে ঘুরে ঘুরে পড়ে গেল। মরেনি। তবে লেগেছে।

পাঁচটি ছেলে-মেয়েগুলির শব্দ শুনে এসেছে। গড়ের উপর থেকে ওদের ছায়া আঁকা-বাঁকা হয়ে জলে পড়েছে। লোকগুলিকে এখন ওদের ভয় করছে না। ওরাও পাখি মারে। ওদের মতো পালক ছাড়িয়ে খায়।

মুনেশ্বর আর রাইহাণ ইতস্তত করছে। জলে না নামলে পাখিটা তুলে আনার উপায় নেই। দুজনেই ঘুরে দাঁড়িয়ে গড়ের উপর ওদের দেখল। তারপর রাইহাণ হাত তুলে ডাকল—এ্যাই শুনে যা। পাঁচজন জংলি ছেলে-মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। না কেউ যাবে না। মুনেশ্বর এবার পার্স থেকে একটা নোট বের করল। দু' আঙ্গুলে তুলে ধরে চিৎকার করল,—

আয়—কে নিবি! ওরা আরও ঘন হয়ে দাঁড়াল। দুর্বোধ্য চোখে লোকগুলির দিকে চেয়ে রইল তুলাবতী, ওদের শুনিয়ে বলল, যাব নাইখো। উ পাখি হামরা তুলতে লারব। রাইহান বলল, স্ট্রেঞ্জ। চ্যাংরাগুলিতো আচ্ছা একগুঁয়ে।

মুনেশ্বর টাকাটা পার্সে ফেরৎ পাঠিয়ে জবাব দিল—ওতে হবে না। ভয় দেখালে তবে কাজ হবে।

ভয় দেখাবার জন্য তুলাবতীর দিকে বন্দুক তুলে ধরল—বারে বুনো তেঁতুল।

বয়সে টেনু সবচেয়ে বড়। ছিপ ছিপে চেহারা, গলায় কালো সুতোয় ঝোলানো তুকতাক করা নাটার বীচি। তুলাবতীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। তারপর লাফিয়ে ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে নেমে গেল জলে। কালো পাথরের মতো জল চিরে হাতের ঝাপটায় বেলা শেষের আলোর ফুলকি ছিটিয়ে ও পাখিটার কাছাকাছি পৌছে গেল। হাত বাড়ানো মাত্র ডানা ঝাপটে কয়েক হাত দূরে চলে গেল। টেনু পেছনে তাকালো তারপর আবার জল কেটে এগিয়ে গেল। এবারও পাখিটা ধরা দিল না। পাখির পেছন পেছন টেনু ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। ডানার ঝাপট। তোলপাড় জল। পালক বেঁয়ে গড়িয়ে পড়া কয়েক ফোঁটা রক্ত।

গড়ের উপর চারটি ছেলে-মেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। ওরা দেখল টেনু টাল খাচ্ছে। এলোমেলো হাত-পা ছুড়ছে। ওরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—টেনু-উ-উ।

টেনুর মনে হল পাখিটা ডাকছে। ক্কক ক্কক। কুয়াশার ওপারে।

লখিয়া শাড়ি খুলে রেখে জলে ঝাপ দিল। এমন জনপদের ভেতরের কথাটা বোধহয় সূর্য ডুবু ডুবু আবছা আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৃত্যুর মতো কালো ঠান্ডা জলে অনাবৃত দুই কিশোর-কিশোরী ডাঙার দিকে মুখ করে একে অন্যাকে ছুঁয়ে ভেসে থাকতে চাইছে। আর একনা টেনু। হঁ। হামরা বাঁইচা যাব। ঠিক তখন দুজন শহুরে লোক রক্তাক্ত শরীরে এলোমেলো ছুটছে, অন্ধ যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, আহত পশুর মতো গড়াতে গড়াতে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর গড়ের উপর জংলি ছেলে-মেয়ে বাদশাহী গম্বুজ ভেঙে ইঁট ছুঁড়ছে .... ছুঁড়ছে।

কাঠের পুতুল

খবর পেয়ে বিভাস এসে গেল। হুইস্কির বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, দারুণ জায়গা মাইরি। কতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা, জমিয়ে বসা যাবে। সন্ধের আগে কিন্তু নড়ছি না। তারপর কি দরকারে এখানে?

কল্যাণ গৌহাটি থেকে আজ সকালে এসেছে। বন-বিভাগের এই বাংলোর দুপাশ থেকে আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য এসে হাত ধরাধরি করেছে।

কল্যাণ বলল, বস। মিট কাইসুল আলম। জলপাইগুড়ির ডি. এফ. ও। ওরই সৌজন্যে এই অরণ্য বাস। বিভাস হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজেই নিজের পরিচয় দিল। কলাবাড়ি টি এস্টেটের ম্যানেজার। কল্যাণ আর ও কোলকাতার এক আড্ডার বন্ধু। কাইসুল বিস্ময় প্রকাশ করল, এত কাছাকাছি আছি অথচ আজই আলাপ। এ চাকরিতে আসার আগে আসামে একই কলেজে আমি আর কল্যাণ মাস্টারি করেছি।

বাইরে খোলা জায়গায় ঝলমলে রোদ গোলাপী ওড়নার মতো পড়ে আছে। কোমল তাপ। বনের ভেতরটা নজরে আসে না। অন্ধকারের জটলা। ওরা তিনজন বারান্দায় টেবিল সাজিয়ে বসল। এখানকার চৌকিদার খুব চৌকস। দরকার বুঝে লেবু, আদার কুচি, ভাজাভুজি হাজির করছে। বিভাস ওমলেটের একটা দিক দাঁতে কেটে বলল, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি কল্যাণ, লোকটা যতবার টেবিলের কাছে আসছে গোড়ালি ঠুকে বাও করছে। আলম বলল, ওর নাম জনক মেচ। চৌকিদারীতে বহাল হওয়ার আগে এক মিলিটারি অফিসারের কাছে ছিল। বনে এরা অনেক স্বাভাবিক। সিভিলাইজডদের কাছে যা শেখে তাতেই বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। সেই যে সঞ্জীব চাটুয্যে লিখেছেন 'বন্যেরা বনে সুন্দর।'......

বিভাস বলল, ট্রাইবাল মেয়েরা বনের বাইরেও সুন্দর। আই মিন ইন্টারেস্টিং। শরীরে মহুয়ার গন্ধ। আমার তখন বিয়ে হয়নি। একটা কোড়া মেয়ে রান্না করে দেয় আর রাতে শোয়। ক'দিন থেকে দেখি এক কোড়া পুরুষ আসে আর বাবুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুজনে ফিসফাস চলে। সভ্য সমাজে লাভ এবং জেলাসি বলে দুটো শব্দ আছে। মেয়েটার প্রতি একটা এটাচমেন্ট অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। রাতে বললাম, ওই লোক আবার এলে চাবকে বিদায় করব। সোমরা জানাল ওই ওর স্বামী। পাওনা চাইতে এসেছে। কিসের পাওনা? অন্য লোক পেটে বাচ্চা রাখলে স্বামীর কিছু প্রাপ্য হয়। দুটো ছাগল আর এক বস্তা ধান আমাকে দিতে হবে।

কাইসুল গ্লাসে ছোট সিপ করে বলল, বুনোদের কাছে শরীরের নিয়মে সব নিয়ম। হৃদয়ের ব্যাপারটা কিছু নয়।

কল্যাণ জানতে চাইল, তারপর মেয়েটার কি করলে?

—প্রেগনেন্ট হয়েইতো বিপদ ঘটাল। আমরা কি সন্তানের জন্য শরীর চাই? সোমরাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে ওর স্বামীর সঙ্গে বিদায় দিলাম। ব্যাপারটা কিন্তু

ওখানে শেষ হল না। কিছু দিন পর বাগানের নালার মধ্যে একটা মড়া বাচ্চা পাওয়া গেল। ফর্সা। উঁচু নাক। এই আমার মতো।

কল্যাণ আর এক পেগ করে সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, মেরে ফেলে রে। রক্তের মেশামেশি ওদের সমাজ মেনে নেয় না।

কাইসুল বলল, ক্লোজড সমাজ ব্যবস্থা বলেই ওদের জন্মের হার অত্যন্ত কম। ছেলেবেলায় মরেও খুব। বণ্ডেড লেবারের বাজার এই ভারতে আজও আছে। অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি হয়। আমার ফুফার এক দাস ছিল। আমার বয়সী। তখন আমার আর কত হবে? দশ কি এগার। ফুফাত ভাইরা মজা করার জন্য টোপ সমেতো বড়সী গিলতে ওকে বাধ্য করেছিল। খুব কষ্ট পেয়ে মরল ছেলেটা। না না, বড় নয় ছোট পেগ দাও। বিভাস বোতলটা তুলে ধরে নাড়া দিয়ে দেখল—শেষ হতে চল্লরে। লাইফ ইজ বাট এন এম্পটি ড্রিম। আগেও কিছু ছিল না, পরে কিছু থাকে না। জানিস কল্যাণ তোকে একদিন আমি মনে মনে খুব হিংসে করতাম?

কল্যাণ এক পসলা ঝিপ ঝিপ হাসল।—কার জন্য রে? অপা? ও এখন ধানবাদের এস. বি. আই ম্যানেজার। ওজন দুশ দশ পাউণ্ড। রক্তে কোলেস্টেরল ঠিক রাখতে সূর্যমুখী তেল খায়।

—ধূর। তোরা তাই ভাবতিস। আসলে হিংসে করতাম তোর মার জন্য। আমার তো মা ছিল না। বাবা মাঝে মাঝে বেত হাতে মাসিকে মা ডাকতে বাধ্য করলে আমার খুব কষ্ট হত আর তোর ওপর হিংসে হত।

কল্যাণ এটাচি খুলে আর একটা বোতল টেবিলের ওপর রেখে বলল—

—এখন তোকে আমি হিংসে করি। তোর বউ আছে, ছেলে আছে। আমার নেই। চিয়ার আপ বয়। চাকা উল্টে যায়। বনের লোকগুলিকে ভয় করার সময় বোধহয় এসে গেছে।

আলম বলল, হ্যাঁ। ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। আগে ওরা ওই যে নীচে গ্রামগুলি আর আল বাঁধা খেত দেখা যাচ্ছে ওখানে ছিল। ওরাই বন কেটে জমি করেছে। তারপর সেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে বন যতদূর সরে যাচ্ছে ততদূর ওরাও হটে যাচ্ছে। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে বাঘ আর গণ্ডারের মতো ওদেরও প্রটেকশন দরকার। অভয়ারণ্য চাই। শেষগাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে হাতে বল্লম তুলে নিচ্ছে।

চৌকিদার টেবিলের ওপর একপ্লেট গরমে মিটবল রেখে গোড়ালি ক্লিক করে বলল, সাব খানা কি তিনজনের করব? বিভাস একটা মিটবল তুলে নিয়ে বলল, খুব খাচ্ছি। আর কিছু না খেলেও চলবে। কল্যাণ পার্স থেকে একটা পঞ্চাশ ছুঁড়ে দিয়ে তিনটে আঙুল তুলে চৌকিদারকে দেখাল। আলম জানাল খেতে ওর ইচ্ছে নেই। তবে লাইট কিছু। মুরগীর ঝোল আর পাওয়া গেলে টক দই। আগে সাহেবরা এখানে শিকারে এসে ওয়াইল্ড মিট খেতেন। বুনোরা গিরগিটি গো-সাপ মেরে খায়। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বারসিঙা মেরে বসে। কাছেই একবার একটা তীর বেঁধা গণ্ডার পাওয়া গেছিল। পেছনে বুদ্ধিমান চপাররা থাকে যাদের কিছু হয় না। জেল খাটে বুনোরা, চৌকিদার নিঃশব্দে চলে গেল। ওর চাউনিটা কি জানি কেন বিভাসের ভাল লাগল না।

খাওয়াটা কোনরকমে ফেলে ছড়িয়ে নিয়ে ওরা আবার বসল। পাহাড়ের ছায়া নীচের চষাক্ষেত একটু একটু করে গ্রাস করছে। বনের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। ফুরফুরে নেশায় গন্ধটা ভালই লাগে। কল্যাণ বলল, আর না বিভাস। এরপর সব ঝাপসা দেখব। একবার বর্মা সীমান্তের এক-আধা কুকী আধা শান গ্রামে লতা-পাতা মেশানো ছাং খেয়ে তিনি দিন উঠতে পারিনি। এক মরুঙ্গে পড়েছিলাম। মরুঙ্গ গ্রামের আউট হাউস। একাধারে অস্ত্রাগার এবং কুমারদের আবাস। ওই অবস্থায় মনে হত একটা অদ্ভুত জন্তু জুল জুল করে চেয়ে আছে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার নজরে এসেছিল যার জের টেনে আজ এখানে এসেছি। মাস-কমিউনিকেশনের আদিম পদ্ধতি আছে। মিস্টিরিয়াস। একটা গাছের ডাল অথবা একটা জন্তুর হাড় পাহাড়ে জঙ্গলে দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে দিতে পারে। ট্রাইব বিশেষে সিগন্যালের ধরণ ও মাধ্যম আলাদা হয়। ওখানেই এমন একটা জিনিস পেয়েছি যা পৃথিবীর সমস্ত উপজাতির কাছে কমন। এটাচি খুলে কল্যাণ একটা কাঠের মূর্তি বের করল। দুই ইঞ্চি চওড়া ছয় ইঞ্চি লম্বা। কালো। সাদা গোল গোল চোখ।

বিভাস বলল, যাঃ এতো পাহাড়ি হাটের পুতুল। আলম হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। হুঁ! সাদামাটা তবে বুকের কাছে তিনটে ছেদা আছে। এই বোধহয় সংকেত।

কল্যাণ বলল, এটা সেই আধা শান আধা কুকি গ্রামের। বর্মার উপজাতি বিদ্রোহ ওই পর্যন্ত এসেছিল। এর ভাষা এখানকার বুনোরা চেনে কিনা দেখব।

আলম বলল, এ আর এমন কি কথা। আমাদের চৌকিদারকে ডেকে দেখালেই হয়। লোকটা বিশ্বাসী।

কেরোসিন ল্যাম্প টেবিলে রেখে চৌকিদার চলে যাচ্ছিল। আলম ওকে ডাকল। কল্যাণ মূর্তিটা আলোর সামনে তুলে ধরে বলল, এমন পুতুল আগে কোথাও দেখেছ?

—জি না।

—ঠিক আছে তুমি যাও।

চৌকিদার একটু ইতস্তত করে চলে যাওয়ার সময় ঘাড় ফিরিয়ে মূর্তিটা আর একবার দেখল।

বিভাস হো হো করে হাসল।

—তোর পরীক্ষাটা প্রথমেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কল্যাণ। তবে অনেক অনেক দিন পর দারুণ জমাট আড্ডা দেওয়া গেল।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের সার কমা চিহ্নের মতো ক্ষীণ চাঁদের পাশে স্থির হয়ে আছে। রাতের বন থেকে ঝা ঝা শব্দ উঠে আসছে। কল্যাণ বলল, এবার থাক বিভাস। আউট হয়ে যাবি।

বিভাস কি বুঝে হা হা করে হাসল। আলম চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। —গুড নাইট কল্যাণ। চল বিভাস।

ওদের সঙ্গে কল্যাণ গাড়ি পর্যন্ত এল সি-অফ করতে। গাড়িতে বসে বিভাস হাই তুলল।—বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ধুর শালা ভদ্র হতে গিয়ে শামুকের মতো গুটিয়ে যেতে বসেছি। আলম গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল। গুর গুর শব্দ তুলে হেঁচকি

দিয়ে থেমে গেল। স্টার্ট নিল না। কয়েকবার চেষ্টা করেও হল না। আলম বনেট খুলে এটা-ওটা টিপল। আবার উঠে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল।

জোর হাওয়া দিতে শুরু করল। চাঁদের গায়ে হুমড়ি খেয়ে মেঘ সব অন্ধকার করে দিল। কল্যাণ বিভাসকে ডাকল—নেমে আয়। ঠেলে দেখি।

বিভাস আচ্ছন্নের মতো জবাব দিল, হুঁ। একটা রাতচরা পাখি ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ঠিক সেই সময় সেই শব্দটা উঠল। হার্ট-বিটের মতো দ্রিম-দ্রিম, দ্রিম-দ্রিম।

আলম অনেকটা আত্মগত ভাবে বলল, আরে, এতো সেই বুনোদের নাকাড়ার আওয়াজ। উত্তরের অন্ধকার পাহাড়ের বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছে।

বিভাস মন্তব্য করল, বুনোদের গ্রামে কিছু হয়েছে। এটা ওদের ব্যাটল ড্রাম। আলম স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে এসে ওদের দুজনের পাশে দাঁড়াল। ওকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে—আশ্চর্য এমন তো হওয়ার কথা নয়।

—কি? বিভাস জানতে চাইল।

কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে। যা হওয়ার কথা নয়। ঠিক ধরতে পারছি না। এমনভাবে মোটর অচল হয়ে গেল। আশ্চর্য।

দ্রিম দ্রিম। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। কল্যাণ জানতে চাইল কাছাকাছি কোথাও মিস্ত্রি আছে কিনা। আলম এদিককার সব জানে। ও মাথা নাড়ল। চাবি বন্ধ করে পকেটে পুরে বলল, চল। আপাতত ডাকবাংলোয় ফিরে যাই। ওখানে বসে উপায়ের কথা ভাবা যাবে। এই দ্রিম দ্রিম শব্দটা বড্ড একঘেয়ে। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে।

বিভাসের গলায় বিরক্তি। বাজে। একদম বাজে। পাহাড়ি উপজাতির লোকগুলি এমনিতে শান্ত। কিন্তু এই ব্যাটল ড্রামের আওয়াজে ওরা ভীষণ হিংস্র হয়ে যায়।

ওরা তিনজন নির্বাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে আবার ফিরে আসছে।

ডাকবাংলোয় ফিরে এসে আলম বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল—চৌকিদার, চৌকিদার?

কোথাও কোনও সাড়া নেই। ঘরে ঢুকে কল্যাণ টেবিলের উপর ঝুঁকে বলল, বিভাস, আমার সেই মূর্তিটা?

—মিসিং?

—ইয়েস। এইতো এখানেই রেখেছিলাম—

চৌকিদার বেপাত্তা। মূর্তিও মিসিং। আলমের গলায় ক্ষোভ ও বিরক্তি ফুটে উঠল। না কল্যাণ প্রিকশন না নিয়ে এরকম মারাত্মক পরীক্ষা করা ঠিক হয়নি।

—আঃ। পরীক্ষা তা হলে সাকসেসফুল?

বিভাস বলল, খুশি হওয়ার সময় পাবে না কল্যাণ। শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ ওরা শুনতে পাচ্ছে। এবার আওয়াজ দুদিক থেকে হতে শুরু করেছে। আলমের ভয়ার্ত গলা—চুপ। চেঁচামেচি করে লাভ নেই। উই আর ট্র্যাপড্। দেখতে পাচ্ছ গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে মশালের ছুটোছুটি?

—চল এখান থেকে পালাই।

—কোথায় পালাবে? দে আর মুভিং টুওয়ার্ডস আস।

—ওঃ কি ক্রুয়েল এন্ড। কল্যাণ, এর জন্য তুই দায়ী।

—না। আমি তো কেবল পরীক্ষাটা করে দেখতে চেয়েছি। দায়ী তোমরা।

আলম আর বিভাস দুজনেই একসঙ্গে বলল, আমরা?

—হ্যাঁ তোমরা। তবে তিনজনেরই রক্ত আজ রাতের পর টেবিলের নীচে দেয়ালের গায় কালো হয়ে জমে থাকবে। এবার ওদের হল্লার আওয়াজটা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। মাই এক্সপেরিমেন্ট ইজ সাকসেসফুল। সো আই এম হ্যাপী। এই কথাগুলি আমি এখন ডায়েরিতে লিখে রাখব।

আলম দু-হাতে নিজের চুল মুঠো করে ভাঙা গলায় বলল, আর ইউ ক্রেজি? তুমি জেনেশুনে আমাদের ডেকে এনেছ।

বিভাস লাফিয়ে উঠে চিৎকার করল, ইউ স্কাউন্ড্রেল।

কল্যাণ খুব ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, না বিভাস। উত্তেজনায়, ভয়ে, স্ল্যাং ইউজ করে লাভ নেই। তোর অপরাধ নেই? তুই সেই কোড়া মেয়েটাকে নষ্ট করে ছুঁড়ে ফেলে দিসনি?

—সে তো আমাদের অনেকেই করে—

—ও সব জমা হয়। তারপর অনেককেই তার দাম দিতে হয়। আর আলম, তোমার ফুফাত ভাইরা সেই ট্রাইব্যাল ছেলেটাকে বড়সী গিলতে বাধ্য করে তিলে তিলে খুন করে নি?

—তাতে আমার কি?

—তোমাকে এবং আমাদের সবাইকে আজ রাতে তার জবাব দিহি করতে হবে।

—এখান থেকে পালাবার পথ আছে?

আলম হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়ল, না। নীচে গভীর খাদ। সামনে পাহাড়, বন। দুপাশে ট্রাইব্যাল গ্রাম।

—দেন লেট আস হোপ এগেন্স্ট হোপ। ভাল বা মন্দ যাই হোক এস আমরা আরও মদ খাই। মাতাল বেহেড হয়ে গেলে ভয় থাকে না। এনিহিলেশনের ভয়ে আমরা মদ খাই আর প্রার্থনা করি।

দ্রিম দ্রিম শব্দটা একসময় মন্থর হয়ে থেমে গেল। রাত গাঢ় হয়েছে। চৌকিদার এসে দরজায় টোকা দিল, সাব। বিভাস মাটিতে উপুর হয়ে মুখ ঘষছে। আলম উঠে দাঁড়িয়ে টলছে। চৌকিদার আবার ডাকল—সাব, আমাদের বস্তিতে দলছুট হাতি ঢুকে পড়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। তাড়িয়ে ফিরে আসতে দেরি হল। কসুর মাপ করবেন।

কল্যাণ ভয়ানক কষ্টে বলল, তাই? শুধু দলছুট একটা হাতির জন্য এত? আমার সেই কাঠের পুতুলটা?

চৌকিদার প্যান্টের পকেট থেকে পুতুলটা বের করে বলল, আমার লেড়কা খেলতে নিয়েছিল সাব।

কেয়ার ডাইরি থেকে কয়েক পাতা

॥ ২২শে ফেব্রুয়ারী॥

জয়ন্তকে বললাম পরীক্ষাটা শুরু হোক। আজই। শুনে ওর পিলে চমকে যাওয়ার অবস্থা। পুরুষ তো। উইমেন লিবের যত সমর্থন করুক দশহাজার বছরের সংস্কার ছেড়ে ফেলা এত কী সহজ? তোমার ওখানে গিয়ে উঠি? কি বল? না? বেশ আমার এখানে চলে এসো। একবেলা তুমি রাঁধবে একবেলা আমি। বিছানাটা একটু বড় করে নিলেই চলবে। এক বছরের চুক্তি। তবে হ্যাঁ, বাচ্চা চাইতে পারবে না। কোনও মতেই না। রাজি?

॥ ২৬শে ফেব্রুয়ারী॥

জয়ের বড়দি আমাদের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু কথা শুনিয়ে গেলেন। শুভানুধ্যায়ীরা একে একে আসবেন। তৈরি আছি। ভাগ্য ভাল আমার তরফে কোনও অভিভাবক নেই।

॥ ১০ই মার্চ॥

উর্বশীর এই সংখ্যার সম্পাদকীয় বিতর্কের ঝড় তুলেছে। লেখার আগে জয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। ওকে বললাম, পরিবার বলে কিছু থাকবে না। ট্রেন্ড দেখে বুঝতে পারছ না? যৌথ পরিবার ভেঙেছে। স্বামী নিয়ন্ত্রিত পরিবারও ভাঙবে। ও অসহিষ্ণু হয়ে বলল, এই যে আমরা দুজন একসঙ্গে আছি? আমি হো হো করে হাসলাম, তুমি কী নিজেকে স্বামী মনে কর? ছিঃ জয়। তুমি আমার বন্ধু। আমরা কিছুদিন পরস্পরকে ভালবাসব। শরীর দেব নেব। ব্যস। গত মহাযুদ্ধে মেয়েরা অফিসে কারখানায় পুরুষের জায়গা পূরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। একবার বাইরে এনে আর কী হেঁসেলে ফেরৎ পাঠানো যায়? মেয়েরা বউ হতে চাইলে তবে তো বউ পোড়াবে, পণ নেবে, তালাক দেবে? জয় ওর শক্ত মুঠো থেকে আমার হাত আলাগা করে দিয়ে বলল, বিয়েটা বাদ দিলে পরিবার প্রথাটা নয় বাদ গেল। কিন্তু কেউ সন্তান চাইবে না তাই কী হয়? তখন? স্নেহ নামে একটা বিষম বস্তু গোলযোগ বাঁধিয়ে তুলবে না? আমি স্বীকার করলাম, হ্যাঁ, উইমেন লিবের সামনে এটাই কঠিনতম প্রশ্ন। এর জবাব খুঁজতে হবে মেয়েদের গর্ভের বাইরে। যুদ্ধ আমাদের পর্দা ছিঁড়েছে। বিপ্লব সম্পত্তি বোধের বিনাশের পথ খুলে দিয়েছে। টেকনোলজি হেঁসেলকে সহজ করেছে। বিজ্ঞান সন্তান না চাওয়ার উপায় দিয়েছে। জয় বলল, ভবিষ্যতের মানুষ কী আকাশ থেকে পড়বে না আমরা চির যৌবন পাব? ওঃ জয় তোমাকে দেখে আমার তো এখনি মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

॥ ১৬ই এপ্রিল ॥

চাঁপার মা কাজ ছেড়ে দিতে চাইছে। অকৃতজ্ঞ। না। শব্দটা বোধহয় ঠিক হল না। অজ্ঞ। অজ্ঞতার শিকার। চাঁপাকে ওর মাতাল লম্পট স্বামীবাহাদুর রোজ পিটত। লড়াই করে ছিনিয়ে এনে উর্বশী প্রেসে কাজ দিয়েছি। মাইনে পেয়ে সেই স্বামীকে চুপি চুপি টাকা দিয়ে এলো। লক্ষ করেছি আমরা দুজন একসঙ্গে থাকলে চাঁপার মা বিচ্ছিরি ভাবে তাকায়। আজ তো বলেই ফেলল, কপালে একটু সিঁদুর ঘষে নাও দিদি। লোকেরা খুব খারাপ বলছে।

—তুমি কি বলছ?

—আমি আর কি বলব? সমাজ হচ্ছে বেড়াল-চোখো। আলোর চেয়ে অন্ধকারে বেশি দেখতে পায়। পাপ কি লুকোছাপা থাকে? ট্র্যাশ! এদের বোঝাতে কত বছর লাগবে? জয় বলল, বিশাল পাথর। ওরা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করবে, উর্বশী ঠেলবে, আর হ্যাঁ আইন নামে একটা বুলডোজারও চাই। তবে হবে। কবে?

॥ ১লা মে ॥

আজ আমরা চমৎকার মে দিন করলাম। মেয়েদের মে দিন। ইতিহাসের প্রথম ও বৃহত্তম শৃঙ্খলিত শ্রেণির। লিশা আর জয়ের খুব কথা কাটাকাটি হল।

॥ ২রা মে ॥

জয় কি নিজেকে লম্পট মনে করে? লিশার সঙ্গে ওর এত কি কথা? এ রকম মেয়ে উর্বশীর আইডিয়াটা ভেঙে তচনচ করে দেবে। ওকে নিয়ে চলা অসম্ভব।

॥ ৫ই মে ॥

আমার জন্মদিন একান্তে জয়কে নিয়ে কাটল। 'সিমন বেভোয়ার' বইটা উপহার পেলাম। আদর দিয়ে মাথা খাচ্ছ, ওকে বললাম। তারপর? সুখের গভীরে কোথাও কান্নার জল আছে। মাইথনে কত পাখি। ডিম পাড়ার আগে সঙ্গী খুঁজে নেয়। শাবকের পাখায় পালক গজালে দুজন দুদিকে উড়ে যায়। আমাদের কি মুশকিল। শিশু মানুষ হতে হতে মার যৌবন শেষ। আর কিছুদিন পর আমাকেও উড়ে যেতে হবে। না জয়, দুজনের মাঝে একটা টাপুশ-টুপুশ শিশু হাত-পা ছুঁড়ুক এ আমি চাই না।

॥ ১০ই জুন ॥

কাল আমরা থানা ঘেরাও করব। এ আত্মহত্যা নয়, হত্যা। ভাসুর-দেওর-স্বামী সবাইকে এক্ষুনি অ্যারেস্ট করতে হবে। বীনা আগরওয়াল খুন হওয়ার আগে তুমি কাউকে খুন করতে পারলে না? ওই বিপুল বিত্তের আড়ালে এমন এক সর্বহারা নারী। আঃ। জয়, মুম্বে কনফারেন্সে তোমাকে আমি নিয়ে যাব। আমার সেক্রেটারি এই পরিচয়ে। লিশা যাচ্ছে না।

॥ ২০ শে জুলাই ॥

রোশেনারা বেগম আসলে মেয়ে নয়। ছেলের ছদ্মনাম। ওই নামে একজন পুরুষ আত্মপরিচয় দিলে কে-না চমকে ওঠে? আসল নাম?—ইয়াকুব আলি। মেয়েদের

অভিজ্ঞতা পেলেন কোথায় যে অমন একটা প্রবন্ধ লিখলেন?—পেয়ে যাই। মেয়েদের সঙ্গেই তো কাটাই। বিবি আছে, বোন আছে। আমি বললাম, তাই কি হয়? যে কথাগুলো শুধু মেয়েরা জানে তা আপনি জানলেন কি করে? আলি সাহেব দিল খুলে হাসলেন। মিস, আপনি জানেন না পুরুষদের কথা? কি করে জানেন?

লোকটা বেশ। আমি অবশ্য ওঁকে বুঝতে দিলাম যে মেয়েদের ছদ্মনামে লেখায় আমি বিরক্ত। যত ভাল লেখাই হোক।

॥ ৩রা আগস্ট॥

আলিঁ সাহব ঘন ঘন আসছেন ইদানীং। লোকটা গুনী এবং স্মার্ট। খুব হাসালেন। ওঁর চাচি নাকি একবার মাস্তান ঠেঙিয়ে পাট পাট করেছিলেন প্যাকাটে লম্বা চাচাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে। চাচার কি হল? স্টিফ হয়ে ছিলেন। চাচি আবার ময়দার মতো ঠেশে নরম করলেন। ক্রিকেটের গল্পগুলি তো দারুণ। মেছো জাপানে নাকি মুরগীকে মাছ খাইয়ে ফাউলে মাছের স্বাদ গন্ধ আনা হয়। রমা, রাবেয়া, লিডিয়া তো ওঁকে গল্পের জন্য আলঠে তোলে। লোকটাকে দলে পেলে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে সুবিধে হবে।

॥ ৫ই সেপ্টেম্বর॥

মিছিলে আলি আমার পাশেই ছিল।

॥ ১০ই অক্টোবর॥

জয়, তুমি কাছে থেকেও দূরে সরে যাচ্ছ। তুমি জেলাস হলে, আলির সঙ্গে মারপিট বাঁধিয়ে বসলে আমি হয়ত খুশি হতাম। কি বলতে চাও জয়? বল। কিছু অভিযোগের কথা বল। উৎপীড়কের প্রাচীন আত্মা বুকের মধ্যে পুরে চুপ করে আছ। যা-তা করে রান্না করেছ আজ। নিজেও কি ঠিক মতো খেলে?

॥ ২৭শে নভেম্বর॥

আলিকে বললাম এর পরের চুক্তিটা তোমার সঙ্গে। ও বলল, ধ্যাৎ। জয় একটু আঘাত পেলে ভাল লাগত। খুব হাসল, আলি তোমার কপাল ভাল্। আমি আর কেয়া পরীক্ষাটা প্রায় শেষ করে এনেছি। বিয়ে ছাড়া পরিবার ছাড়া আগামী সমাজের সেকস্ ভালবাসা এবং সম-সম্পর্কের মডেল। ভালয় ভালয় বাকি কটা দিন কাটলে হয়। আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম, এ কথার মানে?

ও বলল, কনগ্র্যাচুলেশন আলি।

রাতে আমি জয়কে বললাম, তুমি কি আমাকে মারবে?

—কেন কেয়া?

—আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি জয়।

—হ্যাঁট। কষ্ট কি? এ তো চুক্তিতেই আছে। তুমি ভেবনা লিশাকে নিয়ে আমি এইরকমই কিছু করতে চাই।

তারপর জয় আমাকে রোবটের মতো দু'হাতে তুলে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রোবটের মতো আচরণ কল।

।। ৬ই ডিসেম্বর।।

লিশাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম জয়কে চিয়ার-আপ করতে। চুক্তিটা আগে ভেঙে গেলে আমরা হেরে যাব। উইমেন লিব পিছিয়ে পড়বে। আমরা আদর্শের জন্য লড়ছি। লিশাকে বললাম মেয়েদের লড়াইয়ে পুরুষকে পেতে হবে। জয়ের মতো করে। জয় উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। সন্ধ্যা নেমেছে। শাদা রেখা টেনে জেট উড়ে যাচ্ছে। দুরন্ত গতির মধ্যে আমরা একটা জায়গায় আপাতত স্থির হয়ে আছি। একটু পরে আকাশ ছেয়ে সেই কবেকার নক্ষত্রগুলি ঝকমক করে উঠবে। তীর ধনুক হাতে কালপুরুষ আমাদের খুব ছোট ছোট ভাসমান সুখগুলির দিকে তাকিয়ে থাকবে। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। সে বিষণ্ণ প্রতিমা। না জয়, মুক্তি আমার ভীষণ প্রয়োজন। মার মুক্তি। এ ছাড়া আর কি চাই? তুমি চলে গেলে আমার একটুও কষ্ট হবে না। প্রমিস।

।। ২২শে ফেব্রুয়ারী।।

রাত থাকতেই জয় উঠে পড়েছে। আমাদের চুক্তির শেষ কয়েক ঘণ্টা। স্নান করে নিচ্ছে। আমি স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে ওর এটাচি গুছচ্ছি। ঝাঁ ঝাঁ শব্দ উঠছে। এই শব্দটা আমি মনে রাখব। চলে যাওয়ার শব্দ। ভোর ছটায় আলি গাড়ি নিয়ে আসবে। আপাতত বর্ধমানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। তারপর কোথায় থাকবে জানি না। জয় বেশি জল ঢেল না। ঠান্ডা লাগবে।

—হুঁ।

—ওষুধটা মনে করে খেও।

—হুঁ।

—এটাচিতে দুটো আপেল আর বিস্কুট রইল।

—হুঁ।

—ভাল থেকে জয়। বিকেলে বেরুবার সময় সোয়েটার পরো। আর শোনো, কাছে এসো, যাওয়ার আগে একটু আদর করবে না? সেই প্রথম দিনের মতো? আর... আর একটা জিনিস চাইব। দেবে?

—কি?

—শোন,আমাদেরও বয়স হবে। খুব নিঃসঙ্গ হয়ে যাব। আমাদের পরও পৃথিবীতে মানুষ চাই। যারা ভালবাসবে, হাসবে, কাঁদবে। আমরা যা পারিনি ওরা পারবে। আমাদের সন্তানরা। তুমি আমাকে মা হতে দাও।

জন্মের সেই প্রবাহটা যেখানে—লাফ দিয়ে প্রপাত হয়ে যায় সেখানে সব বর্ণ, গন্ধ, শব্দ আচ্ছন্ন করা শক্তির প্রবল তাড়নায় একটা বোকা মেয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকল।

আলি নিচে ঘন ঘন বেল টিপছে।

পশ্চিমের মালভূমির জীবনচক্র

সোনামণি বাঁকে ঝোলানো ঝুড়িতে দুলতে দুলতে কখন মরে গেল। আগেই ঘা থেকে পচাগন্ধ ছুটছিল। দুটো হাত বুক আর মুখের অনেকটা পোড়া। একটা মহুয়া গাছের নীচে কাচ্চা-বাচ্চা মিলিয়ে তিরিশজনের দলটা জড়ো হয়েছিল। বনের মধ্যে দুপুরের সূর্য তার তেজের অনেকটা খুইয়ে ফেলে ছায়ার জালের মধ্যে ছটফট করে। মাথার ওপর ডালপালা এলোমেলো হাওয়ায় দোল খায়। তালাই কাঁথা, বোঁচকাবুঁচকি, মাটির হাঁড়ি, লোহার কড়াই মাঝখানে রেখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে ওরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। তার পর মেয়েরা শাক, পাতা, কন্দ সেদ্দ করতে বসে যায়, পুরুষরা জল এনে দেয়, শুকনো ডালপালা জোগাড় করে। যাসু দেখল বউটা ওর পুটুলির মতো হয়ে গেছে। এলোমেলো চুলে চোখমুখ ঢাকা পড়েছে। পোড়া পোড়া বাঁকানো আঙুল দিয়ে বুকের বাঁদিকের মাংসপিণ্ড খামচে ধরেছে। মরার আগে ওই জায়গায় বোধহয় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। মৌ-ফুলের মাতাল করা গন্ধ। পাখ-পাখালির কিচির-মিচির। যাসু স্তম্ভিত হয়ে সোনামণির মুখ দেখছিল। মানদা এগিয়ে এসে ভাল করে নজর বুলিয়ে বুঝতে পেরে হা হা করে চিৎকার করে উঠল।

ওপাশ থেকে আনু জিজ্ঞেস করল, কি বটে?

—সোনা মইরেছে।

—হুঁ।

পাঁচু লখন বুঠিয়া সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল। যাসু বউটার বুক থেকে হাতের মুঠো আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে ঠান্ডা শরীরটাকে জাপ্টে ধরে যত্নে ঘাসের উপর শুইয়ে দিতে দিতে আঁ আঁ শব্দ করছিল। আহত পশুর মতো। মানুষ এ ভাবে কাঁদে না।

একটু দূরে দলটার সঙ্গে আসা তিনটি কুকুর নিজেদের মধ্যে আলাপ-সালাপ করছিল।

লালু ঃ মরবে জানত। তবু দেখ বাঁকে করে কাঁধে ঝুলিয়ে এত দূর বয়ে এনেছে।

ঝালী ঃ মানুষের বুদ্ধি এরকমই। পাঁচবার সূর্য ডুবল। দক্ষিণে কোথায় যে যাচ্ছি কে জানে।

কালু ঃ বাঁকা বস্তিতে বেশ ছিলাম রে। সে রাতে বন্দুক সড়কি নিয়ে চারপাশ ঘিরে ঘরে আগুন লাগাল যে। নইলে এ ভাবে আসতে হত?

লালু ঃ ঠাকুররা হরিজন পোড়ায়। এ ওদের শিকার খেলা।

ঝালী ঃ শিকার করে তা নয় বুঝলাম। খায় না ত।

কালু ঃ দূর খাবে কেন? ঠাকুর মহাজনরা মাংস খায়? দুধ ঘিও খায়। তা ছাড়া খেতে হলে ছুঁতে হবে না? হরিজন ছোঁবে?

ঝালী ঃ তা ঠিক। তবে ব্রীজলাল ঠাকুর দোসাদদের গজ্জী বুড়ির বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে শুনেছি। ওর দুধ মা। আসল মা গলায় দড়ি দিয়ে মরার পর গজ্জী ওকে দুধ দিত। ওর বাপের সঙ্গে শুয়ে তবে তো লখনাকে জন্ম দিল। সঙ্গে শুতে বা দুধ খেতে ছুঁতে হয় না? আমার দিদিমা এসব নিজের চোখে দেখেছে। সে ছিল ব্রীজলালের বাপের পোষ্য।

লালু ঃ বস্তিতে আগুন দেওয়ার সময় ব্রীজলাল দূরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছিল। আমি ভুক ভুক করলামতো ঢিল ছুঁড়ল।

কালু ঃ তার আগের দিন সোনামণির হাত ধরে নদীর ধারে টানাটানি করছিল। সোনামণি লাথ মেরেছিল, তাইতে গোসা হল বোধহয়।

কালী ঃ হরিজন মেয়ের লাথ খেলে তো গোসা হবেই। তবে আমার মালিক আর মালকান বলাবলি করছিল আর বেগার খাটতে যাবে না। এই নিয়েই তো প্রথম মারপিট।

লালু ঃ ঠাকুররা প্রথম হেরে গিয়েছিল।

ঝালী ঃ হ্যাঁ, শেষে দারোগা এসে ওদের জেতায় আর ওদের দালানে বসে খানাপিনা হইহল্লা করে।

বুধিয়া এদিক-ওদিক ঘুরে কিছু জংলি ফুল তুলল। কবর দেওয়ার আগে সোনামণিকে সাজাবে। ও পাশে পুরুষেরা অগভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। মাটি চাপা দেওয়ার সময় কেউ কাঁদল না। বস্তিতে থাকলে সবাই গোল হয়ে বুক চাপড়ে বিলাপ করত। সামনের দিনগুলিতে কি আছে ওদের জানা নেই। এমন অনিশ্চিত অবস্থায় চোখে জল আসে না। ব্যাপারটা দ্রুত চুকে যাওয়ার পর যাসু একটি হাতে কুড়াল তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘুরিয়ে বল্ল ঃ চল্লম।

বুধিয়া খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল, কোথাকে যাবি?

—বাকা বস্তি

—যাবি তো আলি কেন? ইস কি মরদ রে। হাত কুড়ালি লিয়ে একা লড়াই দিতে যাচ্ছিস? এই লখনা। কি দেখছিস? ধর ওকে। সামাল দে। খেপি গেইছে।

সবাই হা হা করে উঠল। তখনকার মতো যাসুর যাওয়া হল না। সারা রাত দুহাটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল। ভোরে ওকে আর দেখা গেল না।

আরও তিন দিন চলতে চলতে বন ক্রমশ পাতলা হয়ে এলো। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় ঘাসে ঢাকা ছোট ছোট টিলা। এক রাতে আগুন নিভে গিয়েছিল। একপাল হেরোল নিঃশব্দে ঘিরে ধরেছিল। কুকুরগুলি প্রাণপণ চিৎকার করে জাগিয়ে রেখেছিল ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলিকে। যেন এর চেয়ে বেশি হিংস্র হয় না।

অবশেষে সেই কিংবদন্তীর নদীটা চোখে পড়ল। কবেকার স্মৃতির মতো কুয়াশায় ছমছম করা নদী। প্রথমে গাছপালার ফাঁকে কিছু ধোঁয়া ধোঁয়া। আর একটু এগিয়ে

জলের কলকল শব্দ। তারপর সেই রুপালী জলের ধারা বন থেকে ছিটকে পড়া পাঁচটা গাছের কোল ঘেঁষে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে বয়ে গেছে।

ওখানেই দলটা থামল।

পাঁচু বলল, এই সেই ঠাঞ। শালগাছের লিচে কালো পাথর। মাঝে চোখ। এই আমাদের লতুন গাঁয়ের গাঁও বুড়া।

হ্যাঁ, এই সেই প্রবাসের বাসভূমি। সব মিলে গেছে। বনের শেষে নদী। পাঁচটা শাল গাছ। কালো পাথরের বুকে চোখ খোদাই করা। যে চোখ হারানো মানুষগুলির ফিরে আসার পথের দিকে চিরকাল চেয়ে থাকে। মুঠো করলে ভেঙে যায় এমন নরম মাটি।

—খুঁটি গাড়তে লাগো হে সবাই। ঘর করো।

—কি নাম হেবে ই গাঁয়ের?

—সোনা গাঁও।

অনেকবার নদীতে বান এলো। চর পড়ল। জন্ম মৃত্যুর চাকাটা ঘুরতে ঘুরতে বোধহয় তেতে গেল খুবা সোনা গাঁয়ে আগুন লাগল একদিন। এ জমির কোনও এক অদৃশ্য মালিক ছিল। ঠিক সময়ে বেরিয়ে এসে ঝুঁটি ধরে ফেলে। এই যে বহু পথ হেঁটে এসে আবাস খুঁজে পাওয়া, এ নাকি বে-দখল। এইসব গাছপালা-মাটি -নদী হাওয়া কোনটাই বিশ্ব প্রকৃতির নয়। মালিকের। এইসব কথা কিছুতেই বুঝতে না পারা লোকগুলি আর একবার প্রাণপণে যুঝল। তীর ধনুক লাঠি পাথর দিয়ে। বিপরীত দিকে কয়েকটা বন্দুক।

বনের মধ্যে দুটো কুকুর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—

লালুর নাতি লালু ঃ আগুন দেওয়ার আগে মেওয়ালাল দূরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছিল। আমি ভুক ভুক করলাম তো ঢিল ছুঁড়ল।

ঝালীর নাতনি ঝালী ঃ হরিজন মেয়ের লাথ খেলে তো গোঁসা হবেই। আমার মালকান বলছিল উত্তরে কোথায় বাঁকা নদী আছে। নরম মাটি। একেবারে সোনার দেশ। যেতে যেতে আমরা ওখানে চলে যাব। ইত্যাদি।

বাঘ

হড়পাদের ছোট্ট দলটা মোবারকপুর পৌঁছে গেল। আর ওদের ঠিক পিছু পিছু এলো বর্ষার ঝুপসি ঝুপসি মেঘ। ঝিপির ঝিপির জল। থেকে থেকে হাওয়ার ঝাপটা। চোখ ধাঁধানো শরীর ঝলসানো তাপ এবার আস্তে আস্তে নরম হবে। ভিজে মাটির বুক থেকে আতুর ঘরের বাস গাঢ় হয়ে উঠে আসছে।

বাবুদের নাটঘরের ছাদের নীচে কালো কালো মেয়েগুলি তালাই, টোকা পুটুলি আর হাঁড়িকুড়ি মাঝে জড়ো করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। কল কল করে আলাপ করছে পেছনে রেখে আসা ঘর-সংসারের কথা, পথের কথা, এবারের বর্ষার কথা। কেউ আঁচল আড়াল করে বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে।

দীর্ঘ পথ। বি. ডি. আর লাইনের ছোট গাড়িতে ক্লান্তিকর মন্থর যাত্রা। বছরের এ সময় ওরা কঠিন মালভূমি থেকে নরম মাটিতে নেমে আসে। ধানের মরসুমে সস্তা শ্রমের খুব কদর।

পুরুষরা বারান্দায় ফণীবাবুর সঙ্গে কথা কইছে। কাজের কথা। দরদস্তুর। উনিই এখানকার মালিক মহাজনদের হয়ে এসব করেন। এটাই রীতি। এর পর কোন বাবুর চাষে কজন মুনিষ কামিন দরকার জানা হয়ে গেলে দলটা ভেঙে ভেঙে এক এক মালিকের সঙ্গে এক এক দিকে চলে যায়।

হড় পাসোমরীকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল সব। ই দেখ বড়বাবুর মরাই। সোমরা অবাক, হাই বাপ। ইতে তো হাঁথী সামাই যাবেক। কত বড়। হড়পা হাসল, হঁ সি কথা ঠিক বটে। ই রকম তিনটা আছেক রে। দুটা ভিতর বাকুলে। সোমরী চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে হাঁ করে দেখে। তখন ওকে লকলকে লতার মতো মনে হয়। ওর এই ভঙ্গিটা হড়পার বড় পছন্দ। আর ই দেখ রাস মন্দির। হুঁ। ইটা হইছে যেমুন আমাদের গোঁসায়ে বোঙার থান। সোমরী মন্দিরের দেয়ালে পোড়ামাটির ছবিগুলি দেখছিল। সুন্দর একটা পাখি। মানুষের মতো মুখ। কি পাখি বটে? সোমরী বনে এমন পাখি দেখেনি। হড়পাও দেখেনি। তবে আন্দাজী পাখির আন্দাজী ডাক শোনাতে পারে। গলা দিয়ে শব্দটা করে দেখাল। টিহি টিহি টুকক্কো টুকক্কো।

সবাই শুনল রাসমন্দিরের ওখানে একটা অচেনা পাখি ডাকছে। ফণীবাবু প্রথমটা চমকে উঠল তারপর ডেকে বলল, ওটা কেরে? হড়পা না? আঠারো-উনিশের দুই নারী পুরুষ ফণীবাবুর সামনে হাজির হল। হঁ। হড়পা বটি।

—তা পাখির নকল ডাক শুনেই বুঝেছি তুই এসেছিস। বিরসা বলল, তু হড়পাকে ঠিক মনে দেখেছিস বাবু। হড়পার ডাক শুইনে কেউ বলতে লারবে কি পাখি কি জানোয়ার ডাকছে। টেরেনের লোক গুলান ই বাগে চায়, উ বাগে চায় আঁহ শিয়াল

আলো কুথাকে? কথাটা শুনে মেয়ে পুরুষ সবাই হেসে উঠল।

ফণীবাবু বলল, ওই জন্যই তো হড়পাকে মনে আছেরে। গেল বার কতরকম পাখির ডাক শুনিয়ে গেছে। তা এটি কে?

হড়পা সোমরীর দিকে লজ্জিতভাবে তাকিয়ে বলল, ইটা আমার মেঝেন বটে।

—বাঃ এবার তবে একা আসিস নি। বিয়ে করে মেঝেন সঙ্গে নিয়ে এসেছিস। থাক দুজন আমার কাছেই থাক।

এবার বর্ষা খুব জমিয়ে নেমেছে। জলের কলকল শব্দ রাতে বড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষের মুখের ভাষা ডুবে যায়। মনের ভাষা ভেসে ওঠে। উনুনের আঁচে সোমরীর মুখের একটা দিকে আলো আর একদিকে অন্ধকার। চাষের সময় এই অস্থায়ী চালা ঘরে মাস তিনেকের সংসার। হাঁড়ি কুড়ি। মাঠ জলে টইটুম্বুর। আলের ঘোগ বন্ধ কয়ে জল ধরে এসেছে। কাদা করতে আর দুটো দিন। তার পর রোয়ার কাজ শুরু হবে। হড়পা বলছিল লক্ষণ ভাল। ব্যাঙ খুব ডাকছে। ওটা মা পিথীমির ডাক। সাপ জোড় বেঁধে খেলেছে। চাষ খুব ভাল হবে। হোক। হেই সোমরী তু দেখিস ইবার ধানের টার লেগে যাবে।

সোমরী ম্লান হাসল। তা আমরার ইতে কি আর লতুন হবে? উদের তিনটো মরাই চারটো হবে। নাকি বটে?

—বাবুটো ভাল আছে। আমার বাপ ই মালিকের খেয়ছে। আমি খেইছি। আমার ছেলে খেইবে।

সোমরীর যেন হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল। বলল, তু বলছিস বটে। বাবুটোর লজর কিন্তুক ভাল লয়।

—লুন খেলে গুন গেতে হয় সোমরী।

তা লবণের পরিমান ক্রমশ যেন বাড়তে লাগল। দুদিন পরে সোমরী বলল, বুড়া হলে লোকের খুব দুখ নারে? বাবুটোর বউ নাই। মইরে গেছে। বেটা বেটি কাছে নাই। আমার হাতটা ধইরে কানছিল।

—দিকুদের উরকম হয়। হড়পা জবাব দিল। আমাদের বেটা বেটার বউ লাতি জীবন ভর কাছে থাকে। ই বাদলে তুর পেটে যদি ছেলে আসে তো ভাল হয়। মা বলত খরায় অ্যালে ঝুড়া। ঝামনায় অ্যালে ঢেমনা।

এইসব ভূমিহীন অরণ্যচরদের জীবনে ক্ষুধা এত সত্য যে জলের ভাল-মন্দের উপর, উত্তর পুরুষের জন্য শাক পাতা পশু ও শস্যের সংস্থানের উপর সন্তান কামনার তীব্রতা নির্ভর করে। মাঠময় বাদলা হাওয়া ছুটছে হা হা করে। ঝর ঝর জল। গাছ-পালা ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে ডাইনে-বাঁয়ে দোল খেয়ে নাচের ঝোঁকে এক এক বার উদ্দাম হয়ে উঠছে। প্রকৃতি বলছে হাঁ রে হড়পা মেঝেনের লরম মাটিতে বীজ বুনে দে। নিবিড় হতে গিয়ে হড়পার বুকের মধ্যে শক্ত কি একটা ঠেকল—ইটা কি বটে সোমরী?

সোমরী বলল, উঁ, তুকে বলি নাই। চাঁদির মালা। বাবুটো দিল।

—কিসে?

—কি জানি।

দুজনের মাঝখানে একটা চাঁদির মালা এত শক্ত, অনড় হয়?

সোমরীর কাজ বাবুর খুব পছন্দ। নরম হাতে কপাল টিপে দেয়। কাজেই ঘরকন্নার কাজে বহাল হয়ে গেল। অন্য মেয়ে পুরুষের সঙ্গে হড়পা ধান রুইতে যায়। সোমরী পাশে থাকে না। এক রাতে ঝোপড়িতে ফিরতে ও বেশ দেরি করল। হাত ভরে কাচের চুড়ি। কপালে সবুজ টিপ। বউড়ি ঝিউড়ির মতো ছাপা শাড়ি। সোমরী হাসি মুখে বলল, ই ঝুপড়ির পাট উঠলরে হড়পা।

—কি লেগে বটে?

—বাবু বইলছে কাল থিকে উদের দালানের লীচের ঘরে থাকতে হবে। কাজ কামের সুবিধা।

এই সুবিধার জন্যই ওরা দালানবাসী হল। সারাদিন হড়পা অন্য মেয়ে পুরুষের সঙ্গে নরম কাদার বুকে লকলকে চারাগুলি গেঁথে সুন্দর নক্সা তৈরি করে। প্রথম প্রথম সোমরী জল খাউকি বেলায় মুড়ি গুড় জলের ঘটি নিয়ে আলের উপর অপেক্ষায় থাকত। এখন আর সময় পায় না। টুকার মা নিয়ে যায়। বিকেলে ফিরে এসে ভাত খেতে বসে দুজনে কথা হয়। হড়পা ফিরে গিয়ে একটা মাটির ঘর তুলবে। খড় দিয়ে ভাল করে ছাইবে। সোমরী দেয়ালে পদ্মলতা আঁকবে। দুজনের এবারের রোজগারে একটা ধারী শূয়ার কিনে ফেলতে পারবে না? খুব পারবে। মাচা ভরা সীমফুলের নীচে বসে বসে সোমরী একটা শিশুকে বুকের দুধ দেবে। সোমরীর কি যে হয়েছে। এই সব দারুণ সুখের কথায় এক একদিন ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কাঠের পুতুল হয়ে যায়। বুকের ভেতর হাত ডুবিয়ে হড়পা তার হৃদয় খুঁজে পায় না।

বাবুর হাঁপানির টান ক্রমশ বাড়ছে। বুকে কর্পূর-তেল ডাল, বুড়োটাকে ঘুম পাড়িয়ে নেমে আসতে আসতে কত রাত হয়ে যায়। বাবু খুশি হয়ে বলেছে সোনার নাকছাবি কিনে দেবে। আর হ্যাঁ একদিন ওকে সিন্দুকের ডালা খুলে মরে যাওয়া বউয়ের গহনাগাটি দেখিয়েছে। সব।

ধান তোলার আগেই সোমরী পুরোপুরি উপরতলায় বাসিন্দা হয়ে গেল।

দলটা ফিরে যাওয়ার দুদিন আগে হড়পা অনেক চেষ্টায় সোমরীর দেখা পেয়ে গেল?

—লীচেই থাক সোমরী। গুছাইগাছাই লিতে হবেক না?

—না।

—কেনে?

—আমি যাব নাই। তুই চইলে যা। বাবুটোর ব্যারাম। কে দেখবে বল?

হড়পা ওর গালে ঠাশ করে একটা চড় মারল তারপর যতক্ষণ অন্যকোন পায়ের শব্দ না পেল ততক্ষণ সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে রাখল মেয়েটাকে।

চলে যাওয়ার শেষ রাতে বাঘ ডাকল। গম্ভীর মাটি কাঁপানো আওয়াজ। দালানের পেছনের বাগানে অন্ধকারে কিছু ঠাহর করা যায় না। বাবু লাফিয়ে উঠে বলল, হারামজাদা ভয় দেখাতে এসেছে।

সোমরী হি হি করে হাসল, তোকে খেইয়ে লিতে এসেছে? কি করবি তুই?

—গুলি করব।

—উ তুই লারবি। দুবলা বুক ফেইটে যাবে। বাঘটা আবার ডাকল। আর একটু কমছে। সোমরী অবাককান্ড করল। এই অসময়ে চোখে কাজল দিল। কপালে টিপ। তারপর দরজা খুলে চৌকাঠের ফ্রেমে ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকল। বাঘটা এবার সিঁড়ির নীচে ডেকে উঠল।

সোমরী ঘাড় ফিরিয়ে কি অদ্ভুত অন্য চোখে তাকিয়ে দেখল এই পাকা ঘরের সুন্দর আসবাব, নরম বিছানা, সিন্দুক, উজ্জ্বল আলো। ক্ষুধাহীন ভয়হীন জীবন।

—অ্যাই সোমরী। কি করছিস? দরজাটা বন্ধ করে দে।

আছন্নের মতো সোমরী বলল, আঁ? তারপর অনিশ্চিত অন্ধকার বনের দিকে বাঘিনী চলে গেল।

ছ্যেলা খাইল শিয়ালে

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল বানুর। কপাল বরাবর শূন্যে দোকানে ঝোলানো পাকা কলার মতো এক থোকা ভাঙা ভাঙা চাঁদ। উল্টো-পাল্টা হাওয়া কখনো হাটের গন্ধ, কখনো হাসপাতালের বিছানার। বড় লাল মোরগটা ডেকে উঠলে ওকে শরীর ভেঙেচুরে মাগো আর কদ্দুর উঠানটা ঝাঁট দিতে হবে, নদীর সবটুকু সরসর-তড়বড়-বকবক জল একটা কলসীতে ভরতে হবে। তারপর একমুঠো চাল ফুটোতে ফুটোতে দশজনের ভাত রাঁধতে হবে তারপর আর কি ভাবতে গিয়ে ওঁয়া ওঁয়া কান্নার শব্দ শুনতে পেল। খাল পাড় ধরে ধরে চলে যাচ্ছে। পিছু নিতেই মিলিয়ে গেল। ও মনে মনে বলল, আমার সর্বনাশ হয়েছে। খাল পারাপারের সাঁকোর ওপর উঠে দেখল উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত দিকের রাস্তা ওর পায়ের তলে শেষ হয়ে গেছে। তার মানে ওর দাঁড়াবার জায়গাটা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে। যে যেখানেই থাক ওকে ঘিরে আছে। ঠান্ডা হাওয়া হায় হায় করে বইছে। ও ভাবল ঠিক। এখন আমার হায় হায় করে কাঁদা উচিৎ। কিন্তু কার কাছে কাঁদবে? সবাই যেযার ঘরে খিল এঁটে একে অন্যের ওম পোহাচ্ছে। জানতেও পারছে না ওর কি হল। ট্রেন ফেল করা একটা লোক ভারি বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। সাঁকোর ওপর বানুকে দেখে অবাক হয়ে বলল,

—একা মেয়েমানুষ ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

—খুঁজতে বেরিয়েছি। আমার ছেলে শেয়ালে নিয়েছে।

—তাই? ইশ ইশ। কিন্তু চোখে জল নেই কেন? লোকে কি মনে করবে?

—খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কাঁদতে পারছি না।

—আহা। না কাঁদলে পাগল হয়। ডানদিকে চলে যাও। ঝোপঝাড় আছে, শেয়ালের বাসা খুঁজে পেলেও পেতে পার।

শেয়ালের বাসা কেমন থাকে বানু জানেনা। ঝোপঝাড়ের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে ছেঁড়া চটি আর প্লাস্টিকের পুতুল পেল। কাদা লেগে আছে। জিনিস পুরানো হলে এইসব নির্জন জায়গায় চলে আসে। ছোটবেলার পুতুল বড় হলে কি করে যে কোথায় চলে যায়। অথচ মনে থাকে। কবে কোন মেলায় কি রকম পুতুল কে কিনে দিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় ঝমঝম লেবুপাতা-করমচা বৃষ্টি নেমেছিল কিনা। একবার ওর পুতুলের বাক্সে ব্যাঙ ঢুকে বসেছিল। সোনাব্যাঙ ডাকলে গাঢ় ঘুম হয়। ওরা অন্ধকার জলায় সারারাত সবাইকে ডাকাডাকি করে আকুল হয়ে যায়। কেউ আসে না। কোনও মেয়ে যদি ওদের রাজাকে বিয়ে করে তিনরাত্তির ভিজে শেওলার ওপর শোয় তো সে

মানুষ হয়ে যায়। প্রথমে খুব ভালবাসে। তারপর লাথি মারে। বানু পুতুলটা হাতে তুলে নেড়েচেড়ে দেখল। উঁহু এটা আমার নয়। চিনি না। না চিনলে কোনও সুখ-দুঃখ নেই। নিজের না হলে কষ্ট দিতে পারে? এই কষ্ট দিয়েই তো বানু বুঝতে পারছে ওর ছেলেকে শেয়ালে নিয়েছে।

খালের জলে সরসর করে নৌকা চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল—

—ওখানে কে?

—আমি।

—নাম বল। বাবার নাম অথবা স্বামীর নাম। সাকিম। থানা। এতরাতে এমন সন্দেহজনক জায়গায় কেন ঘুরছ চটপট জবাব দাও।

—আমি বানু। আমার ছেলেকে শেয়ালে নিয়েছে। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিছু মনে করতে পারছি না। তোমাদের পায়ে পড়ছি তাকে খুঁজে দাও।

লোকগুলি টর্চের আলোয় বানুর চোখের মাঝখানে ভেসে থাকা মণিদুটো দেখল। তারপর ওরা একে অন্যকে বলল, উঁহু একে নৌকায় তুলোনা। আজ বেস্পতিবার, পোয়াতির মাংস খেতে নেই। এই মেয়ে শোন, আমরা জলপুলিশ, গঙ্গায় ডাকাত ধরতে যাচ্ছি। সময় নেই। তোমার ছেলে কোনদিন কুমীরে নিলে আমাদের খবর দিয়ো। শেয়াল ডাঙার জীব। ডাঙার পুলিশেরই ওকে ধরার হক আছে। ওদের কাছে যাও।

বানু ওর কষ্টটা সামান্য সময়ের জন্য ভুলে গিয়ে ভাবল—আশ্চর্য, আমার ছেলেকে শেয়ালে না নিয়ে কুমিরে নিলেইতো ভাল হত। এক্ষুনি ফেরৎ পাওয়া যেত। বোকা কুমির চালাক শেয়াল। জলপুলিশরা নিশ্চয়ই খুঁজে দিত। তবে লোকগুলি মিথ্যেবাদী। আজ বেস্পতিবার নয়। অথচ দিব্যি বলে দিল বেস্পতিবার পোয়াতীর মাংস খেতে নেই। ওগো, তোমরা আমার ছেলে খুঁজে দাও যার মুখ আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। যে খুঁজে দেবে তার বুকে আমি মাথা রেখে ঘুমুবো। তারপর বমি করব। তারপর উথালি-পাথালি কষ্টে আকাশের দিকে পা ছুঁড়ব। কে আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেতরের কুসুমের হলুদ ঢেলে ফেলেছ মাটিতে? আর কি সইতে পারব?

ঝোপের ভেতর থেকে একটা রাতপাখি উড়াল দেওয়ামাত্র বানু সেই দিকে ছুটে গেল। কাঁটায় দুটো পা কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। জল থেকে পচা ভাপসা গন্ধ উঠে আসছে। ও ছুটতে শুরু করলে কোথা থেকে তিন বুড়ি হুস করে উদয় হয়ে পিছু ডাকল,

—ছুটছ কেন? কোথাকার মেয়েগো? কোথায় যাচ্ছ?

—আমার ছেলেকে শেয়ালে নিয়েছে। জনমদুখী মার কোল ছাড়া হয়ে পরের ঘরে ছিলাম। যাচ্ছি ডাঙার পুলিশের কাছে।

—ছুটলেই পাওয়া যায়?

—পাওয়ার জন্য ছুটতে হয়?

—পা ঝাড়ালেই হাতের নাগালে আসে?

—আমার ভীষণ কষ্ট। একজন বলেছে না কাঁদলে পাগল হয়।

—দূর অসভ্য মেয়ে, ওসব তো ভালবাসাবাসির কথা। এক হাজার ব্যাঙ নিয়ে ডোবায় বাস করলে কে তোর বর নয়?

—দূর ভালো মানুষের বেটি তুই যার বাঁদী সে ছাড়া কে তোকে কাঁদতে বলবে?

—দূর পাগলী যে তোকে কাঁদতে বলেছে তার সঙ্গে দুটো হেসে কথা বললি না? পালিয়ে এলি?

বানু আশ্চর্য হল। ওরা তিনজন তিনরকম কথা বলল। অথচ তিনটেই সত্যি। আদ্যিকালের ব্যাঙের গল্প শুনেছে। মার ঘরকন্না দেখেছে। আর নিজের ভেতরের ইচ্ছামতিটা কবে থেকেইতো টের পাচ্ছে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা দরকারী কথা মনে পড়ে গেল।

—তোমাদের ছায়া দেখছি না কেন?

ওরা তিন জনেই খুট খুট করে হাসল।

—ছায়ার আবার ছায়া কি? আমরাও বেরিয়েছি আমাদের ছেলে খুঁজতে।

বানু আশ্চর্য হয়ে গেল। ওরাও তবে একই যন্ত্রণা পাচ্ছে? আচ্ছা সকলের ছেলেকেই কি শেয়ালে নিয়েছে? কথাটা আর জিজ্ঞেস করল না। তবে একসঙ্গে যাওয়া,—সে তো ভাল।

যেতে যেতে গাছপালা ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল। পায়ের তলে ঘাসের নরম আর ঠেকছে না। সামনে ধূ ধূ মাঠ। মাটি উল্টানো যেন কেউ কুঁপিয়ে রেখে গেছে। শুকনো শেকড়-বাকড় ভেসে আছে। ওরা এই মাঠের উঁচু পাড়ে দাঁড়াল। তিন বুড়ি বানুকে বলল,

—এইসেই তেপান্তর। এর কোথাও কিছু আড়াল নেই।

—এর আর একটা নাম কারবালা। এখান থেকে সবকিছু দেখা যায়।

—এই হল বর্ডার। এখানে দাঁড়িয়ে দেখে নিই কোথায় আমরা যাব। আমাকে তোমাদের চোখ দাও।

চোখ দেওয়ার মানেটা বানু বুঝতে পারল না। দেখল যে চোখ চাইল সে বহু দূরের কিছু দেখার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজন পেছন ফিরে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেছে। হাসি পেলেও বানু ওই দুজনের মতো করল। কিছুক্ষণ দেখে তৃতীয় বুড়ি ফেরিওয়ালার ঢং-এ বলল,

—পাহাড় পাহাড় উত্তরে একটা ভাল পাহাড় নীল পাহাড়। চাই?

অন্য দু'জন একসঙ্গে জবাব দিল, হ্যাঁ চাই।

বানু ভাবল কেন চাইব না? পাহাড়ের গুহাতেই তো প্রথম মানুষের বাচ্চা। ওর বুকের ভেতরটা ধক ধক করছিল। আঃ তবে আর দেরি কেন? কি গো তোমবা

আর দেরি করছ কেন? আমার ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। একটা দুঃখ প্যাঁচ কষে কষে বসে যাচ্ছে। আর কি আমি এটাকে খুলে ফেলতে পারব? দুঃখ নিয়ে আমার চুল পাকবে।

এবার দ্বিতীয় বুড়ি বলল, আমি একটু যাওয়ার রাস্তাটা দেখে নিই কেমন? আমাকে তোমাদের চোখ দাও।

ব্যাপারটা আগেকার মতোই। বলল,

—পথটা বেশ ঘোরালো দেখছি। খুব গোপন আর লজ্জার। পৃথিবীর গর্ভের জল ভেঙে যেতে হবে।

বানু ভাবল, এতে লজ্জার কি আছে? পথটা যখন জানা হয়ে গেছে তখন তোমরা যাচ্ছ না কেন? আর অপেক্ষা করলে আমি যে মরে যাব। নিশ্চয় যাব। হায় আমার ছেলেকে শেয়ালে নিয়েছে। আমার ছেঁড়া আঁচলে গিঁঠ দিয়ে টেনে-টুনে কোনওরকমে বুক ঢাকতে পারি কিন্তু ভেতরেরটা কি দিয়ে ঢাকব।

ওরা তিনজনেই কামোখা চোখ গরম করে ওকে ধমকে উঠল, সেই কাদা মাখা লোকটা তোর পেটে লাথি মেরেছে একথা আমাদের বলিসনি কেন?

—তালাক দেবার ভয়ে,

—ন্যাকা

—তুই তার বাঁদী না বেগম?

—ভাত খেতে খুব ভালবাসিস্ না? খাবি বলেই সইছিস?

—গোড়া থেকেই এই মেয়ে বাঁদী।

—চুমু খায় আবার লাথিও খায়। না খেলে পেটে সইবে কেন?

—ওই জন্যইতো ছেলেকে শেয়ালে নিয়েছে। বেশ হয়েছে।

বানুর ভীষণ রাগ হল। আর ঘেন্না। বেশ হয়েছে? অ্যাঁ? ও তিননম্বর বুড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুল টেনে, আঁচড়ে, কামড়ে বলতে বলতে হাঁপাতে থাকল, কোথায় আমার ছেলে? সব দেখতে পাও তো আমার ছেলেকে দেখনি কেন? কেন তুমি আমার কষ্টে হাত দিলে? কেন তুমি শেয়ালের টান টেনে কথা বললে? আমি কি একটুও সুখের জন্য জন্মাইনি?

ওরা তিনজনেই খুনের মতো তেড়ে এলো,

—ছিঁড়ে ফেল হারামজাদীর মুণ্ডু

—পুড়িয়ে মার

—কেটে ফেল, কেটে ফেল।

--গায়ে হাত দিয়োনা বলছি। আমি খুঁজতে বেরিয়েছি। এখন ওসব কিচ্ছুতে ভয় পাইনা।

ওরা তিনজনেই গালে হাত দিয়ে বলল,

—ওমা কি পাকামী। তোর বয়স কি পাথর? ভারী কোমর দেখে আগেই বোঝা

উচিৎ ছিল এ মেয়ে একটা পুরুষের ভেঙে দেওয়া শুকনো আমডাল পুড়িয়ে আর একটা পুরুষের জন্য ভাত রাঁধে। তবু কারো নয়। ওর নিজের কি ছিল আহা! ওর নিজের কি থাকবে আহা!

বানু মনে মনে বলল, ভারিতো দরদ, তোমাদের কারো সাহায্য চাইনা। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি দু-দিক থেকে দু-রকম গন্ধ। পাহাড়টার মুখে কতকাল কতকাল আগেকার কুলের আচারের গন্ধ আর দক্ষিণের মাঠে মেলে দেয়া হিসি ভেজা কাঁথার গন্ধ। মার পাড় ছেঁড়া সূতোর নীল-লাল ফোঁড়। হাতের রগের মতো আর আঙুলে সূঁচ ফোটা রক্তের মতো। যেদিকে খুশি চলে যাব। একা যাব। হাওয়ার ঝাপটায় ওলোট-পালোট খেতে খেতে হাতের মুঠোয় যা উঠে আসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখব কোনটা আমার, নয়তো উল্টো মুখো মাগীদের গায় ছুঁড়ে মারব! একটু আগে আমি চেরা চেরা ডালপালার ফাঁকে হলদে হলদে দাঁত দেখে ভয় পাচ্ছিলাম। এখন আমার খিদে পাচ্ছে। একদিন একটা কাদা মাখা লোক আমার আঁচলে দুটো ডাঁসা পেয়ারা বেঁধে দিয়েছিল। একটা আমি যেতে যেতে খাব আর একটা আমার ছেলেকে দেব।

অনেক দূর গিয়ে ও পিছু ফিরে দেখল সেই তিন বুড়ি তিনটা ঝিঁকের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে একরাশ চিন্তার ধোঁয়া উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেতো আছেই।

ক্রমশ গাছপালা সরে যেতে থাকল আর মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা চালা ঘরগুলি লাফ দিয়ে উঠে ধূলো ঝেড়ে বলল—এসো, এসো। আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি। যদু মাস্টার আলকাপের গান বায়না করেছে। গাঁয়ের মাঝখানে সামিয়ানা টানানো হয়েছে তুমি এলেই শুরু হয়ে যাবে।

—বেশ বেশ। আমি আলকাপ দেখতে ভালবাসি কিন্তু আমার মন খারাপ। জানো আমার কি হয়েছে?

চালাগুলি উস্কো-খুস্কো চুল ঝাঁকিয়ে বলল,

—জানি জানি। তুমি যা চাও এখানে আছে, সব আছে। গাঁ ঘরের গানে। গানের গাঁ ঘরের এক্কেবারে ভেতরে। চলে এসো, চলে এসো। তোমার ছেলে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে ক্ষীর নদীর কূলে। ছিপ নিয়ে যাবে কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে যাবে চিলে। কি মজা! কি মজা!

বানু ভাবল, ভারি মজাতো! ওরা সরে সরে পথ করে দিলে বানু ভেতরে চলে এলো। সামিয়ানার নীচে হ্যাচাক জ্বলছে মেটারনিটি টেবিলের ওপরের লাইটের মতো। ঝম ঝম করে বাজনা বেজে উঠল। শেয়ালের মুখোস পরা একটা লোক দাঁতে নেকড়ার পুটুলি কামড়ে কোমর দুলিয়ে নাচছে। দোহারেরা দমকে গেয়ে উঠল—

বাপরে বাপ ছোলা খাইল শিয়ালে,
কইরা মুখে লইয়া ঝোঁকে চইলা গেল জঙ্গলে।

নিকনো উঠোন আর পাকা নিমফলের গন্ধে বাতাস গাঢ়। মেয়েদের ভেতর ফোঁস ফোঁস শব্দ। কেউ একজন বলল,

—আহারে মা। ঘুমের ভেতর কি সর্বনাশ! সারাদিনের ধান রোয়া খাটুনির শরীর। পাতলেই ঘুম। তার কি দোষ। এ তো পাকা ঘর নয় গো। দর্মার বেড়া ফাঁক করেইতো ধন ঢোকে শেয়াল ঢোকে।

বানু বলতে যাচ্ছিল তা নইলে কাহিনী হবে কেন? আমাদের কাহিনী—। এরকম ভাবেইতো চলতে চলতে চলছে। আবার জোর বাজনা রেলগাড়ি ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম প্যাঁপর প্যাঁ। বারে শেয়ালের কান্ড কারখানা। কি মজা! কোনও শেয়ালই তা হলে সত্যিকারের শেযাল নয়। অধিকারীর পিঠের কাছে সরে গিয়ে খুব মিষ্টি করে বলল, ওই নেকড়া কানির পুটুলিটা আমার। আসার সময় মা বেঁধে দিয়েছে। শেয়াল মশাইকে বলবেন তো নাচ শেষ হলে ওটা যেন আমাকে ফেরৎ দেয়। তারপর পাশের মেয়েটার পিঠে মাথা রেখে ও দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

আর—

ডাক্তারের কোঁচকানো ভুরু আস্তে আস্তে টান হয়ে গেল। আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে মাস্কের ভেতরেই গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন,

—স্ট্রেঞ্জ। ফিরে আসছে।

মেটারনিটি টেবিল ঘিরে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা বুঝলেন একটা ভয়ংকর লড়াইয়ে এই এনিমিক কালো পেটে লাথি খেয়ে হাসপাতালে আসা মেয়েটা জিতছে। কোন জোরে সেটাই আশ্চর্য! চেতন অবচেতনের মাঝে দুলতে দুলতে এখন সরু সূতোটা স্থির হয়েছে। বানু ঘুমুচ্ছে। বাচ্চাটা ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে উঠল।

ডাক্তার খুশি হয়ে বললেন, ভাল ভাল। যে কাঁদে সে বাঁচে।

নয়ন হালুই-এর ডানা

নয়ন হালুই নাচতে নাচতে উড়াল দেওয়া সারসের ভঙ্গীতে চলে যাওয়ার সময় ঢাকের বাজনা মৃদু হয়ে ঝির ঝির করতে থাকল। তারপর থেমে গেল। কালাচাঁদ জিরুতে বসল। অনেকক্ষণ বাজিয়েছে। সিরুয়া মেলায়। নরসিংহ নাচ, টাপা নাচ, সব শেষে সারস নাচ। ঘণ্টা দুই তুমুল বাদ্যির পর কানে তালা লাগে। কিছু শুনতে পায় না। তাড়াতাড়ি সাড় ফেরানোর ওর নিজস্ব একটা প্রক্রিয়া আছে। পিঠের জামা তুলে ঢাকের কাঠি দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে কান পেতে রইল। ক্রমে ফিরে এলো ভেঁপুর পিঁ পিঁ, সাইকেলের ক্রিং ক্রিং, মেলার কোলাহল। সব শেষে একট অদ্ভুত আঁক আঁক শব্দ। নাচিয়েদের সাজপোশাক বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত চালাঘরটা থেকে। কালাচাঁদ উঠে গিয়ে ভেতরের আবছা আলোয় উঁকি দিয়ে খুব অবাক হয়ে বলল, কি রে নয়না, উরকম করছিস কেনে?

জবাব দিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। হেঁচকি তুলে নয়ন বলল, মুখাটা খুলতে নারছি।

—অঃ। পেছুকার বান্ধনে পিঁঠা লাইগাছে বোধহয়। আহিস্তা আহিস্তা ছাড়া।

—পেছুকার বান্ধন খুইলাছি। মুখাটা সেঁইটে গেছে।

কালাচাদ খিক খিক করে হাসল, শালা সারস, মুখা খুইলতে নারছিস তো জিলাবি খাবি কি কইরা? লম্বা ডাঁরা দিয়া ঠুইকরা?

মুখোশ খুলে পোশাক পালটে মদন কৈলাশ আর বিনোদ হাত-মুখের রঙ ধুতে নদীতে গেছে। ওরা ফিরে এলেই মুড়ি-জিলাপি খেয়ে রওনা হওয়ার কথা। সূর্য ডোবার আগেই। আজ প্রথম রাত অন্ধকার। এখন বেরিয়ে পড়লে পা চালিয়ে আলো থাকতে থাকত বাড়ি চলে যাওয়া যায়। কালাচাঁদ ভাবল ভারি ঝামেলায় পড়ে যেতে হল দেখছি। ঘরে ঢুকে ডাকল,

—কি রে নয়ন মুখা খোলে নি?

—ন্‌না।

কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওপর থেকে কিছু বোঝা যায়না অথচ ছেলেটা হাঁকুপাঁকু করছে আর কষ্ট পাচ্ছে। কালাচাঁদ মুখোশের পাশ দিয়ে আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করে দেখল সত্যি কোথাও ফাঁক নেই। চামড়ায় মিশে যাওয়ার মতো। লম্বা ঠোঁট ধরে টানা মাত্র নয়ন মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠল যেন ওটা ওর নিজের। কালাচাঁদের হাতে দুফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। মুখার ওপর তুলি দিয়ে টানা নীল দাগটা শিরার মতো দপ দপ করছে দেখে ও সত্যি ঘাবড়ে গেল। কিছুক্ষণ গলা দিয়ে একটা শব্দও বের করতে পারল না। সারস মাটিতে শুয়ে পড়েছে। নাচের সময় যেভাবে বাঁ-হাত বুকে রেখে ডান হাত ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে থাকে। নাচে একে বলে ভাম

লাগা। তখন ঢাকের বোল গুর গুর করাৎ করাৎ দ্রিক্ তানাকাৎ ধিনিক ধিনিক মিহি স্বরে বাজাতে হয়। সারস ধীরে ধীরে মাথা তোলে। কি ভেবে কাঁলাচাঁদ বেড়ায় হাত মুছে মুড়ি-জিলাপির একটা ঠোঙা সারসের তর্জনি ছুঁইয়ে রাখল। নরম স্বরে ডাকল, নয়না উঠ উঠ। তোর বোধহয় ভুখ লাইগাছে খুব। দিনমান খাসনি লাগছে। বহুৎ নাইচাছিস। হাঁ। হালাকান হইয়া গেছিস। খা খা। কালাচাঁদের মনে হল সারসের মুখোশে আঁকা চোখ দুটো ঘুরছে। ও কি ও ভুল দেখলাম না তো? কেন না মুখার চোখ ঘুরতে নারে। নয়নের চোখ এই চোখের ভেতর আছে। সে চোখের মণি কালো। এরকম লাল নয়। ছেলেটা নাচে ভাল। আজও দারুণ নেচেছে। ঢাকের তালে তালে এক-একটা বোল আর ভাব ফুটিয়ে তোলে চ্যাংড়া-পিলা মোয়া-দরদ শির শির কইরা কাঁপতে থাকে সারসের ডানার ঝাপট লাগা বেনা ঘাসের মতো।

সারস এবার মাথা তুলল, উস্ উস্ উসতাপ ইটা হামার কিক কিক কিক...

কালাচাঁদ ওকে সান্ত্বনা দিল, কিক মানে কি হইয়াছে শুধাসছিস? নয়না ভাই, কুছু হয়নি তোর। মুখাটা জোর সাঁইটা গেছে। সিনান করলে জলে ভিজা আলগা হবে।

—জলগ লগ অঁক।

—কি কহিছিস বুঝতে নারছি। থাক ভাই কুছু কহিতে হবে না। অখন লক কইরা থাক। আন্ধার হইলে মাঠে মাঠে তোকে বাড়ি লিয়া যাব। কেহ দেখতে পাইবে না।

—হঁক।

—হাঁ হাঁ। মদন কৈলাশ বিনোদরাও আসুক। কি বুদ্ধি হয় বলুক।

—নক ঘক।

—না কেনরে? ওরাওতো দলের। হামার মনে লাগছে কি মুখাটা তোর মুখ হইয়া যাইছে। মুখার মধ্যে লহু বহিছে। ইটা তাজ্জব। হেঃ কূন দিন যা না হয় তাই কি তোর হল? তুই কি পাখি হইয়া পালাইতে চাহিয়াছিলি?

দুজনেই চুপ করে গেল। সারস যেমন এক গা গুটিয়ে ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে দেয় সেইরকম করে নয়ন গুটিয়ে নিজের মধ্যে ডুব মেরেছে। হয়তো ভাবছে। কালাচাঁদ মুখ তুলে দেখল দিনের আলো পাকুড় গাছের মাথায় ঠেকেছে। নীচটা তাতে আরও ঝাপসা লাগছে আর ডগাটা ঝলমলে। যেন মস্ত মশাল। দিন শেষের কেনা-বেচা চলছে। জলের স্রোতের মতো কলকল শব্দ। স্রোতই বটে। মেলায় এলে মানুষের বহতা চেহারার ঢেউ ঘূর্ণি দেখা যায়। গাঁ ঘরে জীবন স্থির জলের মতো। বাবার গা ঘেঁষে বালক গলায় ঝোলানো ডুগডুগি ঢপ ঢপ করতে করতে সারসের মতো লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে। হয়তো মুখা নাচ দেখে বায়না ধরেছে, ডুগডুগি কিনেছে এখন নাচতে নাচতে গাঁ ঘরের উড়ু উড়ু খড়ের চালাগুলির মাঝখানের সিঁথি কাটা সরু পথটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লণ্ঠনের লালচে আলোয় ঝিম ধরে থাকা ঘরের মাদুর, কাঁথা, হাঁড়ি কলসী রাধাকৃষ্ণের পটের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা

থই থই করে দেবে। উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে ধোঁয়ার মেঘের ভেতর থেকে মা দেখবে বালক সারস হয়ে সেই যে কাহিনীর মতো শ-কোশী বিল পার হচ্ছে। কোথাও জলে বিষ গোলা। নীল ধোঁয়া ওঠে। যেতে যেতে শরীর এলায়। তবু তবু ওড়ে। কোথাও জল রক্তগোলা। আপনজনের লাশ ভেসে যায়। তবু ওড়ে। কোথাও জল আন্ধার গোলা কালো। ঝাঁপ দিয়ে মরতে মন যায়। তবু ওড়ে। সে বেত্তান্ত জানি গো জানি।

এক ছিল চাষী। নাম এক কড়ি। বউর নাম-সুখী। দুখে-ভুখে দিন যায়। রুখা-সুখা চেহেরা। চোত মাসে ডাঙা জমিতে হাল দিয়ে ঘরে ফিরে দেখে কি উঠানে নরম ছায়া। মিঠে হাওয়া। আর কোথাও নয় শুধু ওর ঠেঁ। ঘরের ভেতর ঝলমল ঝলমল। কে গো তুমি? আমি তোমার বউ সুখী। এত রূপ আহা আহা পেলে কোথায়? ধানের শূন্য মটকিতে। নাড়া দিতে দেখি ধান রঙের একটা মোহর। যেই আঁচলে বেন্ধেছি সেই এত সব। তা মোহরটা যদ্দিন আঁচলে রইল তদ্দিন সুখ শান্তি রূপ রইল। কিন্তু গরিবের মোহর সয়না।

মিঠে রোদ ওঠা এক সকালে বাজপাখি ধনা মোহর বান্ধা আঁচল শুদ্ধ সুখীকে তুলে নিয়ে গেল। দুঃখে চাষী গলায় মুখে হলুদ মেখে সুপারি গাছের বাকল দিয়ে ডানা গড়ে পিছু পিছু উড়তে উড়তে গেল। কত কান্ড ঘটল। সব শেষে সুখী আর এককড়ি সারস সারসী হয়ে বালু চরে বাসা বাঁধল। মুখ বাড়ালেই ঠান্ডা জল রুপালী মাছ। ভাবনা নাই ভয় নাই। কালাচাঁদ ভাবল কিন্তু নয়ন, তোকে যে বুঝতে নারছি। তোর বউ ছা তো ঘরে। তাদের ছাইরা কোথায় উড়াল দিতে চাছিস?

মদন কৈলাশ আর বিনোদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রঙ ধুয়ে ফিরে আসছে। সারস ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে শুনল। তারপর ডানার মতো হাত দুটো ঝটপট করে ঘরের অন্ধকার কোনে সরে গেল। বেড়ার ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে লুকোবার চেষ্টা করল।

কৈলাশ বারান্দায় পা দিয়ে বলল, আজ তোমার জয়জোকার কালোদা, ঘাটে লোকে বলাকহা করছিল কি শেষ নাচটা ফাটাফাটি।

মদন মন্তব্য করল, মন করলে নয়ন নাচে ভাল।

বিনোদ বলল, ঢাকি যেমন নাচাবে তেমন তো নাচবে নাকি বল কালোদা?

আজ কিন্তু হামাকে আর দুটা টাকা বেশি দিয়ো। মেলা থিকা একটা জিনিস সওদা করব।

কৈলাশ খিক খিক করে হাসল, বহুর লাইগা গালার চুড়ি?

বিনোদ নকল রাগ দেখিয়ে জবাব দিল, সি যা মন যায় কিনব।

মদন জিজ্ঞেস করল, নয়ন কোথায় কালোদা?

—ঘরে আছে

—ঘরে? চালা পাইছিনা কেনে? কি করছে? ও নয়না বাহিরে আয়। মুড়ি খাইতে

খাইতে চল এট্টু মেলায় ঘুইরা আসি।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কৈলাশ লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেল না। তারপর ঘরের অন্ধকারে চোখ সইয়ে চিৎকার করল, এই যে ইখানে। পয়সা পেয়্যে তাড়ি গিলছিস নাকি নয়ন?

কালাচাঁদ বলল, কুন ঠৈ আর গেল যে তাড়ি গিলবে। নাচ শেষ করে এই অবস্থা। তবে কহি শুন, নয়ন সারস হইয়া গেছে

মদন বলল, উ কেনে সারস হইবে। আহা। উ রকম কহিও না। কৈলাশ খোচা মেরে দেখে কঁক শব্দটা শুনে মনে মনে তেল-মসলার গন্ধ গেল, সি রকমই লাগছে বটে বিনোদ, একটা চাককু লিআয় শালা সারসকে কাইটা মাংস রাইন্ধা খাই।

মদন নয়নের কাছে গিয়ে পিঠের ওপর হাত রাখল। যেমন হয় তেমন শিরশির করছে শরীর।

—নয়ন, নয়ন উঠ ভাই। এখুন হামরা চইলা যাব।

কালাচাঁদ ধমক দিয়ে বলল, যা ভাগ। উ তোদের সাথ যাইতে নারবে। নয়নের বন্থকে কহিস উ সারস হইয়া গেছে।

ওরা চলে যাওয়ার পর কালাচাঁদ সন্ধ্যা নামার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে একসময় কান্নার মতো টানা টানা আওয়াজ পেল। ভাষাহীন পাখির ভাষাহীন দুঃখের স্বর

—কঁ অ অ কট্ উ স্ স্। কাছে গিয়ে দেখল লম্বা ঠোঁট দুটো ফাঁক করে লকলকে ঘোর বাদামী রঙের জিব নাড়ছে। বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। চোখে জল নাই। পাখিদের চোখ থেকে কান্নার ফোঁটা গড়িয়ে আর পাঁচজনের বুক ভিজিয়ে দেয় না। ওটা শুধু মানুষ পারে। অন্যকে দুঃখ দিতে পারে। হায় নয়ন তুই সারস হইয়া গেলি। সারস নয়ন। কেনে কানছিস? কি তোর দুখ? কট? কাইটা খাইয়া লিবে? আবে উটা একদম ঝুটা কথা। না কট। নয়ন তোকে কেহ না কট। কৈলাশ হারামীর নোলা বেশি। যাই শুনল যে তুই সারস হইয়া যাছিস তো আয় কাইটা খাই। ঘরে ভাত নাই, পাখি ধইরা খাই। গরিব দুবলা পাখি মাইরা খাওয়া খুব সুজা না? কান্দিস্ না নয়ন সারস। উঠ। মরদ আছিস না? খাড়া হইয়া দাঁড়া। দিন মান ডুবতে লেগেছে। আন্ধারে আন্ধারে যাব যাতে যাতে কেহু তোর ই দশা না দেখতে পায়। আয় হাত ধর। আ মর, তোকে ছুঁতে যাছি তো ডরে ভাগছিস কেনে? ই দিক একবার তো উ দিক একবার। ঝাপট মারছিস। ক্যানে তুই কি কুনদিন ঘরে ফিরা যাবি না? কলমির কথা মনে নাই? অমন সোন্দর বহু তোর। যাদুর কথা মনে নাই? অমন সোন্দর ছ্যেলা তোর। কে তোকে সারস হইতে কহেছে? কেনে হলি? কুন দুখে? হ্যাঁ হামি কালাচাঁদ উস্তাদ তোকে ডাকছি। উইঠা আয়। আবে বেকুফ হারামীর বাচ্চা উইঠা আয়। শুন সোনার চান্দ, নয়ন সারস, মানিক বিনতি শুন হাতধর উইঠা আয়। না?

মারি এক ঝামট। কি? হামাকে ঠোকর দিলি? মার লাথ। এত সাহস? মার চাপর। আঁ? লাড্ডুয়া বেহুদ্দা কাঁহাকা। দেখ কেমুন গো বেরান বেরাইছি তোকে। মার শালাকে মার মার। মাইরা ভূত ভাগাছি দ্যাখ। ফের দু ঘা। কি কেমুন ছটফটাইছিস? পায়ে মুখ ঘসতে লাইগছিস? হল! আচ্ছা আচ্ছা উঠ।

এইতো উঠলি। তেবে আগে কেনে উঠলি না? পিটন না খাইলে হয়না? তুকে মারতে কি মন চায়। লিজের দোষে খাইলি। কান্দিস না ভাই, হামি তোকে বুকে সাইমটা ঘরে লিয়া যাব। আয় খাড়ো হ। আগে যখন নয়ন ছিলি তখন যেমন দু-পায়ে খাড়ো হতি তেমন হ। হাঁ আর একটু। হামার হাত ধইরা দু'পা হাঁটতো। হাঁটি হাঁটি। দেখ কেমন ছাম ছাম কইরা হাওয়া ছুটছে। শেষবেলার আকাশ দুনিয়ার সব রঙ দেখাই দিছে। মেল্যা ভাইঙা গেছে। ইদিক-উদিক কুপীর লাল আলো। কেহু ভাত রান্ধছে। উরা সব মানুষ। হায় নয়ন, একা তুই সারস হইয়া গেলি? আগুন দেইখা ডরপাইছিস। ঠিক আছে পিছন বাগে চল। আইজ পরথম রাইত আন্ধার। শেষ রাইতে চান্দ উঠবে। ভোর হবে তবু চান্দ যাই যাই কইরা রহে যাইবে। এক আকাশে চান্দ আর সূরয। তুই যখন নয়ন ছিলি নাচতে নামলে এক শরীরে মানুষ আর সারস। একজনা বলে থাকি হে অন্যজনা বলে না পালাই। কোথায় পালাই যাবে হে বাপু? শ' কোশী জলে সব ডুইবা আছে। আমাদের জেবন তো তাই। চোখের সামনে ছ্যেলা ভুকে কান্দে বউ অকালে যৈবন হারায়। কোন ফান্দে ফেইলছে হে ধনা, চালের খড় উইরা যায় পছিয়া হাওয়ায়, ঘরে বান ডাকে, রোগাভোগা চ্যাংড়ার বিছ্না কাঁথা ভিজা যায়। দুদিন ভাত খাইয়া তিনদিন বাঁচবে সিটাও হবেনা কিনা ধনা ইট ভাটা কইরাছে তাতে ধানের ভুঁই খাদ হইল তো উয়ার কি? হেই সারস তুই বেপথে যাছিস। আন্ধারে চোখে দেখতে পাসনা। উঝট খাইয়া হাত ছাইড়া দিলি। উড়াল দিয়া কুণ্ঠে গেলি? সোনার বালুচরে কে যাইতে পারে? মানুষের মন। উরকম সোন্দর জেবনের কথা ভাবে আর হাতে-পায়ে কাদা মাইখা কাজ করার কষ্টটা সহে। হ্যাঁ মানুষ হইয়া সহে। ফিরা আয় নয়ন। তোকে হামি দেখতে নারছি। ফিরা আয় নয়ন সারস। সারস হে....... হে ই ই........।

আকাশ নরুন-চেরা এইছে। লহু লহু বরণ দাগ। চান্দ উঠছে। জোনায় ইবার সব নজরে আসছে। ও সারস কুনঠে ছুপাই থাকবি? ওইতো তোকে দেখা যাইছে। হামি জানতাম শেষতক তুই ই ডুবা জমির কিনারে ছুইটা আসবি। ইটাই তোর শ কোশী জলা। উপারে চোঙের মাথায় কালো কালো ধুঁয়ার মেঘ। তার ভেতর পাকাধানের বরণ চান্দের মোহর লুকাচুরি খেইলছে। ছম ছম জোনায় বহুত দূরের গাঁ-ঘরের চালাগুলান থির ঢেউয়ের মতোন দেখা যাইছে। তার নীচে মানুষের সুখ-দুখ ভুড়ভুড়ি কাইটছে। তা কি তোর লেগে নয়? তুই মানুষ নয়?

তোকে মানুষ হইতে হবে সারস। মানুষের দুখ মনে নিয়া সারস কেনে হলি? সারসের সোনার বালুচর মনে নিয়া মানুষ হ, উইড়া গেলি তো ফুরাই গেলি।

সোমসারে কে কাকে বিদায় দিতে চাহে সারস? জলে নামিস না। ফিরা আয়। ইখানে তোর কেহ না থাকুক হামি আছি। আকাশের নীচে মাটির ওপর দুটা মানুষ থাকলেও সোমসার থাকে। হামি তোকে সোমসারে ফিরাই নিয়া যাব। আয় উঠে আয় সারস মানুষ হ। আয় উঠে আয় সারস নয়ন হ। হামি কালাচাঁদ উস্তাদ তোকে সারস বানাইতে পারি ফের মানুষ কইরতে পারি। হাঁ শেষ থিকা শুরুতে আয়। যিখানে শেষ কইরাছিলি। এই ভোবন ডুবু ডুবু জলে শেষ ডাঙাটায় তোর আছাড় খাইয়া পড়া। সিখান থিকা নাচ। ধাগ তা ধাগ তা আহা ধিগা তিন ধিনা ধিনা ধা। জল থিকা ধিনা ধিনা ধা কইরা উইঠা আয়। ঠিক হইছে। শরীর ঝুমু ঝুমু কাঁপা। তা ধিনা তাক তাক কুড় দূর হইছে আন্ধার। ফুটি ফুটি চান্দ। সুম সাম ই জগতে কে তোকে অমন নাচাতে পারে? আমি ছাড়া? হেই চান্দ, হেই তারা, হেই হাড়ের মতোন ধবল ধবল পাতিয়াল বন, নাচ দেখ। তিকি ধা তিকি ধা তিনা ধিনিকি ধিনিকি ধিনা রিনি রিনি চিনি চিনি রে ইটা তোর জাগ—জাইগা উঠছিস তুই। দুখী মানুষ মানুষের কাছে ফিরা আয় ধাক্ বল আ দিগ্ বল মি আমি আমি নয়ন বল আমি।

উই দ্যাখ চিকাশ ফুটছে। মুখা খুইলা ফেল।

পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁশের সাঁকো

শুরুতে সাঁকোটা ছিল মাত্র একটা বাঁশের। গুণ চিহ্নের মতো আড়াআড়ি করে পোঁতা এক জোড়া খুঁটির খাঁজে গোড়ার মোটা অংশটা পা রাখার এবং ডগার সরু অংশটা হাতে ধরার জন্য একটু উঁচুতে বাঁধা। এতেই কতকাল পার হয়ে গেছে। জলে বাঁশ পোক্ত থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য পাল্টাতে হয়। গঙ্গা পুব দিকে সরে যাওয়ার সময় এই দ্বীপটার বাকি তিনদিক ঘিরে আধখানা চুড়ির মতো জলা ফেলে গেছে। বর্ষায় নৌকা চলে। অন্য সময় ছিপছিপে জল, কাদা, নল-খাগড়া বন, নালি ঘাস আর মাঝে মাঝে চোরাবালি।

এ গ্রামের ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বড় হয় কিন্তু সাঁকোটা বহুকাল একই মাপের থাকার পর হঠাৎ বাড়তে শুরু করল। প্রথমে ডাঙার সঙ্গে এক বিঘৎ ফাঁক দেখা দিল। তার বিশ দিনের মাথায় এক হাত। এতে কারো কিছু মনে হয়নি। কতই আর দ্বীপটার বাইরে যায় ওরা। এটুকু ফাঁক লাফিয়ে পেরুলেই হল। তারপর হঠাৎ এক রাতে বিশ গাঁঠ জমি বসে গেল। কাত হয়ে। মৃদু চক্ চক্ শব্দ। শেয়াল জিব দিয়ে চেটে চেটে জল পান করলে যে শব্দটা ওঠে সেরকম! শোকে তাপে বা সুখে যাদের ঘুম আসেনি তারা শুনতে পেয়েছিল। শত সহস্র শেয়ালের জলপানের সম্মেলক। অতি ক্ষীণ শব্দের অত্যন্ত জটিল কম্পন। খুব চড়া আওয়াজ হলে লোকে চমকে উঠত। কিন্তু এতে কিরকম বুকের ভেতর মোচড় দিতে দিতে রাত পার করে দিল। সকালে দেখা গেল সাঁকোটা এক বাঁও মানে ষোল গাঁঠ বাঁশের দৈর্ঘ্যে সরে গেছে। পাশের কলা বাগানের দু-একটা গাছ কাত হয়ে পড়লেও মোটামুটি সমানভাবে বসে গেছে। পা বাড়ালে পাতার ডগা ছুঁয়ে যায়। দিয়ারা বসন্তপুরে বাঁশের অভাব নেই। একুশ ঘর লোকের উনিশ ঝাড় বাঁশ। বস্তুত এখানে ঘর মানেই বাখারির বেড়ার ওপর বাঁশের কাঠামে খড়-ছাওয়া চালা। লবণ রাখার চোঁয়া আর দুধ দোয়ার কেঁড়ে বাঁশের। ঘর-সংসার থেকে সবসময় একটা বুনো গন্ধ উঠতে থাকে। তো এখানকার পারাপারের সাঁকোটাও বাঁশের। ওপার থেকে যার মেয়ে-জামাই আসার কথা তার বেশি মাথা ব্যথা। কাজেই নিজের ঝাড় থেকে তাড়াতাড়ি বাঁশ কেটে ফাঁকটুকু পূরণ করে দিল। সাঁকোটা বাড়ন্ত হতে শুরু করল তো তর তর করে বেড়ে চলল। সাত বছর তিন মাস পরে আজ সকালে শেষ অংশটা যোগ হয়ে পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁশের সেতু হয়ে গেল। একশ একুশটি বাঁশ।

এ নিয়ে কেউ গৌরব বোধ করল না। দেখ দেখ এই দীর্ঘতম বাঁশের সাঁকো আমাদের। সুবল যে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাতে কুন্তীর গাল বেয়ে নামা রুখু রুখু চুলগুলি একটু কাঁপল মাত্র। গ্রামের চোদ্দটি বাচ্চা পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে ঘন হয়ে

বসে রইল এবং জলের ফুসকুড়ি ফুটে ওঠা উঠান বেয়ে লালচে রঙের একটা কাঁকড়ার এগিয়ে আসা দেখতে থাকল। সাঁকোটাই বলে দিচ্ছে চলে যেতে হবে। দিয়াড়া বসন্তপুরের দখল নিয়ে কাঁকড়া, জলাভূমির বোরো সাঁপ। হেরোলডুবি চোরাবালির গোপন ভয়ংকর মুখের লালচে বৃত্তটার পাশে পুঁতে রাখা তেমাথা ডালের চিহ্নটা দিনে দিনে মানে হারিয়ে ফেলবে। যারা জানে তাদের অভাবে। সেই পাতাল ছোঁয়া খিদের কাহিনী। জন্তু-জানোয়ার তাদের জান্তব বোধ দিয়ে মাটির ওপরকার সর্বনাশের দাগগুলি চিনে ফেলে। তবু অসতর্ক মুহূর্ত আসে। হেরোলের তাড়া খেয়ে ছুটন্ত ছাগল চোরাবালিতে পা দিয়েছিল। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জন্তুটা যখন বুঝতে পারল মৃত্যুর ওপর ঝাঁপ দিয়েছে তখন আর ছেড়েছুড়ে উঠে আসার উপায় নেই। আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী গলা জড়াজড়ি করে আর্তনাদ করতে করতে ডুবতে থাকল। ধীরে ধীরে। একজন বাঁচার মর্মান্তিক তাগিদে অন্যজন প্রচন্ড জিঘাংসায় অন্ধ হয়ে। খিদে, জননেচ্ছা, হিংসা ভয় এইসব সহজ প্রবৃত্তিগুলি বাঁচার জন্য আবার বিনাশের জন্য। ঠিক পরিমাণটা বোঝাতে হেরোল ডুবি চোরাবালি। অন্ধ হয়ে যাওয়া ভাল নয়। যতটা হলে ভেতরের চোখটা খোলা থাকে, বিনাশের চিহ্ন দেখা যায়, ততটাই পরিমাণ। মাঝে দুলতে থাকা দীর্ঘ অস্তিত্ব পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁশের সাঁকোটার মতো। এ পাড়ে ডুবন্ত দিয়ারা বসন্তপুর। ও-পাড়ে আলো ঝলমল নয়ানগর। রাত নামার আগেই টালমাটাল পায়ে পার হয়ে যেতে হবে। শেষ চোদ্দজন শিশু, ষাটজন কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এবং নজন বুড়োবুড়ি মোট তিরাশিজন। কাল সারারাত ঝড়ো হাওয়ার পর এখন সমস্ত স্তব্ধ। কাত হয়ে পড়া তেঁতুলগাছটার একটাও পাতা নড়ছে না। দম বন্ধ করা বিদায় বেলা। প্রতি আঙুল মাটিতে সেই অত্যন্ত ক্ষীণ অথচ নিদারুণ স্পষ্ট জিব দিয়ে চেটে নেওয়ার চুকচুক শব্দ। বাইশটি সংসারের পোঁটলাপুটুলি, হাঁস-মুরগী, তৈজস বৈকুণ্ঠের উঠানে জড়ো করা হয়েছে। এসব দেখলেই বোঝা যায় গত সাত বছর তিন মাসে কত দীন হয়ে গেছে ওরা। সেই অদৃশ্য জিব মাটির সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই লেহন করেছে।

আর বিলম কেনে? উঠগো সব ইবার। হাঁ, হাঁ। উঠ, উঠ। মেলানি কর। হাওয়া দম ধইরা আছে। ইটা ভাল। সাঁকো কম হেইলবে। পেরায় থির হইয়া থাইকবে। বুড়া আর চেংড়া পিলাদের পাঁও লসকাইবে না। হেই-ও। চল গো চল। বিন্তী, অ বিন্তী-ই-ই। কান্‌ছিস কেনে? উঠ, চোখ মুছ। পেরথম কে যাবা গো? ভীম? তুমার পিছে কে, লখিয়া? এসব যাওয়ার আগের কোলাহল। সাঁকোটা সরু। পাশাপাশি চলার উপায় নেই। এমনকি পিছে পিছেও নয় এক বাঁশ দূরত্ব রেখে। যাতে দু'জনের ভার একটা খণ্ডের ওপর না পড়ে। এ অবস্থায় সবাই একা একা। যেতে যেতে কথা বলা চলে না। শুধু ভাবা যায়।

ভীম কাঁধে পুটুলি নিয়ে ডান হাতে ধরাক ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগুল। কিছুদূর এগিয়ে পিছু ফিরে দেখল লখিয়া সাঁকোতে উঠে পড়েছে। তার পেছনে নির্বাক লোকগুলি।

কারো কিছু বলার নেই। কেননা প্রত্যেকের চলা আলাদা, স্মৃতি আলাদা, ভবিষ্যত আলাদা। তবু কেউ তো কারো বউ ছেলেমেয়ে মা বা বাবা। তাই এক একটা গুচ্ছ। কাছাকাছি বসা তিরাশিজনের বড় দলটার মধ্যে ছোট ছোট ভাগ। তার পেছনে বৈকুণ্ঠকাকার হেলে পড়া চালা। একেবারে পেছনে দুরি রায়ের থান। ওলটানো অশ্বত্থ গাছের ডালপালা পাতা দেখা যাচ্ছে। ওদিকে তাকালেই কানের ভেতর যে কান আছে তাতে ঢাকের আওয়াজ। ওসব সুখের দিনের আওয়াজ। দাদু বলত, এই দুরি রায়, বুঝলি কি না, ই গাঁয়ের যখন জনম হইল মাটির তল থিকা উইঠা ছিল। কাছিম আকার। বসন্ত মালকে বুলল, বেটা, গাই চরাইছিস চরা। বড় ভুখে আছি। দুধ পিলা। তুর ভালা হবে। তো দিল। এক কাচ্চা কর্যে দুধ। সাত দিন। হপ্তা কাইটা গেলে দুরি রায় ফের বুলল, বসন্ত হামাক বেটার বহু দেখা। কাইল বিহান বেলায় যে মেয়াকে বিলের জলে চ্যাঙমাছ ধইরতে দেখবি উকে তুইলা আইনা হামার সুমুকে বিহা কর। ছেইলা কর। ঘর বানা, চাষ কর। তো তাই করল। সেই পেরথম মা'র রঙ ছিল কেলে সাপের লাহান আন্ধার। শরীলে আলা চাইলের গন্ধ। অনেকটা চলে এসেছে ভীম। লখিয়া বেশ পিছিয়ে পড়েছে। ওর শরীরেও সেই আদি জননীর মতো আতপ চালের গন্ধ। ভীম পেয়েছে। কতবার। পাতিয়াল ঝোপের আড়ালে আলো ছায়ার বুনোট.মাদুরে। জলার ধারের নরম মাটিতে। চোরাবালির শব্দহীন টানের মতো এটা পাপের টান। তবে কি সেই পাপমাটির গর্ভে ফিরে চলে গেল দিয়ারা বসন্তপুর? লখিয়া দেখছিল সামনে। বহুদূরে ক্রমশ মাথা তুলতে থাকা বালুর ঢিবি। ওটা ডিঙিয়ে গেলেই দিয়ারা বসন্তপুর আর দেখা যাবে না। তারপর যার যেদিকে মন চায় যাও। কি ছিল দিয়ারা বসন্তপুরের মনে? ও কি দেখার জিনিস। পছিয়া হাওয়ার মতো। হুহু করে। রুখা শুখা ডাল ভাঙে। রহে রহে ঝামট দেয়। তখন পিটুলি ফল খইশা পড়ে জলে গুব গুব। ওটাই মনের কথা। কিনা শরীলতো জলের। বহে যায়। ফল দাওতো রাতভর কানের কাছে কত কথা কহি। সুখের কথা। গুব গুব। দুখের কথা। গুব গুব। পাখ-পাখাল যখন জোর বান্ধে তখন কি ওদের মন খারাপ হয়? আমার হত! পাপের ছায়া পড়ত। কি না দুরি রায়ের মানা আছে। আমার যৈবনে আলোচালের বাস উঠতে লেগেছে। ই গাঁয়ের পুরুষের সাঁথে মিলন নাই। ধরা পড়িতো গাঁ বুড়া তিনজনা হাঁটাই নিয়া যাবে হেরোল ডুবি চোরাবালির ধার। আকাশ কালো হইয়া যাবে। হাওয়ায় শ্বাস উঠবে। চারো ওরে ঝোপে-ঝাড়ে জন্তু-জানোয়ার খারা হইয়া যাবে। দোহাই দুরি রায়। তুই পাপ করেছিস। নেমে যা নেমে যা। ডুব ডুব। ভীম, আমি ডুবেছি কিন্তুক মরি নাই। তোমার সঙ্গ নিব। দিয়ারা বসন্তপুর গেল তো পাপও গেল। না? মনে মনে নিয়ে যাবা? পাপের ছাড়ান নাই? জেবনভর দুখাইবে?

এবার সাঁকোতে উঠে এসেছে জলধর। তার পেছনে বিকাশ। নালার মতো একটা সরু রেখায় গাঁথা পড়েছে ওরা। তবু সবাই একা। জলধর নীচের দিকে দেখছে।

জল কাদা, বেনো ঘাস, কশার আর পাতিয়াল ঝোপ। এরমধ্যে একটা পাখি চিক চিক চিক করে উড়ে গেল পায়ের তল দিয়ে। মাটির সঙ্গে অনেকটা বিচ্ছেদ ঘটেছে। জলাভূমি গ্রাস করেছে তবু চাষের জমির আলোর চিহ্ন রয়ে গেছে এখনও। ডান দিকে মুন্নার মাঠ। ধাপে ধাপে উঠে সাগরী পিশির ভিটে ছুঁয়ে ছিল। বাঁদিকে একফালি গোপুর। তার পাশে একেবেঁকে সেচ নালা। এখন চওড়া হয়ে টান টান বইছে। প্রবল বেগে মাঠ ধোয়া মাটি গলানো ঘোলা জল ছুটে চলেছে। একপাশ থেকে খেতে খেতে এক ধাপ, তারপর আর এক ধাপ ক্ষয় করে ফেলেছে। প্রথমে অত্যন্ত ধীরে তারপর দ্রুত। মানুষের বেলাতেও তাই। গোড়াতে ক্ষয়রোগ নজরে পড়ে না। কত তাগড়া ছিল হরেণ মাস্টার। হামাঘেরে নেতা। কমরেড। কৃষক সমিতি। লাল ঝাণ্ডা। লাঙ্গল যার ভুঁই তার। গহীন রাতে মিটিন। সাগরী পিশির দর্মার বেড়া দেওয়া উঠানে। দুটা-পাঁচটা ভুষা পড়া লণ্ঠন। দাওয়াতে মেয়ারা। আন্ধারে ঠাহর যায়না কিন্তুক চুড়ির ঝিনিক ঝিনিক শুনা যায়। কারো কোলের চেংড়ার ওঁয়া ওঁয়া। আ আ থাম থাম বাছা। ই সব ভুঁই হামাদের হবে। সব ধান। দুধ ভাত খাবি। নাকাশি মাদুরে শুবি। আম বাগানে কোকিল ডাকবে। তার আগে ...... হুঁ তার আগে কমরেড গরিবের রাজ কায়েম করতে হবে। সব জমি দখল করতে হবে। জমি কার?—হামাদের। কারা বন কেটে বাঁদার হাসিল করে সাপ বাঘ হেড়োল ঝরা আর খরার সঙ্গে লড়াই করে এই সব জমি করেছে?—হামরা। কাদের বাপ পিতাম'র ঘাম রক্ত হাড় এই মাটিতে?—হামাদের। চৌধুরী জমিদাররা কোনদিন এ জমির কাদা মাটি মেখেছে?—না। তবে জমি কার?—হামাদের। আগে সব বন ছিল গো। আন্ধার বন। সেই বন থিকা এট্টু এট্টু কইরা জমি কইরাছি। জমিদার কহিল সেই জমি জমিদারের। সাহেবরা উয়াদের দলিল দিয়াছে। মালিক কইরাছে। যাও মালিক লেঠেল লিয়া গরিব-গুর্বাদের মাথায় ডাণ্ডা মার। তুমার পিছে পুলিশ থাইকবে আদালত থাইকবে জেল থাইকবে। থাকুক, হামরা তুমাদের মানি না। লড়াই দিব। দুনিয়ার খাইটাখাওয়া মানুষ গুলান জোট বাইন্ধাছে। হামরা লিচ্চয় জিতব। উদের জেল পুলিশ আইন আদালত মানি না। শুনতে শুনতে পুরুষদের হাতে হাঁসুয়া উঠে আসত। শক্ত হয়ে উঠত মুঠা। তো সে লড়াই হল। বাংলা তেরশ সাতান্ন। মুক্ত এলাকা। এই জলাটা তখন শুরু ছিল। হরেণ মাস্টার বলতেন, আমাদের টেরেন্চ। গাঁয়ের অর্ধেক পুরুষ জেলে। চোদ্দ বছরের বালক নয়ন খুন হল। এতে ওদের দুঃখ হয়নি। লড়াই করতে গেলে এসব হয়। প্রাণ দিতে হয়। ঈজ্জত দিতে হয়। তারপর লড়াই শেষ হল একদিন। পথ ভুল হয়েছে। কতদিন পর হরেণ মাস্টার জেল থেকে ফিরে এক ভোর রাতে ডাক দিলেন, সাগরী, ওঠ ওঠ। সবাইকে খবর দাও মিটিং হবে। নতুন লড়াই শুরু করব।—ওমা, চিনাই যায়না গ। ই যে মাস্টারের কংকাল। কেবল চোখ দুটা আছে। জ্বলন্ত আংগার। তা আইসা শুইয়া পড়ল। আর উইঠল না। একদিন মুখ দিয়া রক্ত উইগরা সাগরী পিসিকে লাল কইরা মইরা গেল। নয়াকালের লোকগুলান ভোট

চাহিতে আসে। মইরতে আসে না। মইরতে কহেনা।

বিকাশের চোখে পড়ল জলধর মাথা নীচু করে পাতালে রওনা হওয়া জমিজমা দেখছে। বুড়ো ভাম। মরতে বসেছে তবু খুদের হাঁড়ি ছাড়ে না। বলে কি না জমি বেইচব না। কেন?—উ জমির জন্য কত লড়াই কইরাছি।—বাল ছিঁড়েছ। পাতালে যেতে বসেছে ওতে কি আর ধান পাবে?—না পাই জমি বেইচবনা।—বেচবে না তো বেচবে না। কচুরি পানার চাষ কর। হ্যাঁ জলধর খুড়ো তাই কর। তোমার তিন বিঘা না পেলেও নয়া নগর ফিসারিজের আটকাবেনা। আইনে না পেলেও এমনি পেয়ে যাবে। দক্ষিণে বাঁধ দিলে সবটাই ডুবে যাবে। কোনও দুরি রায়ের হুকুম বা হরেণ মাস্টারের বুকের হাড় তাকে দশ-বিশ হাত জলের তল থেকে তুলে আনতে পারবে না। কবেকার ধ্যানধারণা নিয়ে পড়ে আছ। কোথা থেকে কি হয় জানো?

বিশ মাইল দূরের ফরাককা ব্যারেজ দিয়ারা বসন্তপুরের ভাঙন এনেছে। কেউ রুখতে পারবে না। সাঁকোর চিহ্ন থাকবে না। থই থই জল। হরেণ সরোবর। লোকে বেড়াতে আসবে। নৌকা চড়বে। তিন হাজার বিঘা জলকর। নয়ানগর ফিসারিজ। মৎস বিপ্লবের একধাপ। লঞ্চ, গাড়ি, সাইন বোর্ড, বাজার, হোটেল ওদিকে কলোনি। রাস্তার দুপাশে ইলেকট্রিক লাইট, ভিডিও হল। জম্পেশ ব্যাপার। কি হতে যাচ্ছে ধারণা আছে তোমার? এসব কারা করছে? আমরা। এরজন্য পঞ্চায়েতকে কম লড়াই করতে হয়েছে? সমবায় মন্ত্রীকে ধরে এই ব্যবস্থা। মৎসজীবী মহামণ্ডল ডুবা জমি কিনে নিচ্ছে। একেক বিঘা হাজার টাকা। লিখে দাও আর হাতে হাতে টাকা নাও। অথচ তুমি বাধা দিলে। কেউ তোমার কথা শুনল? আরে এতো লাভ লোকসানের প্রশ্ন। ডুবা জমির ধারে বসে ব্যাঙের ডাক শুনবে, না টাকা নেবে? অনন্ত রিক্সা কিনবে। যোগেন চায়ের দোকান করবে। যাদের এসব করতে টাকায় কুলোবে না—তারা বাঁধে মজুর খাটবে। তারা আমার পিছনে পর পর উঠে আসছে। তোমার লড়াই খতম। একজন একজন করে পার হবে আর দিয়ারা বসন্তপুর একটু একটু করে মরে যাবে।

প্রথমজন নয়ানগরের মাটিতে পা দিয়েছে। শেষজন দিয়ারা বসন্তপুরের কাদা থেকে উঠে এসেছে। মাঝখানে আমি। এ সময় ঝাপ্টা হাওয়া দিচ্ছে আর ভীষণ দুলতে লেগেছে সাঁকোটা।

এক ঘণ্টা তেইশ মিনিট নয় সেকেণ্ডের সংসার

বুধন এবং রশিলার শেষ এক ঘণ্টা তেইশ মিনিট নয় সেকেণ্ডের সংসার যাপনের বিবরণ দিতেছি। সংবাদ পত্রে তাহাদের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। প্রবল স্রোতের মধ্যে উক্ত স্ত্রী ও পুরুষ একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট আছে এবং উভয়ের মুখমণ্ডলে কালতরঙ্গ ভঙ্গের পরিবর্তনমান আভার ন্যায় যুগপৎ আশানৈরাশ্য, ফুল্লতা-ত্রাশ, চেষ্টা, জাড্য, ভীতি ও ভরসা প্রতিফলিত হইতেছে অবলোকন করিয়া নিশ্চয় বিস্ময় বিমূঢ় হইয়াছেন অথবা উক্ত আছে ক্ষুদ্র ও খণ্ডের দ্বারা অখণ্ডের প্রতীতি জন্মে যথা তৃণখণ্ডের দ্বারা স্রোতোবেগ।

এ ক্ষেত্রে তৃণখণ্ড একটি নহে যুগল। স্রোত আকস্মিক। তাহার বেগ সম্পর্কে সংবাদপত্রে কিছু সংখ্যাতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হোক এই দেবভূমিতে কিউসেক প্রভৃতি শাব্দ বিজাতীয়। বরঞ্চ পলকে হস্তি দশহাত ভাসিয়া যায় এরূপ বলিলে ভাল বুঝা যাইবে।

বুধন হাঁসদা শূদ্র জাতির। সে অন্নচিন্তায় অস্থির হইয়া তৎক্ষণে কর্ম অনুসন্ধানের নিমিত্ত দুই ক্রোশ দূরবর্তী লোকালয়ে রওনা হইতেছিল। পূর্ববর্তী দিবসদ্বয়ে কর্মসংস্থান না হওয়ায় একপ্রকার অনাহার চলিতেছিল। একপ্রকার বলিলাম একারণে যে ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারী, বা বৈশ বনিকদের ন্যায় শূদ্ররা কদাচ স্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন আহারে অভ্যস্ত নহে। গুগলি কাঁকড়া ও কলমি শাকের ঘ্যাট দ্বারা উদর পূরণ করিতে তাহাদের নিম্ন রুচিতে বাঁধে না। অতএব রশিলা বিশুষ্ক প্রায় নদী গর্ভে নামিয়া ইতস্তত বদ্ধ জলকুণ্ডে হাত ডুবাইয়া গুগলি অনুসন্ধান করিতেছিল। নদীর নাম কাজলী। বড় সুন্দর নাম। বস্তুত জলবিদ্যুৎ ও সেচের নিমিত্ত বাঁধ নির্মাণের পূর্বে এই নদী যখন যৌবন মদে মত্তা নারীর ন্যায় নীলাঞ্চল বিস্তৃত করিয়া দ্বিপ্রহরে আলস্য শয়নে থাকিত তখন তাহার জলরাশিতে প্রান্তশায়ী পর্বত তটলগ্ন অরণ্যের মায়াময় শোভা প্রতিবিম্বিত হইত। মনে হইত একযোগে সে স্থলভাগ ও আকাশের দৃশ্য দেখিয়া জলোচ্ছ্বাসে কেকাধ্বনি করিতেছে। এখন জলরাশি বাঁধে আটক পড়িয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। সেই ক্রোধ যে অগ্নি বর্ষণ করে তাহাই জলবিদ্যুৎ। বস্তুত বুধন ও রশিলার প্রাক্তন গৃহ ও চাষের জমি ওই জলের চুয়ান্ন হাত নীচে মগ্ন হইয়া আছে। বিনিময়ে বাঁধ নির্মাতারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বুধনের পরিবারের কেহ চাকুরি পাইবে। কিন্তু পায় নাই। কারণ উক্ত আছে, মহতী ব্যক্তি স্থান ত্যাগ মাত্র বিস্মৃত হন যথা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে।

এইরূপে বুধন ও অন্যান্য শুদ্রগণ পর্বতের পাদদেশে অরণ্যবেষ্টিত জনপদ হইতে

উৎখাত হইয়া জলবিদ্যুৎমালায় শোভিত নগরের দ্বারে দ্বারে ঝুরি ও গাঁইতি সহ দিন মজুরী নিমিত্ত ঘুরিতে থাকে। যে দিবস কর্ম-সংস্থান হয় সে দিবস তণ্ডুল ক্রয় করে। তবে বন্য হস্তি ও বনবাসীদের হাড়িয়ার প্রতি এক-প্রকার আত্যন্তিক টান থাকে। তণ্ডুল ক্রয় করিবার পরিবর্তে প্রায়শ হাড়িয়া পান করিয়া মত্ত হইয়া চক্ষে কেবল সবুজ দেখিতে থাকে। গাড়ি সবুজ, লাইট পোস্ট সবুজ, ট্রাফিক পুলিশ সবুজ এমন কি বহুতল ভবনসমূহকে প্রাচীন বৃক্ষ বলিয়া বোধহয়। তাহার কক্ষগুলি কোটর। শিশুদের কোলাহল পক্ষীর কিচিমিচি। মালিকের কণ্ঠস্বর ভল্লুকের ঘঁত ঘঁত। মত্তাবস্থায় পথিপার্শ্বে পতিত হওয়া মাত্র নগর স্থলে একদা যে অরণ্য ছিল তাহা চারিদিক ঘিরিয়া ফিরিয়া আইসে। পরতে পরতে স্নেহাঞ্চলে বেষ্টন করে। ক্ষুধা অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ লাঞ্ছনা কোথায় যায়। শতশত বর্ষ পূর্বের অমল চন্দ্রোদয়ে মুগ্ধ বনভূমির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভিতর হইতে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। যদ্যপি ইহাকে অসংস্কৃত বাংলায় খোয়ারী বলে তবু ইহারই টানে তাহারা সামান্য অর্থ হাতে পাইয়া হাড়িয়া পান করে। পরদিবস কুটিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া শবরীর নিকট—'আর কুন দিন হাড়িয়া খাব নাকো, হাঁ', বলিয়া নাকে খৎ দেয়। ঘটনার দুই দিবস পূর্বে বুধনের এইরূপ হইয়াছিল। অন্যান্যবার সেই রাত্রেই শয্যায় স্ত্রী পুরুষের মিল হইয়া যায় কিন্তু এবার দুই দিন ধরিয়া না জুটিল কর্ম না মিটিল রশিলার ক্রোধ। বাক্যালাপ বন্ধ। রশিলাকে স্পর্শ করিবামাত্র উচ্চিংড়ের ন্যায় ছটফট করিয়া সরিয়া যায়। আলগোছে শাক সিদ্ধ পাত্র আগাইয়া দিয়া উল্টা মুখে বসিয়া থাকে। বুধনের হৃদয় শরাঘাতে জর্জর হইতে থাকে। অদ্য প্রত্যুষে সিঙ বোঙার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিল যাহাতে এগার টাকা উপার্জন হয়। দশ টাকা রশিলার হাতে দিবে ও একটাকার রঙীন খোঁপার কাঁটা কিনিয়া নিজ হস্তে পরাইয়া দিয়া মাথাটি বুকে টানিয়া লইবে। সেই সময় সেই মর্মান্তিক চিৎকার এবং প্রবল গর্জন।

হতচকিত হইয়া বুধন ভাবিল রশিলাকে কোনও বন্য জন্তু তাড়া করিয়াছে। বনবাসী সুলভ পশু প্রবৃত্তির তাড়নায় তৎক্ষনাৎ হাতে একটি গাঁইতি তুলিয়া শব্দের বিপরীত দিকে হাত ত্রিশেক ছুটিয়া গিয়া পত্রান্তরালে নিরাপদ অবস্থানে দাঁড়াইল এবং কান খাড়া করিয়া পুনরায় সেই শব্দ শুনিল। এবার আক্রমণ। অঙ্গ শিহরিত। পেশি স্ফীত। চক্ষু ঘূর্ণিত। কণ্ঠে অমানুসিক হুঙ্কার। বুধন ব্যাঘ্রাৎলম্ফে নদীগর্ভে অবতরণ করিয়া রশিলার সন্নিকটে উপনীত। সম্মুখে মসির্ণ হস্তি-যুথের ন্যায় জলরাশি প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। বুধন দেখিল রশিলা নিদারুণ আতঙ্কে চলৎশক্তিহীন হইয়া কাঁপিতেছে। স্ত্রীকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুনরায় লম্ফ দিয়া পাহাড় হইতে গড়াইয়া নামা নদীগর্ভের একটি প্রস্তরে ঠেশ দিল এবং হাতের গাঁইতি তুলিয়া ধরিয়া আ আ রবে হুঙ্কার দিল। জল কিছু মাত্র কর্ণপাত করিল না। ঝাপট মারিয়া পৃষ্ঠপোষক শিলা খণ্ডের উপর চাপিয়া ধরিল। উভয়ে আবার উঠিল আবার পড়িল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ তরঙ্গাঘাতের অন্তবর্তী সময়ে অভিমানিনী স্ত্রীর সহিত অনুতপ্ত

স্বামীর কিছু আলাপ হইল।

—হেই রশিলা ডরাস না

—উম্

—মোকে শক্ত করয়্যে ধর। বাঁধের জল ছ্যেড়েছে বটে

—থ পাইচি না। হড়কে যাছি রে

—থির হ। মোর হাত ছাড়িস না। কিনারে যেত্যে হবেক। জল বাড়ছ্যে।

—উপ্ উপ্ তু আলি কেনে? একাই ডুবতাম লয়

—না রে তোকে ঠিক তুল্যে নিয়ে যাব

—উপ্ উপ্ নদীটা এমন হল্য কেন বটে? খেপ্যে গেল। উহ্ ফের ঝামট দিছ্যে

—রশিলা—আ...

—অ...

বুধন দেখিল বালিকা গড়াইয়া কিছু দূর ভাসিয়া গিয়াছে। পরিধেয়ের একপ্রান্ত তাহার কটিদেশে অপর প্রান্ত বুধনের হাতে। বলিতে লজ্জা বোধহয়—রশিলা উলঙ্গ। এই অবস্থায় বুধন পুনরায় চিৎকার করিল—

—রশিলা আ

—বুধন-ন

—সামাল। শাড়িটো শক্ত করয়্যে ধর। ছ্যেড়ে দিলে ভেস্যে যাবি। আমি তুকে টেন্যে নিছ্যি

বুধন হস্তধৃত শাড়ির প্রান্তে আবদ্ধ রশিলাকে টানিয়া রাখিয়া বহু চেষ্টায় গাঁইতিটি নোঙর স্বরূপ প্রস্তরের খাঁজে গাঁথিয়া দিল। অতঃপর বস্ত্রাঞ্চল সেই নোঙরে বাঁধিয়া ফেলিল এবং রজ্জুর ন্যায় তাহা আকর্ষণ করিয়া রশিলার নিকট উপনীত হইয়া তাহাকে স্বীয় দেহ লগ্ন করিল।

পাঠক, এই চিত্রটি আপনারা সংবাদপত্রে দেখিয়াছেন। অহো উলঙ্গ নারী। তখন পর্যন্ত জ্যান্ত। তখন পর্যন্ত স্রোতের তাড়নায় উপল ঘর্ষণে বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। কম্পিত দেহে কালতরঙ্গে পুরুষের বক্ষে অর্পিতা। দেখিলে আদি রিপু যদি জাগ্রত না-ই হইল তবে চিত্র কিসে? ক্যামেরা ম্যান চলৎচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বহু সংখ্যক চিত্র মধ্যে সে-কারণে একটি স্থিরিকৃত হইয়া পত্রস্থ হইয়াছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন ওই নারী ও পুরুষ আপনাদের দিকে চাহিয়া আছে। যথার্থই তন্মুহূর্তে তটবর্তী মুভি-ক্যামেরা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পুরুষ উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিল

—আমরা বেঁচ্যে যাব রে রশিলা। কেনেল কোম্পানির লোক এস্যে গেছে। উদেখ যন্তর নিয়ে। ইবার আমাদের তুল্যে নিবে। আর একটু থির যা... আর একটু...

মৃত্যুর মুখে লজ্জাবোধ থাকে না কিন্তু বাঁচিবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র শরম সঙ্কুচিতা নারী কহিল, মোকে আড়াল কর

কি প্রকারে কোন উপায়ে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে প্রশস্ত নদীবক্ষে যন্ত্র চক্ষুর অন্তরালে যাইবে, নারী? কির কির কট্‌ কট্‌ শব্দে তোমাদের প্রতিটি ভাবভঙ্গী অস্তিত্বের যন্ত্রণাময় প্রকাশ, প্রকৃতির নির্মম গ্রাস ক্রমাগত লিপিবদ্ধ হইতেছে। এই চিত্রাবলী কত অমূল্য, কত উত্তেজক, কত দুর্লভ, হায় তাহা যদি জানিতে। ইহার জন্য ক্যামেরা ম্যান বিশ্বের একটি প্রধান পুরস্কার নিশ্চিত লাভ করিবে। রশিলার নদীগর্ভে অবতরণের কারণ তো বুঝি। পেট ভরাইবার জন্য গুগলির সন্ধান। তাহা সে কল্য পরশ্ব বা তৎপূর্বে একই ভাবে করিয়াছে। তাহার সহিত হঠাৎ লকগেট খুলিয়া জল ছাড়া এবং ক্যামেরা ম্যানের সেই স্থানে আগমনের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহা কে বলিবে? তবে এরূপ যোগাযোগ অকল্পনীয় দুর্লভ। এবং সেই কারণেই এই চিত্রমালা মহার্ঘ্য।

স্থানটি বিরল জনবসতিসম্পন্ন। দূরে দূরে তিন-চারিটি কুটির। যুবক-যুবতীরা কর্মে চলিয়া গিয়াছে। আছে কেবল কয়েকটি শিশু ও বৃদ্ধ। সকলেই নদীতটে সমাগত। বিপন্ন স্বরে চিৎকার করা ছাড়া তাহাদের আর কোনও ক্ষমতো নাই। তাহাই করিতেছে। আর আছে একজন ক্যানেল গার্ড। জল ছাড়িলে তাহাকে তৎপর হইতে হয় যাহাতে কেহ নদীতে নামিতে না পারে। লকগেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সতর্কতা অবলম্বন করাই বিধি। আইন ভাঙিলে শাস্তি হইবেক। একজন প্রবীণা কর্তিত কলাগাছসহ নামিতে গিয়া লাঠির গুঁতা খাইয়াছে। শিশু, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদির জটলায় ক্রন্দন ও অভিশাপ বর্ষিত হইতেছে।

—অগো, লোক দুটা যে ডুব্যে মরছ্যে কিছু উপায় কর।

—হবে হবে

—আর কখন হবেক? উই দেখ ওরা লাট খাছ্যে

—রশিলা—আ—আ

—বুধন—ন—ন

এই ব্যাকুল ডাক প্রবাহের কলকল খলখল শব্দের ভিতর দিয়া বহুদূরবর্তী আত্মজনের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বলিয়া প্রতিভাত হইল। বন্ধনমুক্ত জলের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইয়াছে বটে কিন্তু জলস্তর ক্রমশ উচ্চ হইতেছে। ভিউ ফাউণ্ডারে ক্যামেরাম্যান দেখিল তরল গ্রাস বুধনের বক্ষ অতিক্রম করিয়াছে। রশিলার মুখমণ্ডলটুকু শুধু জাগিয়া আছে। সে এক হাত তুলিয়া ধরিয়া যেভাবে আন্দোলিত করিল ভাষায় তাহা বাঁচাও—বাঁচাও। কি দেখছ অত? ডুবতে লেগেছি যে। এখনো কি যন্তর ফিট করা হয় নি? কখন সাহায্য করবে? গাঁইতির নোঙরে বাঁধা শাড়ি ধরিয়া এইবার দুইজন ভাসন্ত। বড় ক্লান্ত ক্ষীণ গলায় রশিলা বলিল, আর যে ধর্‍্যে রা:খতে নারছি। হাত কালিয়ে যাছ্যে। কই উরা তো আমাদের তুলতে আসছ্যে না।

—আর একটু। তোর লেগেই বাবুরা এসেছ্যে। ই নদীর বাঁধ যিবার হল্য তোর পিসি মুন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে পিদিম জ্বেলেছিল। কত লোক। আহা

—হুঁ। কিন্তু উরা যে খুব দেরি কর‍্যে দিছ্যে। যদি মরি....

—না না রশিলা

—আর নারছি

—হেই রশিলা আর একটু

—জার লাগছ্যে। আন্দার দেখছি সব। তু বাঁচ মোকে ছেড়্যে দে

—না না রশিলা। দুজনে বাঁচব। আমি আর কখুনো হাড়িয়া....

ভাসমান শরীরগুলি তালে তালে আন্দোলিত হইতেছিল। ক্যামেরাম্যান ও তাহার সহকারী পালটা পালটি করিয়া ভিউ ফাউণ্ডারে এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উত্তেজিত ও মুগ্ধ হইতেছিল। জল জল তাহার উপর দেহ বল্লরীর আঁকাবাঁকা বিস্তার। কলকল্লোলে নটরাজের ডমরু ধ্বনি। তাহার তালে তালে জীবন মৃত্যুর দ্বৈত নৃত্য। সহকারী বলিল,

—আমার কলজে মুচড়ে দিচ্ছে দাদা

ক্যামেরাম্যান জবাব দিল, বাজার মেরে দেবে মাইরি। প্ল্যানটা আমার মাথায় গত বছরেই এসেছিল। কত করে ম্যানেজ করলান। আহা.....আহা.....

আহা একটি ঘূর্ণি। আদিতে নারীকে কেন্দ্র করিয়া পুরুষের আবর্তন তাহার পরে পুরুষের পশ্চাতে নারীর। দুইজনে ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে। যেন কালচক্র। প্রথমে ধীরে ধীরে অতঃপর প্রবল হইতে প্রবলতর। সহসা একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া গেল। তাহাতে তটবর্তী নির্বাক নিথর বালক-বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে দ্রুত আলো-ছায়ার সম্পাত। জলে শরীর দুইটি ক্রমে মুছিয়া গেল।

রশিলা ও বুধন অথবা উহাদের পিতা ও মাতা অথবা পিতামহী মাতামহীর সংসার যাপনের চিত্রকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও উপভোগ্য আকারে উপস্থাপন করিলে এই রূপই দাঁড়ায়। হে ভদ্র পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ.......

তিনকালের এক খিদে

কুমীরের মতো লেজে মাথায় সরু, পেট মোটা একখণ্ড মেঘ চাঁদটাকে অনেকক্ষণ তাড়া করে কী কারণে যেন ছেড়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ঠিক তখনই মাথা খারাপ করা জোছনায় রতন ওর বউ বীণাকে খপ করে ধরল, আঃ, ছাড়ো ছাড়ো। রাজ্যের কাজ পরে আছে। তোমার আর কী। খেলাম আর শুলাম। শোনো, তোমার মাকে কাল প্রাণভরে জিলিপি খাইয়ো।

—মা কি খেতে চেয়েছে?

—না।

—দিলেও খায় না। তবে তোমার মন যখন চেয়েছে এনে দেব। মা পালটা আমাদের খাইয়ে দেবে। চিরকাল তাই দেখে এসেছি। খেয়ে নয়, খাওয়া দেখে ওর সুখ। সবচেয়ে ছোট মাছের টুকরোটা মার। দশটা পরোটা হলে বাবার পাঁচটা আমার চারটা মার একটা। দেখে দেখে আমাদের এমন সয়ে গেছে যে কিছুই মনে হয় না।

—তাইতো জানতাম। আজ নীচের তলার পলাদি ডেকে বললেন, মাসিমাকে তোমরা পেট ভরে খেতে দিয়ো। রোজ বিকেলে জলখাবারের সময় হাজির হন। কচুড়ি ভেজেছিস নাকি? বেশ গন্ধ ছেড়েছে। সঙ্গে বুঝি আলুরদম? বেশ গরম গরম খেতে যা লাগে। তখন কি না দিয়ে পারা যায়। আজ খুব খারাপ লেগেছে। গোনা গাঁথা জিলিপি। ভাগে কুলাল না। তাইতে উনি শুনিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দেখিয়ে খেলি। পেট ছুটবে।

রতন তখনই মার কাছে যাচ্ছিল। বীণা চোখ পাকিয়ে বলল, এখন না। তোমার কি আক্কেল জ্ঞান নেই? ঠিক ধরে ফেলবে পলাদি নালিশ করেছে।

রতনের মনটা তেত হয়ে গেল। যেন মোহনবাগান এরিয়েন্সের কাছে দশ গোল খেয়েছে। পর দিন ও সত্যি সত্যি মাকে জিলিপি এনে পেট ভরে খাওয়ালো। বুড়ি খুব খুশী। বলল, আহা বাছা, সেই ছোটবেলায় আমার বাবা রামকেলীর মেলায় এমন খাইয়েছিল, আর এ বয়সে তুই খাওয়ালি। কিছু ভোগ বাকি থেকে গেছে। পূরণ না হলে মরণ নেই। রতন এবার ঢোক গিলে গলা নামিয়ে বলল, মা, তোমার যা খেতে ইচ্ছে হয় বীণাকে বলবে। আমি এনে দেব অন্য কারো কাছে যাওয়ার দরকার নেই।

দাঁত না থাকলে লোকে মস্ত হাঁ করে অর্গলহীন হাসতে পারে। বুড়ি ফোকলা হাসিতে বড় সুন্দর হয়ে উঠল। রতন অনেক দিন পর মাকে ভাল করে দেখল। বড্ড রোগা হয়ে গেছে আর ফ্যাকাশে। স্তন দুটি শুকনো খেজুরের মতো কুঁচকে ছোট হয়ে যাওয়া। এই সেই অমৃতের কলস। তবে চোখের চারপাশে কাজলের

মতো কালসিটে দৃষ্টিকে বড় মমতাময় করেছে।

মার ঘর থেকে বেরুতে বীণা ওকে রান্না ঘরের দরজায় ধরল। হাতে জিভের মতো চ্যাটালো তপ্ত খুন্তি, বলল, কী একটু কড়া করেই বলেছ তো যে লোভিষ্টির মতো উনি যেন এ ঘর সে-ঘর না যান। লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

খেতে দিলে যাবে না। ঠিকমতো তাই দিয়ো। আগে নিজেদের ত্রুটি সামলে তারপর আমার মা সম্পর্কে বললে মানায়।

বীণা ঝাঁঝিয়ে উঠল, ওঃ তাই বল। আমি ভাবি ফিস ফিস করে দুজনে এত কী কথা। আমার নামে বুঝি চুকলি কাটল যে ঠিকমতো খেতে দেই না।

রতন সমান তেতে জবাব দিল, তোমার সঙ্গে যখন রাতে ফিস ফিস করে কথা হয় তখন কি মা শোবার ঘরে কান পাততে আসে? সেইরকম মা, ছেলের কথার মধ্যে তোমার নাক গলাবার কী আছে? যা বললাম তাই কর। বুড়ি হয়েছে এমনিতে মরবে। তার আগে না খাইয়ে মেরে ফেলনা।

রতন এই ভাবটা নিয়ে বাজারে গেল এবং বড়সড় একটা রুই কিনে ফেলল। আর বীণা মাছ কেটে লাউয়ের চাকলার পাতলা একটা টুকরো স্বামীকে অফিসের ভাতের সঙ্গে দিয়ে দুপুরে শাশুড়ির পাতে আস্ত মুড়োটা ধরে দিল। বুড়ি খুব বিব্রত হয়ে সেই ফেলে আসা দিনগুলির মতো বলল, আহা বীণা এইটে তুমি রতনকে দিলেই পারতে। খাটেপিটে রোজগার করে, ওর দরকার। নয়তো পাপাইকে। বাচ্চা বয়স। মুড়ো খেলে মাথা খোলে। আমার মা বা আমি তো তাই করতাম। কবে আবার এমন একটা জিনিস মেয়েমানুষ হয়ে চেখে দেখেছি। আহা মাছের চোখ দুটো দেখ। অবাক হয়ে চেয়ে আছে। পলক পড়ছে না। মোরে খাবি? তবে এই ঠোঁটে আগে চুমুদে।

এক হাতে পারল না। রতনের স্নেহময়ী চির দুঃখী জননী সত্যি সত্যি দু-মুঠোয় জাপটে রুইয়ের ঠোঁটে কামড় দিয়ে সুপ্ সুপ্ করে রস টানতে থাকল। দাঁত নেইতো অতবড় মুড়ো খাওয়া কি সহজ কথা। চোখ ঠিকরে নাকের পাটা ফুলে উঠছে আর মাড়ি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কস বেয়ে রক্তের রেখা। বীণা শাশুড়ির গলায় অস্পষ্ট গরগর শব্দ পেল। বেড়াল-ইঁদুর ধরলে যেমন করে। ওর কেমন আতঙ্ক হল। প্রেতের মতো দেখাচ্ছে। কোথায় লুকিয়ে ছিল আকাঙ্ক্ষার এই প্রচণ্ডতা। ভেবে ছিল বুড়ি জব্দ হবে। পারবে না? কিন্তু এবার ওর নিজের বেকুব হওয়ার পালা . একবার করুণভাবে বলল,মা থাক। কথাটা কানেই তুলল না। আঁচড়ে-কামড়ে-ছিঁড়ে-চুষে দুহাতে জাপটে রসে- রঙে বুক ভাসিয়ে বুড়ি জীবন ভোগ করছেন। হাতে সময় বড় কম। খেতে খেতে জানালায় আলো তেজ হারিয়ে গোধূলি বিসাদ হচ্ছে। বীণা উঠে গিয়ে বেসিনে চোখে মুখে জল ছিটালো। কান্না পাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ভয়। জায়া ও জননীকে সংসারের নিত্য চলন অব্যাহত রাখতে কিছু কৃচ্ছ্রতা কিছু ত্যাগ মেনে নিতে হয়। সবই কি জমতে জমতে ভারী হয়ে এভাবে ধ্বস নামায়?

রতন ফিরে এসে সোজা মার ঘরে গেল। —মাছ খেয়েছ? মানে খেতে কোনও

অরুচি হয়নি তো?

—খুব ভাল খেয়েছি বাবা। সেই বিধবা হয়ে নয় বছর পর খেলাম। বাজারে পাকা রুই দেখলে ওর মাথা ঠিক থাকত না। পকেট ঝেড়ে কিনে ফেলত। সেবার হাতের চেটোর মতো ইয়া এক একটা পেটি আর গাদা। বলল, গাদাগুলি কালিয়া, পেটিগুলি ভাজা। মাছ ভাজার বাস দুর্গাপুজোর ধুনোর গন্ধের চেয়ে আমার বেশি ভাল লাগে। এরমধ্যে তোর পিসতুতো দিদি যমুনা ছেলেপুলে নিয়ে বালুরঘাট থেকে হাজির। সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে ওমা নিজের জন্য এক টুকরাও রইল না। ভাবলাম আবার একদিন আনলে খাব। হল না। সে বছরই লোকটা চলে গেল। তারপর আর মাছই খাইনি। তুই বলে-কয়ে....

—তোমাকে তো বলেছি আজকাল সবাই খায়। এমনকি থান ছেড়ে শাড়ি পড়ছে। গয়নাগাটিও চলে। তোমার আর কতটুকু চাহিদা? যা মন চায় বলবে। এ কি ঠোঁট ফুলল কি করে?

—ওই পিঁপড়ে-টিপড়ে কিছুতে কামড়েছে। বীণা স্বামীকে এ ঘরে ঢুকতে দেখে পর্দার আড়ালে কান পেতে ছিল। শেষ কথাটায় আত্মপ্রকাশ করে বলল, মিছে কথা কেন বলছেন মা?

—আহা, আমি কি দেখেছি কিসে কামড় দিল? আমার তো আর পুরুষ নেই যে সে কারণ হবে? তোমার হতে পারে। পিঁপড়ে ছাড়া কে আর ঠোঁট কামড়াবে। উনি ছিলেন ওষুধ কোম্পানির এজেন্ট। ছ'মাস ন'মাস বাইরে বাইরে। ছেলে নিয়ে বাড়িতে একা বাস। যা হাতে দিয়ে যেত তাই দিয়ে টেনেটুনে লোকটা না ফেরা পর্যন্ত সংসার চালাতাম।

বীণা এবং রতন হতভম্ব হয়ে গেল। এ ধরনের কথা মা বলতে পারে ভাবাই যায় না। রতন হঠাৎ খেপে গিয়ে বীণাকে ধমক দিল, গুরুজনের সামনে অসভ্য কথা তুলতে তোমার লজ্জা করে না?

—আমি তুলেছি? বলার মধ্যে বলেছি ওটা মিছে কথা। যা খাওয়ার ক্ষমতো নেই তা খেতে গেলে অমন হয়।

বুড়ি এক গাল হেসে বলল, না না, চমৎকার খেয়েছি দারুণ রান্না। কত যত্ন করে খাওয়ালে তা কি আমি ছেলের কাছে মিছে বলব? তোমরা ভাল থাক। বড় লক্ষ্মী বউ। ও রতন কাছে রাখবি আর যত্ন করবি। সংসারে মেয়েমানুষ এমনিতেই অসুখী। তা বাছা আর বিশ দিন পর পুজো। এবার আমাকে গরদের কাপড় দিস। তবে শাড়ি নয়, থান। একটা গরদের বড় সখ ছিল। কথাটা তখন তুই তুললি তাই মনে পড়ে গেল।

এই ঘটনার পর বীনা দুদিন গুম হয়ে থাকল। ও বড় জেদী। কথা বন্ধ করলে অন্তত তিনটি সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। পাঁচ বছরের পাপাইকে বলে তোর বাবাকে স্নান করতে বল, কি লবন ফুরিয়েছে, দোকান থেকে যেন এক প্যাকেট ও বেলা

এনে রাখে।

সে সন্ধ্যায় শোবার ঘরের জানালা বরাবর শরতের আকাশে দুনিয়ার সাহানসাহের সীলমোহরের মতো শুকতারা। এমন রাত নারীপুরুষের একাকার হওয়ার অধিকারের অসম্ভব পুরানো দলিল। রতন চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পেছন থেকে বউকে জাপটে ধরল। অন্যবারের মতো বীণা ডানা ঝাপটালো না। জলভরা চোখ ফিরিয়ে বলল, আমার খুব ভয় করছে। বরাবরের রীত ভেঙে মা যেন কেমন হয়ে গেল হঠাৎ। ওগো, তুমি আমাদের জন্য ভেবে না। বোনাসের টাকাটা দিয়ে মাকে ভাল একটা গরদ দাও।

রতন বলল, ভেবেছিলাম খুব অল্প চাহিদা সহজেই পূরণ করা যায়। কিন্তু না এখন দেখছি রানীর মতো সখ-আহ্লাদ মধ্যবিত্ত সংসারের বুকে গোপন হয়ে থাকে। এত কি আমার বেতনের টাকায় কুলোয়? আজ আবার জানাল, বক্রেশ্বরের উষ্ণ কুন্ডের জলে স্নান করে মোহন প্যাড়া খাবে। ওকে নিতে গেলে তো ট্যাক্সি রিজার্ভ করতে হয়। দু'হাজারের কমে হবে না।

—তাই নিয়ে যাও। শেষ কটা দিনের সাধ। এত খাচ্ছে কিন্তু চেহারা দেখছ? পেটটা মোটা, মরা ডালপালার মতো হাত-পা। তুমি অনেক কিছু দেখেও দেখো না। ছেলের কাছে দাবী থাকে। আমার জন্য তুমি যা পারনা তাকি পাপাই পূরণ করবে না?

একটার-পর-একটা দাবি ওঠে আর রতন তা মেটাতে জেরবার হয়। বীণার সন্দেহ হয় বাচ্চা ভোলাবার মতো স্বামী এরমধ্যে কিছু কিছু ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। যেমন দানেশ ইব্রাহিমের দোকন থেকে বারশ টাকা ভরির কস্তুরি এনে ঘরের গন্ধ দূর করতে বলায় ও কল্পনাথ স্টোর্স থেকে আটচল্লিশ টাকার সিনথেটিক কস্তুরি সেন্ট এনে দিল। মা এসব চালাকি ধরতে পারে না। তার পরের দাবিটা হাসি মুখে তখনই জানিয়ে দেয়। বক্রেশ্বরের ব্যাপারটাও ঝুলে আছে। ওখানে নাকি দারুণ বন্যা। বীণা একটু রাগ করে বলে, বক্রেশ্বরে বন্যা? এই শরৎ কালে? কোন কাগজে দেখলে?

রতন হেসে বলে, যাব যাব। এই পুজোর পরে। এখন একটু হাতটান আছে।

পৃথিবীর গর্ভের আগুনে তাতানো জলে মার আর স্নান করে মোহন প্যাড়া খাওয়া হল না। এক সন্ধ্যায় মিহিম বৃষ্টি। বুড়ি জেদ ধরলো মাগুরমাছের ঝোল নইলে ভাত খাবে না। অফিস থেকে ফিরে ছেলে বলল, ঠিক আছে এনে দিচ্ছি। ছ'কিলোমিটার দূরে অমৃতির হাট। এখানকার কোনও বাজারে মাগুর পাব না। গাঁয়ে-গঞ্জে ওসব মাছ ওঠে। কিন্তু গেল আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। বীণা ব্যাগ ঝেড়ে দেখে লম্বা একটা সামুদ্রিক মাছ।

—একি করলে? মাগুর কোথায়?

—এইতো মাগুর। সংস্কৃতে একটা কথার প্যাঁচ আছে, মৎগুরু মৎগুর প্রিয়। অর্থাৎ

আমার গুরু মাগুর ভাল বাসেন।

—কোন কথায় কি কথা বললে। এ মাছের নাম কি?

—কোনও ল্যাটিন নাম নিশ্চয় আছে। তবে মকর বলে চলে। রান্নার প্যাঁচে মাগুর হতে বাধা কি?

তা মাগুরের মতো রান্না করল বীণা। খুশী হয়ে পাতে বসে শাশুড়ি কিছুটা খুঁটে খেয়ে বাটি ঠেলে দিল।

—কি হল মা?

—কি খাওয়ালে আমাকে? অ্যাঁ? মাগুর বলে জল-ঢোঁরা?

—না মা সমুদ্রের মাগুর

—মাগুরের আঁশ থাকে? এই দেখ মাছটার মিহি আঁশ।

এত যত্নে আঁশ ছাড়িয়েছে তবু কিছু থেকে গেছে। বুড়ি ধরে ফেলছে। চোখ লাল করে বলল, আমাকে সাপ খাওয়ালে? তারপর থেকে বমি। যা খায় তাই কিছু পরে ওলোট দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ডাক্তার বললেন, ঘেন্না টেন্না নয় রোগের শেষ ধাপের লক্ষণ। তার আগে এনিমিয়ার খিদে থাকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেল ইসোফেগাসের কার্সিনোমা। এ বয়সে সার্জারি করা যাবে না।

মরার রাতে বলল, বীণা আমার বড্ড খিদে। তিনদিন কিছু খাইনি। না খেলে ভোগ শেষ হবে না। আলু সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত চটকে দাও।

বউটা শাশুড়ির মাথা যত্নে বুকে নিয়ে শেষ গ্রাস মুখে তুলে দিয়েছিল।

জল, বিন্দী ও পাখিদের ভাষা

ধেড়ে ইঁদুর গশ ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়েছে। একটা উঁই ঢিবিকে সাত পাক দিতে হবে। মাত্র আড়াই হয়েছে। এমন সময় লম্বা ঘাসের ডগায় চড়ে কুমারী ফড়িংকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। গশ টুপি খুলে বাও করে বলল, গুড মর্ণিং। কুমারী ফড়িং যেন কানেই তুলল না। আপন মনে গাইতে থাকে, এই দুনিয়া ঘোরে বনবন বনবন। গশ টুপিটা আবার মাথায় ঠিকঠাক করে বলল, যাচ্চলে। তারপর কেমন সন্দেহ হল। ঘাস অল্প অল্প এগিয়ে আসছে কেন? ঘাসের কি পা আছে? আড়াই পাক দেওয়ার সময়তো ঢিবির ওপাশে কিছু ছিল না। থমকে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে, ওরে বাবারে বলে টুপি-লাঠি ফেলে দৌড়। ততক্ষণে একটা মাথা জেগে উঠেছে। ম্যাও মশাই। গোঁফের ডগায় ফড়িং। মডেল সুন্দরী। বেড়ালের ববসাপত্তরকে কেমন সুন্দর চেহারা দিয়ে ফেলেছে। এরপর শিকারী ও শিকারের ফ্যাস ফাঁস ও চিঁচিঁ আওয়াজ করতে হবে। ছোটাছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাছের চড়া, দূরের চাপা স্বরে। অথচ বিন্দী যেন আর পেরে উঠছিল না। ঠোঁট যথেষ্ট ছুঁচল করে চিক চিক করল কয়েকবার। অত্যন্ত কষ্টে। কান এমন গরম হয়ে উঠেছে যেন কেউ টেনে লম্বা করে দিয়েছে। চেষ্টা করতে করতে এক সময় থেমে গেল। আবছা অন্ধকারের ভেতর শব্দ উঠল, কাট। সাউন্ড স্টপ। তারপর আলো জ্বলে উঠলে মস্ত গোঁফ নিয়ে পরিচালক ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, কি হল বিন্দী? চল্লিশ বছরের অসম্ভব কালো চোয়াল উঁচু মেয়েটা অস্পষ্ট আওয়াজে কিছু বলতে চাইল। কথা ফুটল না। গলা দেখিয়ে দিল। এই হল শেষ। এই হল শুরু।

বিন্দী এক্সট্রা। তাও আবার কার্টুন ছবির নেপথ্য কণ্ঠ। চেহারা খাবাপ কিন্তু গলাটা দারুণ। গত কুড়ি বছর ধরে ভেড়া, বাঘ, খরগোশ, শেয়াল, কাচ্চা-বাচ্চা এমনকি প্রেমিকার সংলাপও দিয়েছে। শেষ হয়ে গেল ইঁদুরের ভয়ার্ত স্বরে ওর নেপথ্য ভূমিকা। প্রকাশে শুরু হল বুড়িমার বকবকানি, কিরে বিন্দী, অসময়ে ফিরে দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়লি? অ্যাঁ? সাড়া-শব্দ দিচ্ছিস না কেন? চুরি করে আচার খাচ্ছিস নাকি যে চুকচুক করে শব্দ হচ্ছে? এত যন্ত্রণার মধ্যেও বিন্দীর হাসি পেল। মা বুঝি তাই আশা করে নিজের হাতে মুলোর আচার বানিয়ে ঠিক ওর ঘরের তাকে সেই কবে রেখে গেছে। ছোটবেলায় পছন্দ করত। আর কি ওই বয়স আছে? গলার যন্ত্রণাটা ঢোঁকে ঢোঁকে গিলে ফেলার চেষ্টা করে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মা মিনিট খানেক ওর মুখের দিকে চেয়ে কী ভাবল কে জানে। পাশের ফ্ল্যাটে প্রৌঢ় বিপত্নীক নিত্য নাইট ডিউটি দেওয়া কৃষ্ণকান্ত আইয়ারকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে এনে

বলল, তুমি আমার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। কার কাছে আর যাব? দেখ অবলা মেয়েটার' এমন কিছু হয়েছে যাতে ওর চেহারাই পালটে গেছে। ও বিন্দী, খুলে বল কি হয়েছে।

বিন্দী নীরবে জিজ্ঞাসু কৃষ্ণকান্তের চোখে চোখে চাইল। রূপ নাই তাই কোন পুরুষের দিকে অসম্ভব সরলভাবে তাকাতে পারে। লোকটা কিন্তু মাথা নিচু করল। জরিবুটির ঘ্রাণে যেমন সাপ ফণা নামায়। ইতস্তত করে বলল, থাক বুড়ি আম্মা। মেয়েরা যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না তা না শোনাই ভাল।

ওসব কিছু ভেবো না বাছা। মেয়ে আমার খুব খোলামেলা। গোপন কিছুই নেই। কি রে বিন্দী কেউ তোর গায়ে হাত দেয়নি তো?

কৃষ্ণকান্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, ছেড়ে দিন ওসব কথা। এ শহরটা পাপের আর দাপের। কু-লোকের অভাব নেই। বিশেষ করে বিন্দী ফিলিমষ্টার।

হায় ষ্টার। কাজ থাকলে জোটে। নইলে ষ্টুডিওতে রোজ রোজ ধরনা দেওয়া। গড়ে মাসে তিন হাজার জুটলেই যথেষ্ট। তাই দিয়ে ফ্ল্যাটের ভাড়া, ডাক্তার, ওষুধ যাতায়াতের খরচ, পোশাক-আশাক, মন্দিরের পুজো আর মাঝে মধ্যে সিনেমা। কে আর গায়ে হাত দেবে? আজও কুমারী। হাত দিলে বোঝা যেত কিছু দেওয়ার মতো ওর আছে। অথচ মা এরকম সম্ভাবনার কথা সকলের সামনে বলার চেষ্টা করে। যেন আর পাঁচটা যুবতীর সমান ওর দাম। ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে একমাত্র রোজগেরে মেয়েটা হাত ছাড়া হয়। কৃষ্ণকান্ত চলে যাচ্ছিল ওর এই কষ্টের কথা কাউকে তো কিছু বলতেই হবে। গলায় হাত দিয়ে আদ্ভুত একটা আওয়াজ করল। মা হা হা করে, কিরে তোর কি হয়েছে। আহা হাঁসের মতো গলা কোনও পাযন্ড মুচড়ে দিয়েছে? দেখ কৃষ্ণকান্ত কি সর্বনাশ!

লোকটা দরজা থেকে ফিরে এসে বিন্দীর কপাল আলতো ছুঁয়ে বলল, গা গরম। জ্বর হয়েছে! তোমার কোথায় কষ্ট?

—ও বিন্দী তোর কি অসুখ?

—ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

—মেয়ে আমার খুব সৎ গো। ধর্মের পথে থেকে রোজগার করে। কাল সকালেও বাথরুমে ঢুকে দুই ময়নার কিচিমিচি ঝটপটি অভ্যাস করছিল। তখন মনে হল দুটো পাখির মধ্যে একটা কাঁদছে। ওদের কান্না যেমন হয়। আহা ওর গলায় সেই দুঃখ এমন করে ফুটে ওঠে যে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। চেহারাটা ভাল ছিল। বিন্দী আমার মতো হলে নির্ঘাৎ হিরোইন। ওর বাবা ঠিক উলটো। হনুমানের মতো মুখ পোড়া। ট্রাক চালাতো। সেই যে সেবার অনেক লোক মরল না বিষ মদ খেয়ে? ওর দম বেরিয়ে গেল মাত্র তিনবার বমি করে। যারা এমন পাপের ব্যবসা করে তাদের এই শহরে কিছু হয় না। মন্ত্রী এসে তাদের নতুন আইসক্রিম কারখানার ফিতা কাটে। আমাদের হয়। মর্গ থেকে লাশ ছাড়াতে। ওরা

বলেছিল ক্ষতি পূরণের টাকা পাওয়া যাবে। তা কত ছোটাছুটি করে শেষে জানলাম মরা লোকটির নামে লেখা আছে। টাকা নিতে হয়তো সে গিয়ে সই করে নিক। আহা সে দিনগুলি দুটো পাখির দুঃখের দিন, খিদে, ভাঙা ঘর আর বদমাসদের ছোঁক ছোঁক করা কাল। সেই থেকে আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। আমার মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাও তো যাও। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার।

কৃষ্ণকান্ত বলল, আমার কি দরকার। ডেকে এনেছেন তাই এসেছি। ওই তো রাস্তার ওপাশে ই. এন. টি ডাক্তার। বিন্দী একাই যাক।

—কথা বলতে পারলে তাই যেত। তোমাকে আর দরকার হত না কৃষ্ণকান্ত। কিন্তু ও যে ডাক্তারকে কিছুই বলতে পারবে না।

কৃষ্ণকান্ত বুড়ির কথায় চটেছে। না করে দেওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু বিন্দী কেমন করে তাকাল। কাজেই বলল, ঠিক আছে। আজ কি বার? শুক্র। শনি, রবি তারপর সোম। যদিও সে দিন আমার অফ-ডে কিন্তু কোথাও যাই না। ঘরে দরজা দিয়ে মদ খাই। অন্য দিন এক ফোটা ছুঁই না। কারণ সোমবার আমার বউ মরার দিন। এখন অবশ্য শোকটোক হয় না। তবে অভ্যাস। আজ যদি সোমবার হত, বুড়ি আম্মা, স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, কিছুতেই যেতাম না। চল বিন্দী। তোমার ফুলকাটা আকাশী রঙের কামিজ পরে নিতে পার। ডাক্তারকে বলতে হবে তো এ হচ্ছে সিনেমাষ্টার। যত্ন করে দেখুন।

তা ডাক্তার যোসেফ গলার ভেতর নল ঢুকিয়ে দেখলেন। বললেন, যত দূর বিশ্বাস ওর কোনও রোগ নাই। তবে পেসেন্টকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি আধুনিক সমস্ত পরীক্ষাই করাতে চাই। লিখে দিলাম। এই সব রিপোর্ট নিয়ে দুদিন পরে আসুন। চিন্তার কারণ নেই। ক্যানসার নয়।

দেখা গেল, ডাক্তারের পয়লা আন্দাজটাই আখিরে ঠিক। রিপোর্টেও কিছু পাওয়া যায় নি। কৃষ্ণকান্ত বিন্দীকে বলল, যাক নিশ্চিন্ত। শুনে ডাক্তার ধমক দিলেন, নিশ্চিন্ত মানে? কিছু না পাওয়াটাই তো চিন্তার। ওষুধপত্তর দেওয়া যায় না। এই ধরনের রুগী চিকিৎসার বাইরে।

শুনে বিন্দীর মনের ভেতরটা হুহু করে উঠল। মেরিন ড্রাইভের রাতের মতো শূন্য। শুধু হাহাকার হাওয়া। উড়ন দুপাট্টা মেঘ। পা ছাপ ছাপ বালি। তাতে বৃষ্টির জলে একটা করে জাগন্ত তারা ফুটে থাকা। তেমনি করে কুড়ি বছরের ফাঁকা হয়ে গেছে ও। গলার স্বর যদি নাই ফেরে তবে?

কৃষ্ণকান্ত বলল, ডাক্তার সাব, কিছু একটা তো নিশ্চয় হয়েছে। না হলে গলার আওয়াজ এমন হঠাৎ হারিয়ে যায়। এ কিন্তু একজন ফিল্মস্টার।

ডাক্তার যোসেফ চমকে উঠলেন, অ্যাঁ? কি বললেন? সিনেমা করেন? কোন কোন বইতে? বলবেন কি করে। তাও তো বটে। বিনা কারণে বোবা হয়েছেন হয়ত একটা বোমা মেয়ের অভিনয় করতে করতে সেটাই পাকাপাকি হয়ে গেছে। আমার

আবার মানুষের নাম মনে থাকে না। তাদের রোগের নাম দিয়ে চিনি। একেবারে ভেতরের 'গলদগুলি আমার কাছে কারো পরিচয়। আর ছবিতে ঠিক উলটো। খুঁত ঢাকা মেকআপে এক একটা চরিত্র। কে বলবে এটাই আপনার আসল চেহারা?

বিন্দীর ভেতরে ভেতরে খুব রাগ হল। ডাক্তারি করছেন তো প্রেসক্রিপশন লিখুন আর ফি নিন। মেকআপের রূপ ধুয়ে আটপৌরে চেহারা আরও ভেতরে অসুখী মানুষটা ধরার জন্য যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে আছেন তো তাই করুন। ছবিতে আমার কোনও চেহারাই থাকে না। ওখানে আমি শুধু শব্দ। আড়ালে থাকি। কে আমাকে চিনবে? কি দিয়ে মনে রাখবে।

ভোর ভোর মার গলা, ও বিন্দী ওঠ ওঠ। তারপর থেকে শুধু শব্দ। চায়ের জল ফোটার সোঁ সোঁ, ডিম সেদ্ধর বগবগ। কাপ, ডিস, চামচের টুংটাং, স্নানের ঝর ঝর, রান্নার ছ্যাঁক ছ্যাঁক, তারপর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ছুটতে ছুটতে স্কাই স্ক্র্যাপারের প্রত্যেক তলার আলাদা গানের আওয়াজ, নীচে অন্ধ ভিখারীর রামধুন। সব আমি ধরি। আমার কাছে এ শহর মানে মিছিল আর টাকা গোনার শব্দ। ভালবাসার ফিস ফিস ডানা ঝটপট আমি চিনি কিন্তু কাকে চেনাব? রোজ রোজ ছুটতে ছুটতে ষ্টুডিওতে গিয়ে দেখি আরও কত এক্সট্রা টোক ধরে বসে আছে। একটু দেরি হলে কেড়ে নেবে। আমি নায়িকা নই। মিছে কথা ডাক্তার। অদ্ভুত জোছনায় ঝর্ণার জলের ঘায়ে বাজতে থাকা পাথরে পাথরে পা পেলে কোনও নায়কের বুকের কাছে ঘন হই না। মিছে কথা ডাক্তার। আমি শুধু কাজের মেয়ে। ঘামে জলে ডিটারজেন্টে রান্নার তাপে কোনও মেকআপ নিজে থেকেই টেপে না। বাসি বিছানায় বাসি স্বপ্নের মেকআপ লেগে থাকে না। বাসি মানেই তো উপবাসী। এই লোকটা আমার কেউ নয়। কোনও কৌটায় আমার রূপ লুকানো থাকে না। নেই। আলবাৎ নেই।

দুম করে টেবিলে একটা থাপ্পরের শব্দে ডাক্তার চমকে উঠলেন, এখানে যেমন খুশি হাত-পা ছোঁড়া যায় না। বুঝলেন? ইমোশন দুর করার জন্য এই একটা ট্যাবলেট লিখে দিলাম। ওতে ব্যথাও কমবে। ইমোশনই ব্যথা। যান।

কৃষ্ণকান্ত ব্যথিত চোখে বিন্দীর দিকে চাইল, কোনও অসুখ নেই তো কথা বলছ না কেন?

বাইরে বেরিয়ে ওর দিকে বাঁকা গলা তুলে বিন্দী রুমালে একটা গিঁট দিল। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে বলল, বুঝলাম গলায় নাড়িতে নাড়িতে পিঠ পড়ে গেছে। এখন আর কোনও ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায়? বিন্দী কোলের কাছে হাত দুটো আড়াআড়ি করে রাখল। আচ্ছা এটাও বুঝলাম। কোলের কাছে যাওয়া দরকার। তার মানে মার কাছে সান্ত্বনার জন্য। তাই যাও। আমি চলি তাহলে? বিন্দী ওর পাশে এসে পায়ে পা ঘসল। ঠিক আছে ঠিক আছে। সঙ্গে এসেছি একসঙ্গে ফিরব। আমি তোমার না বলা কথা বেশ তো বুঝতে পারছি। বরং মুখ ফুটে যখন বলতে তখন কিছু বুঝিনি।

অনেকদিন অনেকদিন পর মা ওকে দরজার কাছ থেকে বুকে সাপটে ঘরে নিয়ে গেল। কৃষ্ণকান্ত ইতস্তত করছিল। তারপর মনে পড়ল বিন্দীতো ডাক্তারের কথা বলতে পারবে না। কাজেই দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। সুযোগ মতো মাথা নেড়ে জানায়, কিছু হয় নি বুড়ি আম্মা।

মা চোখ মুছে বলল, অকারণে কথা বন্ধ হয়? তা হলে কি অভিমান! সোনা আমার আঁধারঘরের চাঁদ। তাই যদি হয় তো আয় ঝগড়া করি। ওরে পোড়ামুখী পেটের শত্তুর এইভাবে শাস্তি দিতে চাও? এই যে তোর বর জুটল না সে কি আমার জন্য না কি? তোর বাপ যে দিব্যি আমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে চলে গেছে তার কিছু করার ছিল না? কী জবাব দে। দিবি না? তারই তো মেয়ে তুই। বদ রক্তের ধারা যাবে কোথায়? এবার কি হবে? কথা বন্ধ হলে আর কাজ জুটবে?

কৃষ্ণকান্ত বলল, এসব কথা এখন কেন বুড়ি আম্মা? বিপদে মাথা ঠান্ডা করে উপায় ভাবতে হবে। ওর কষ্টটা একবার বুঝুন।

মা ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার কষ্টটা কে বুঝতে যাচ্ছে? মার চেয়ে তোমার দরদ বেশি দেখছি যে। তাও বলি কৃষ্ণকান্ত, ফল হোক না হোক তুমি ডাক্তার দেখিয়ে এনেছ। সেই সুবাদে মা-মেয়ের মাঝখানে মাথা গলাতে যেয়ো না।

কৃষ্ণকান্ত খুব অপমান বোধ করল, তা বটে। কাজের বেলা কাজী কাজ ফুরালে পাজি। খবরদার বলে রাখছি, বিপদে পড়ে হুটহাট ডাকতে যাবেন না। আমি আপনাদের কে?

চলে যাওয়ার সময় বিন্দীর চোখে চোখ পড়ল। এই যে চোয়াল উঁচু, কালো শীর্ণ গড়ন তার কোথাও মন ভোলবার মতো কিছু নেই। রঙ নেই বলেই চোট খাওয়ার দাগগুলি স্পষ্ট। পুরানো আসবাবে যেমন হয়। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। কি আশ্চর্য কৃষ্ণকান্ত আবার ওর শব্দহীন ভাষা বুঝে ফেলল। বুড়ি মানুষটার কথায় রাগ করো না। এক বলতে আর এক বলে ফেলে। মার হয়ে মাফ চাইছি। কৃষ্ণকান্ত স্পষ্ট করে জবাব দিল, বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াতে চেয়েছি তাতে কেউ ভাল না বলুক মন্দ বলবে কেন? যথেষ্ট পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।

ও চলে গেলে বিন্দী চান ঘরে ঢুকল। চোখে ঝাপটা মুখে জল নিয়ে গার্গলের শব্দ করার চেষ্টা করল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের কান্নার শব্দহীন ছবি দেখল। বেশ কিছুক্ষণ। দরজায় প্রথমে আস্তে টোকা পড়ল—বিন্দী ও বিন্দী। শেষে জোরে জোরে ধাক্কা—কিরে কি করছিস ভেতরে? জলের শব্দ নেই, চলাফেরা নেই। আমার হয়েছে জ্বালা। চা যে জুড়িয়ে গেল। এই খোল বিন্দী, মা আমার দরজা খোল। মেয়েটা ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে বাইরে এলো। মা ভয় পেয়েছে।

রোজ ফিরে এসে ওই তো রাতের রান্না করে খেতে দেয়। বহুদিন পর মা ওকে বিশ্রাম দিয়েছে। এখন ও কাজের বয়স থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেবেলায় ফিরতে পারে। অথচ তাতে কোনও সুখ নেই। কেন না ভবিষ্যৎ নেই। সামনে উপার্জনহীন

সময়। বাবা মারা যাওয়ার পর মা পরচুলা বানাতো। ভারুচেশ্বর তীর্থম থেকে দেবতার নামে মাথা মুড়ানো চুল সের দরে কিনে এনে। মেয়েদের লম্বা চুলের দাম বেশি। তা দিয়ে ভীমের গোঁফ ও দ্রৌপদীর এলোকেশ সবই হয়। মা বলত ঢেউ খেলানো চুলে মুখ ঢেকে মেয়েরা সবচেয়ে বড় ছলনা করে। কিন্তু কেন? সেই তো ঘর-বর রুটির জন্য। কিন্তু ও এত কুৎসিত যে ছলাকলা করতে গিয়ে ছেলেবেলায় খেলার সাথী বাসুদেব ওর বুকে টেবিলের মশলাদানি উপুড় করে বলেছিল ঝাল লবণ ছাড়া শুটকী খাওয়া যায়? এসব গোপন অপমান। ওপরের জ্বালা ধুলে চলে যায় কিন্তু ভেতরের যন্ত্রণা যায় না। মা জানে না। বাবা ট্রাক চালাতো। মা পরচুলা বানাতো। বিন্দী ছবির গলায় কথা ফোটাতো। সবই তো খিদের তাড়নায়। কজন পুরুষ জানে মেয়েরা বর খোঁজে বেশির ভাগটা চুমু নয় রুটির জন্য? তবে হ্যাঁ ভরা পেটে যৌবনের খিদেটাও আসে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল লাগালাগি ফ্ল্যাটের আঞ্জুরা নামে অল্প বয়সী বউটি ছেলেকে কোলে চেপে ব্যালকনিতে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াচ্ছে। দেওয়ালের ওপাশ থেকে ওদের চাপা শব্দগুলি গভীর রাতে এপাশে কুহকের মতো শোনায়। যেন নৌকায় দাঁড় বাইছে। লোকে বলে সংসার যাত্রা। বাইরে হাওয়ার ফোঁস ফোঁস। নিশ্বাসে সমুদ্রের গন্ধ। চলে যাও চোরা স্রোত। পা বেঁয়ে লাফিয়ে উঠে কোমরের নীচে ভিজিয়ে দিয়ো না। কল কল কল ছলাৎ। সামনে কি ভীষণ খিদে। পরিচালক বর্মণ সাহেব কি কোনও সাহায্য করবেন? এই সেদিন উনি মস্ত নেতার নির্বাচনী প্রচারের জন্য ভিডিও ক্যাসেট করে দিয়েছেন। পয়সা নেন নি।

মা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে কি ভাজছেন। সেই সঙ্গে বিলাপ। তুমি তো দিব্যি স্বর্গে চানা ভাজা দিয়ে বিলিতি টানছ। এদিকে তোমার মেয়ে যে বোবা হয়ে গেল। কিছু একটা করে দাও। নয় আমাকে কাছে টেনে নাও। পরচুলা বানিয়ে চেয়েচিন্তে যদি-বা দাঁড় করালাম, খাওয়া-পড়া মাথার ওপর ছাদ জুটলো তো ভারুচেশ্বরের সইল না। হে দেবতা মেয়ের গলার আওয়াজ ফিরিয়ে দাও। ওকে তোমার দুয়ারে মাথা মুড়িয়ে আনব। এ শহরে কতলোক কাপড় কাচার, ঘর ঝাঁট দেওয়ার বাসন মাজার যন্ত্র কিনছে আর সময় বাঁচিয়ে কুকুর কোলে গাড়িতে ঘুরছে। আমি তো সেসব কিছুই চাই নি। মেয়ের এমন একটা বর জুটিয়ে দাও যে আমাকেও দুটি খেতে দেবে। বিন্দী এসব স্বপ্নের কথা সইতে পারে না। অভ্যাসমতো চেঁচাতে গেল, মা থামবে? গলার কাছে মাছের কাঁটার মতো হাহাকার বিঁধেছে। এমন যন্ত্রণা হল যে রাস্তার আলোগুলি দপদপ করতে থাকলো। আঞ্জুরা ইতিমধ্যে ঘুমন্ত বাচ্চাকে ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছে। জানালার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? বিন্দী গলার আঙুল ছুঁয়ে কষ্টের ভঙ্গী করল।

—খুব ব্যথা? আজ বিকেলে মনে হল ওই বউ-মরা লোকটার সঙ্গে বেড়াতে বেরুলেন। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক যাওয়া ভালো।

বিন্দী ভেবে পেল না কি ভাবে জবাব দেবে। শেষে মনে হল ডাক্তার বুঝাতে স্টেথোস্কোপ। প্রথমে দু'কানে তর্জনি দিল তারপর ডান হাত নামিয়ে গোলাকার কিছু ধরার মতো আঙুল করে বুকের এদিক-ওদিক ছোঁয়াল। বউটা ঘোড়ার ডিম বুঝল। অশ্লীল কিছু ধারণা করে মুখ চেপে খুট খুট হাসে। একি কৃষ্ণকান্ত, যে ওর নীরব ভাষা বুঝবে?

—ভাল বিন্দীদি। আজকাল কেউ কিছু মনে করে না। একা থাকা খুব মুশকিল। আমার লোকটা কাল সন্ধ্যায় ডিউটিতে গেছে আজ এখন পর্যন্ত ফেরেনি। খবর পাঠিয়েছে কি একটা মেশিনে ব্রেকডাউন। ও তো কোম্পানির সেরা মেকানিক। সব ঠিকঠাক না করে কি করে ফেরে? কর্তাদের সুনজরে আছে নইলে এতদিনে বসিয়ে দিত। উন্নত যন্ত্র আনছে আর লোক কমাচ্ছে। আঞ্জুরা আরও এগিয়ে এসে জানালার গ্রিলে মুখ চেপে ফিস ফিস করে বলল—জানেন কি হয়েছে? সতের নম্বরের শ্রীবাস্তব ছাঁটাই হয়ে এখন মজুর খেপাচ্ছে। ওর বউটির দেমাক কিন্তু কমেনি। এখন কী হবে? আমি বলেছি ঘর ছেড়ে যদি কারখানায় পড়ে থাকতে হয় তো তাই থাক। চাকরি খোয়ালে খাব কী? উনি বলেন, মালিকরা লাভ কমলে কারখানা বন্ধ করে অন্য ব্যবসায় টাকা ঢালে। পলি পাইপ এসে গেছে। আর. সি পাইপের কারবার কদিন আর চলবে! শ্রীবাস্তব ওর কাছেও এসেছিল। আমার খুব ভয় করে। আপনি একটা কথাও যে বলছেন না। কি? বলতে পারছেন না। কষ্ট হয়! দোক্তা খান? না? তাহলে আমার ফুফার মতো ক্যানসার নাও হতে পারে। দুদিন বিশ্রাম নিয়ে দেখুন। না কমেতো আপনাকে আমি জালাল পীরের মাজারে নিয়ে যাব। পানীতে দরুদ পড়ে দেবে। তিন দিন খেলে খারাপ হাওয়া নষ্ট হয়ে যায়।

বিন্দী এসব বিশ্বাস করে না। মানুষ বড় ভয়ে আছে। পীর যদি বন্ধ কারখানা খুলে দিতে পারত তবে বোঝা যেত।

মা আবার বক বক করতে শুরু করেছে। সময় থাকতে কাউকে পছন্দ করলি না। ভাল ভাল ছেলেরা আর কি পড়ে আছে? এখন যারা ছোক ছোক করে তারা সব ঘুঘু মাল। যাদের একটা বউ মরে তাদের পাঁচটা মরতে পারে।

দরজা খোলা ছিল। বিন্দী দেখল কৃষ্ণকান্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে থমকে দাঁড়াল। নিশ্চয় কানে গেছে। ভেতরে ভেতরে মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, আঃ মা কেউ তোমার চল্লিশ ছুঁই ছুঁই মেয়েকে চায় না। কি আছে? কেন চাইবে? একে রোজগার বন্ধ। তার ওপর ওষুধ ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ। মুভিতে যে ছবি তোলা হয় তার জন্য কত আলোর আয়োজন। আর মানুষের ভেতরের ছবি তোলার জন্য পর্দাটানা অন্ধকার ঘর। বিন্দী ভাবল, আরও গভীরে যে মন, সেলুলয়েডে কোনদিন কি তার চেহারা ধরা যাবে? মা কি সত্যি চেয়েছিল একমাত্র রোজগেরে মেয়েটার বিয়ে হোক? তা হলে আঠারোয় যখন নতুন যৌবনের আলগা কোমল

আভা মুখে বুকে কোমরের খাঁজে ফুটে উঠেছিল তখন কেন কেঁদেকেটে মেরে ধরে যোগপ্রকাশের সঙ্গে ওর মেলামেশা বন্ধ করে দিল? ওই একবার ভালবাসা আসতে আসতে ফিরে চলে গেল।

চৈতের এক বিকেলে এমন কোমল গান্ধার রোদ যে দূরের নারকেলগাছের মাথা বেঁয়ে আবির ঝরছে আর এক জোড়া চড়ুই খড়কুটো মুখে কার্নিশে বসে নতুন সংসার, কালো বেড়াল, ফর্সা ডিম, আর একলা মানুষের দুঃখ নিয়ে খুব কিচমিচ করছিল। বিন্দী আগে হলে ওদের আওয়াজ গলায় তুলে নিত। সংসার মানে তো খড়কুটো দিয়ে গড়া চার্চের ফাদারের টুপির মতো ছোট্ট গোল বাসা। তাতে দুটো তিনটে শাদা মার্বেল নিয়ে দুজনের কি খেলা। জায়গা যত কম তত সুখ। পালকে পালকে দিয়ে ঘন হয়ে থাকা। কিন্তু সেই কালো বিড়ালটা? ওৎ পেতে আছে। গোপন অন্ধকারে। যেদিন গলা বন্ধ হল সেদিন এই বেড়ালের আওয়াজ করছিল। এই কি সেই ভয় যার জন্য বাবা মদ খেয়ে বেহুঁশ হত? এই কি সেই আশঙ্কা যার জন্য মা যোগপ্রকাশকে অপমান করে তাড়িয়েছিল? এই কি সেই নিদারুণ নিয়তি যা ওকে রূপহীনা করেছে। কালো বেড়াল তো রূপক মাত্র। নিরুপায় যন্ত্রণার। খিদে আর বিনাশের।

দরজা ঠেলে কৃষ্ণকান্ত ঢুকলো। স্পষ্টত নেশা করেছে। বলল, আজ সোমবার। আমার মদ আর প্রার্থনার দিন। তোমার মাকে দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যাচ্ছেন।

বিন্দী চিবুকে তর্জ্জনি ছোঁয়াল আর বাঁ-হাতে কালো লম্বা বেণী কাঁধের ওপর দিয়ে বুকে টেনে আনল।

কৃষ্ণকান্ত বলল, বুঝেছি, কোথায় গেছেন বলে যান নি। তবে আন্দাজ করতে পারছি যে সেই আগেকার মতো পরচুলার দোকানে কাজ পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে। না বিন্দী, এখন আর মানুষের চুলে পরচুলা হয় না। নাইলন এসে গেছে। তোমার মার মতো ওস্তাদ কারিগরদের দিন শেষ। চট করে তৈরি হয়ে নাও।

বিন্দী আঙুল দিয়ে চাবি ঘোরাবার ভঙ্গি করল।

কৃষ্ণকান্ত আবার বলল, আশ্চর্য সব কথাই কত সহজে বুঝতে পারছি। বলতে চাইছ মা না এলে ঘরে তালা চাবি দিয়ে যাই কি করে? তাই যাব বিন্দী। মা আসার আগেই। অত আজেবাজে কথা আমার ভালো লাগে না। চুপচাপ ঘরে বসে থাকলে এ অসুখ সারবে না। আজ সকালে তোমার রিপোর্টগুলি কনসালট্যান্ট ডাক্তারকে দেখিয়ে এনেছি। উনি বলেছেন কিছু নেই। মনের অসুখ। তাই চল বিন্দী, একজন মনের ডাক্তারের কাছে। কি হবে টাকা-পয়সার কথা ভেবে? আমি তো আছি।

তা বিন্দীর কি মনে হল সবচেয়ে ভাল সালওয়ার কামিজ পরে নিল। কপালে সোনালী টিপ আর ঠোঁটে গোলাপী রঙ। ডাক্তার বললেন দীর্ঘ চিকিৎসা দরকার। ভাল হওয়া মুশকিল। কষ্টকর ইনহিবিশনের পরিণাম। চেপে রাখা বাসনা কোনও

একটা প্রত্যঙ্গ অসার করে দেয়। হাত-পা কাঁপা বা স্মৃতি লোপ পাওয়ার রুগী হামেশাই আসে। কিন্তু গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার খুব রেয়ার। অত্যন্ত ইমোশনে অবশ্য লোকে তোতলা হয়। এ বিষয়ে আমি মেডিক্যাল জার্নালে লিখব।

ওখান থেকে কৃষ্ণকান্ত বিন্দীর হাত ধরে বেরুল। বলল, পড়ে যেয়ো না। মুখের ওপর এত নিষ্ঠুর কথা বলা ঠিক নয়।

বিন্দী কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার করে হাসল। হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে একরকম টেনে নিয়ে চলল সমুদ্রতটের দিকে। আজ এই মাঝ বয়সী পুরুষ ওকে ঘর থেকে বের করে আনার সাহস দেখিয়েছে তাই এই বোবা কালো মেয়েটা বেপরোয়া। সন্ধ্যা পার হয়ে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠছে। বালুর ওপর পাশাপাশি বসল। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কফি আর সামোসা খেল। যেন ট্যুরিষ্ট। দূর দেশ থেকে বেড়াতে এসেছে। হাওয়া হাওয়া সমুদ্র—ফেনায় ফসফরাসের ঝিকিমিকি। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ানো মেয়ে পুরুষের চাপা আলাপ। কৃষ্ণকান্ত ওকে বলল, দুঃখ ঝেরে ফেল বিন্দী। কেউ একা নই। না তুমি না আমি। এই যে তোমাকে আমি বুঝতে পারছি একি ভাষায় বলা যায়। বল, হুঁ। মাথা নেড়ে নয়। ঠোঁট গোল করে গলার ভেতর থেকে একচিলতে হাওয়া ঠেলে দিয়ে। পারবে পারবে। আমি বলছি পারবে। বিন্দী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক যেমন করব তেমন একটা শব্দ বলার চেষ্টা কর। এই তোমাকে চিমটি কাটলাম। উঁহু করে ওঠ।

বিন্দী যন্ত্রণায় কৃষ্ণকান্তের কাঁধের ওপর মাথা ঘষে জল ভরা চোখে মুখের দিকে চাইল। তারপর ঠোঁটের উপর আঙুলে আলতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে শব্দের আকারটা বোঝানোর চেষ্টা করল। কৃষ্ণকান্ত ওর মুখের দিকে আরও ঝুঁকে উত্তপ্ত স্পর্শের প্রায় কাছাকাছি গেল আর ঠিক তখনি দূর জলভাগ থেকে একঝাঁক যাযাবর পাখি পাক খেয়ে ডাঙার দিকে উড়ে আসতে আসতে কঁক্ কঁক্ কঁ কঁ কঁ করে উঠল। ঢেউ ভাঙার ছলাৎ, আর এই শব্দ আর ঘনিষ্ঠ নিঃশ্বাসের ছাঁদ মিলেমিশে তোলপাড় হয়ে গেল।

খুব আশ্চর্য বিন্দী ওদেরই মতো ডেকে উঠতে পারল। কিছুতেই থামতে চাইল না। কৃষ্ণকান্ত ওকে দু'হাতে জাপটে বলল, এই তো, এই তো বিন্দী তোমার হারানো শব্দগুলি........।

এক বাক্স সুখ

তরঙ্গ এই ব্যাপারটা প্রতিবারের পালাগানের শেষে ঘটতে দেখে আসছে। হয় ওর কিছু হারায়, নয় ও কিছু পায়। এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। যদি এরকম হতো যে খারাপ গেয়েছে, তাই ননীচোরা ওর জুতোর একপাটি বা চাদরটার পাখা গজিয়ে উড়িয়ে দিল বা ভাল গেয়েছে তাই এক প্যাকেট আমসত্ত্ব উপহার পাইয়ে দিল, তবে সোজাসাপটা শাস্তি ও পুরস্কারের নিয়মে ফেলা যেত। তা হয় না। তবে যেবার কিছু হারায় সেবার পায় না। যেবার পায়, সেবার হারায় না। এটা ঠিক আছে। বুঝতেই পারে না কিভাবে যে হাপিস হয়। যতই নজরে রাখুক। নৌকা বিলাস জমিয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে দেড় দিনের আবাসে এসে, বিছানায় ছড়ানো, কি দড়িতে ঝোলানো জিনিসপত্র গুনে গেঁথে এই ব্যাগে তুলে নিল, তারপর কাঁধে ঝুলিয়ে এই যে খেতে চলল। বেশ খেল। বায়নার বাড়িতে যেমন খাওয়ায়। খিচুড়ি, বেগুনি, একটা ঘ্যাঁট, আমড়ার চাটনি আর শেষ পাতে পায়েস। তারপর বাসে উঠে বসল। ছাড়ার একটু আগে সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাজ্জব। লাইটার নেই। হ্যাঁ, মেকলিগঞ্জে ওটা গেল। পারুল্যেতে গিয়েছিল চিরুণী।

এভাবে যা যায় তা যায়। আগে আগে ভাঙা আসরে বা ছেড়ে যাওয়া ঘরে খোঁজ করত। এখন আর করে না। ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে। পাওয়া না পাওয়ায় নিরাসক্ত। হারানোর উলটোটা পাওয়া। বাস থেকে নেমে রওনা দিয়েছে। ছেড়ে দেওয়া বাসের পাশের সিটের লোকটা জানালা দিয়ে একটা ছাতা ছুঁড়ে দিয়ে বলে, এই যে দাদা, ফেলে গেলেন। আমার না, এটুকু বলারও সময় পায় না। হুঁশ করে বেরিয়ে যায়। এটা ধলদিয়ার ব্যাপার। সেবার হঠাৎ গলা বসে চিঁ চিঁ করে গেয়েছিল। মনে আছে একবার ব্যাগ থেকে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নামে একটা বই বেরিয়েছিল। নামধাম লেখা ছিল না। কারবা বই, কিভাবে সেঁধিয়ে বসে আছে, দেখ। আর সেই সাদা পাথরের গেলাশ পাওয়া। রাজমহলে। ট্রেন ছাড়তে যাচ্ছে, বায়না বাড়ির ফর্সা গালে টোল পড়া মেয়েটার ভাই এসে ছুটতে ছুটতে দিয়ে গেল। দিদি বলল, মনে রাখবেন। দূরে সে ছিল। চুলের গোছা মুঠোয় ধরে। কু-ঝিক-ঝিক। কালো পাহাড়ের আড়াল। এখন সে কোথায়?

এবার জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে রামকেলীর মেলায় গাইতে এসেছে ওই মন নিয়ে। পেলাম কি হারালাম, তাতে কি আসে যায়। কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো কি আর হারাতে পারে? যে তমাল গাছের নীচে মহাপ্রভু সুলতান হুসেন সাহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, আসর বসেছে সেইখানে। মেলায় যা হয়, শ্রোতারা মাঝে চাঁদ রেখে দীঘির জলের মতো থির হয়ে বসে না। বর্ষার নদীর মতো অবিরাম বইতে বইতে

থাকে। তরণী কাকা ওদের মূল গায়েন। লোকের ছটফটে উলটাপালটা স্রোত দেখলে চুটকি ধরে। গম্ভীর ভাবের মধ্যে ছলবলিয়ে আখর কাটে। নয়ানেরো কাজলো বয়ানে লেগেছে, যাও যাও আমাকে ছুঁয়োনা, লম্পট। ছি ছি অন্ধকারে ভুল করে কার নীল শাড়ি পরে এসেছ? সে কি তোমারটা পরে ঘরে ফিরতে পারবে? এতে লোক আহা আহা করে এগিয়ে আসে।

চাঁদমুনীর কেষ্টলীলা দলের এখানেই শেষ বায়না। এ বছরের মতো। শুরু হয়েছিল রামনগরের রাসমেলায়। এরপর বাদল নামবে ঝমাঝম করাৎ। গাঁয়ে ফিরে ওরা মাঠে জল ধরবে ধান রুইবে। সোনার টোপরের মতো মাজাবর্তনে খাবার নিয়ে বউ এসে পাকাল মাছের মতো কাদামাখা মানুষটাকে ডাকবে, উঠে এসো গো। গানেও তো ওই উঠে আসার কথাটা আছে। আমার হাত ধর, গহীন নদীর পারে উঠে আস। তরঙ্গের বউ নেই। বিয়ের এক বছরের মাথায় ভেগেছে। পেটে বাচ্চা ছিল। বলে কিনা ও তোমার নয়। তরঙ্গ ভাবে, ঠিক আছে, আমার কিছুই নয়। এই দুনিয়াতে আমি বিরহে আছি। যত লীলা সবই তো বিরহে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। নরোত্তম দাস বাবাজির নিজের হাতে গড়া এই দল। সাত-দশ পুরুষ ধরে গাইতে যায়। বাঁধা জায়গায়।

তা আসরে বসে বুঝতে পারেনি আকাশে কখন আগুনবরণ মেঘ উঠে এসেছে। লোকজনকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে তরণী কাকা আর এক পোঁচ রস চড়ালো—ও চিকন গোয়ালিনী, জোয়ারের পানি কি দরজা বন্ধ করে রাখতে পারবে? দশজনকে ভাসাতেই তো রূপ যৌবন। কিন্তু না, লোকেরা ছুটে আসছে বটে, তবে অন্যরকম ভাবে। হুড়মুড় করে মঞ্চে উঠে পড়ছে। ভয় পাওয়া জন্তুর মতো। শ্রীখোল ছিটকে গেল। হামা দেওয়ার মতো চার হাত-পায়ে উপুর হয়ে তরঙ্গ পেটের তলে হারমোনিয়াম আড়াল করে বাঁচাল। কানাত উড়ে যাওয়ার পর ও ঘাড় ফিরিয়ে আসরের মাথার ওপর সেই দাউদাউ মেঘটাকে দেখতে পেল। ধুলোর ঘোলাটে শুঁড় দোলাতে দোলাতে তচনছ করে দিচ্ছে সব। বাদল নয়, মেঘ ডাকাডাকি নয়, এ কী রকম হঠাৎ প্রলয়। এলো আর গেল। বোঝার সময়টাও দিল না। থামা মাত্র যতদূর চোখ যায় উলটানো চালা, দোমড়ানো বেড়া, ছড়ানো-ছিটানো মনিহারী জিনিস, রঙ করা টিনের বাক্স, খেলনা, খাবার-দাবার। উড়ে যাওয়া সার্কাসের তাঁবুর মাঝ খুঁটির মাথায় পতাকার মতো লটকে থাকা ফ্রক। একেকটা স্তূপের ভেতর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। চাপা পড়া মানুষের গোঙানি।

টর্নেডোতে মেলা শেষ তো আসরও শেষ। কজন মরল, কিভাবে উদ্ধার কাজ চলল, কত ক্ষয়-ক্ষতি হল, কার বেঁচে যাওয়া আশ্চর্যজনক, টর্নেডো কী জাতের ঝড়, হাতির শুঁড়ের মতো ওইটে আসলে কী—এসব কাগজে লেখালেখি হয়েছে। তরঙ্গের এখন সময় নেই। পড়ি কি মরি ছুটল। যেমন আসর ভাঙলে প্রত্যেকবার আগে নিজের জিনিস কটা গুছিয়ে ব্যাগে তোলে। মদনমোহনের পাকা দালানে ঠাঁই

হয়েছিল এবার। কাজেই কিছু এদিক-ওদিক হয়নি। এরপর অভ্যাসমতো খাওয়ার জায়গায় হাজির হল। তখনি টের পেল এ ঝড় কি সাংঘাতিক। উপোস করিয়ে ছাড়তে পারে। রান্নার চালাটাই উনুনের ওপর হুমড়ি খেয়ে জ্বলছে। কড়াই ভর্তি ডাল ঢেলে তা নেভাবার চেষ্টা কেউ করেছে। এখন তার অদ্ভুত গন্ধে গা ঘোলাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার পর যাওয়ার ব্যবস্থা। দলের লোকদের খোঁজে চলল। তরণী কাকা বলল, তুই ফিরে এলি যে?

—তার মানে?

নেপাল, ভুটু, চাঁদুরা কলেরার ট্রাকে মালদা চলে গেল। বাসটাস তো চলছে না। মেলা কমিটি এমনিতেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। আর কি করবে। এটুকু যোগাযোগ করিয়ে দিল। আমি বললাম, চলে যা। তা ওরা গেল তো তুই পড়ে রইলি কেন? এখন কি করবি?

—তুমি?

—আমাকে থাকতেই হচ্ছে। রমাপতিকে হাসপাতালে দিতে হবে। তাও জানিস না? বাঁশ পড়ে ওর ঠ্যাঙ ভেঙেছে। হুই দেখ।

তরঙ্গ দেখল। নাটমণ্ডপে একজন করে আহত এনে গাদা দেওয়া হচ্ছে। ও রমাপতির কাছে গিয়ে, কীভাবে হল। কতটা চোট লেগেছে এসব আলোচনা করল। সিগারেট ধরিয়ে মুখে গুঁজে দিল। চোট বেশি নয়। তবে হেঁটে যাওয়া চলবে না।

তরণী কাকা বলল, তুই যাওয়ার উপায় দেখ। আমি রমাপতিকে নিয়ে ফিরব। এই ধর, দিনচারেক।

কোনও যানবাহন নেই। কোথায় কোথায় গাছ পড়ে রাস্তা আটক হয়ে আছে। কলেরার ট্রাক ঘুর রাস্তায় গেছে। পৌঁছাতে পেরেছে কিনা কে জানে। আর ফিরে আসেনি। ভাবতে ভাবতে এই অন্ধকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রাত গড়িয়ে মধ্য আকাশের ভাঙা চাঁদে ঠেকল। কে কার নাম ধরে ডেকে ফিরছে। তমালগাছের ডাল ধরে কে কাঁদছে। সন্ধ্যায় এই তমাল যমুনা পুলিনে ছিল। তাকে ঘিরে মানুষের মেলা। মায়েরা সেই ননীচোরাকে নিয়েই তো মেলায় এসেছিলো। বউকে হাত ভরে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে পুরুষরা মনে মনে ভেবেছে, মুখে তুলে চাও রাই, প্রাণ ভরে দেখি। আর বিরহের কথা মনে এলে রাজমহলের কালো কালো পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া সেই ফর্সা চাপা নাক মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে।

এই জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। তবু লোকে চলছে। ঠেলে, ডিঙিয়ে। একটা একমুখো স্রোত দেখা দিয়েছে। ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় না পেলে লোকে পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছে। তরঙ্গ এক সময় ওদের সঙ্গে মিশে গেল। বাঁশ, খড়, চাটাই, ক্যানেস্তারা, টালি আর কত কী ছড়িয়ে, ছিটিয়ে আছে। চলতে চলতে তরঙ্গ একটা হোঁচট খেল। শক্ত কিছুতে লেগে পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট খেয়েছে। উহু করে সেইখানে হাত দিতে জিনিসটা দেখতে পেল। একটা হাতবাক্স।

শক্ত মলাটের গীত রত্নাকরের আকারের। চলে যাওয়ার সময় কিছু হারানো বা পাওয়ার ব্যাপারটা ওর মনের মধ্যে ঘুরছিল। কাজেই অবাক হয়নি। এতো ভাবাই ছিল। কিছু খোয়া যখন যায়নি, তখন পাওয়ার কথা। ওর অপেক্ষায় জঞ্জালের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল। নিজের জিনিস তুলে নেওয়ার মতো ধীরে-সুস্থে উঠিয়ে ঝেড়ে ব্যাগে রাখল। এই অন্ধকারে এমন চলায় কেউ হোঁচট খেতেও পারে, তার কি দেখার আছে। কিন্তু না, ঝুঁকে পড়ে তরঙ্গের কাঁধের ওপর কে গরম নিশ্বাস ফেলল—আমি কিন্তু দেখেছি।

তরঙ্গ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলো। কাঁচা বয়সী বষ্টুমী। চাপা নাক, তেরচা ছোট ছোট চোখ। একটু রাগও হল। আমার জিনিস আমি রাখছি এতে কার কী বলার আছে। কিন্তু যে কথা মনে তা মুখে ফোটাতে পারল না। আমতো৷ আমতো৷ করে জবাব দিল, নাহ, বেশি চোট লাগেনি।

চাপা হাসির শব্দ উঠল, বেশি লয়কো?

অনেকটা এগিয়ে গেছে ওর বোষ্টম। হাসির শব্দ শুনে পিছু ফিরে বলল, কার সঙ্গে কথা কহিছ?

বোষ্টমী ঝাঁঝিয়ে উঠল, কার সঙ্গে কথা কহিব? তোমাকেই কহিছি। একটু দাঁড়াও কেনে। হামি কি অত দড়বড়িয়া চলতে পারি?

তরঙ্গ পুরুষ মানুষটার গলা শুনে বয়স আন্দাজ করে নিল। প্রৌঢ়। আবছা আলোয় দূর থেকে তার ঢেঙা শুকনো চেহারা দেখল। মেয়েটার দ্বিগুণ বয়সী হবে। একটু দাঁড়িয়ে বোষ্টমীকে পাশে নিয়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে বেলে হাঁসের মতো ঘাড় ফিরিয়ে পিছু দেখছে সে নারী, তরঙ্গ ধাঁধায় পড়ে গেল। তরঙ্গ হাঁটার গতিবেগ বাড়িয়ে ওদের পাশ পাটাল। অলক্ষ্যে কাঁধের ঝোলা ব্যাগে একটু টান পড়ল। বষ্টুমী কি হাত বাড়িয়েছিল? হতে পারে, নাও হতে পারে, তবে মনে একটা সন্দেহ থেকে গেল। এতক্ষণ বাক্সটা নিয়ে ওর কোনও মাথা ব্যাথা ছিল না। এবার যেন মনটা খচখচ করছে। ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করল। কী রকম ঠান্ডা। তুলে ধরে ওজন অনুভব করল। তেমন ভারী নয়। ওর পাওনা কোনদিনই ওজনদার হয় না। যায় সামান্য আসেও কিঞ্চিত। তবু এবারেরটা অন্যরকম। যা আছে, ভেতরে গোপন আছে। লুকোছাপার কিছু অপরাধ বোধ থাকে। আগের আগের বার তেমন মনে হয়নি। আচ্ছা হাত বাক্সটা ও যদি কুড়িয়ে নাই নিত, কি হত তাহলে?

ভাবতে ভাবতে পিয়াসবাড়ির তেমাথায় এলো। দুর্গোগের পরও লোকে দুটো পয়সার জন্য ব্যবসা করে। ওখানে মেলা ভেঙে গেছে, কিন্তু এখানে ছোটখাট মেলা লেগেছে, ঝড়ের দাপট এদিকে তেমন হয়নি। দোকান পাট অটুট। চলে যাওয়ার পথে এখানে যারা বাকি রাতটা কাটিয়ে যাবে তারা পথের পাশে বা দিঘির পাড়ে সুবিধা মতো জায়গা নিয়ে শুয়ে বসে পড়েছে। তরঙ্গ চলে যাবে। চা আর তেলে ভাজা খেতে খেতে দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল সেই বোষ্টম আর

তার সহচরী পথের ধারে চাদর বিছাচ্ছে। তরঙ্গ ভাবল এখানেই একটু আড়াল খুঁজে দেখি না বাক্সে ননীচোরা এবার কী দিল! মাথা নামানো একটা গরুর গাড়ির পেছনে ঝোলা থেকে জিনিসটা বের করতে যাবে এমন সময় আবার সেই তীক্ষ্ণ মেয়েলী গলা—ওমা তুমি এখেনে! আমি টুঁড়ছি। এতখন চোখে চোখে রাইখাছি। গেল কোনঠে। লাওগো খোল।

—কি খুলব?

—ন্যাকা। কেন মোদের বাক্সটা।

মোদের এই শব্দটায় তরঙ্গের গা শির শির করে উঠল। আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে তো। মোদের বললেই হল? তরঙ্গ গোঁজ হয়ে বসে রইল।

মেয়েটা আবার তাড়া দিল, লাওগো, ঝট কর। হামার মানুষটা খুব বদমেজাজী। দুজনাকে ইরকম দেইখলে মাথায় লাঠি মাইরবে।

ভয় দেখাচ্ছে। তরঙ্গ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, কি চাও তুমি?

—কেনে, হামার ভাগ?

—তোমার সঙ্গে আমার চেনা নেই, জানা নেই, আচ্ছা মেয়ে মানুষ বটে তুমি।

মেয়েটা চকিতে পেছন দিকে দেখে নিয়ে এবার মিনতি করল, দাওগো, যা পেয়েছ অদ্দেক দাও। চইলা যাই। ইতে ফের চেনা-জানার কি আছে?

—না।

—আচ্ছা, আচ্ছা মোর নাম কুশী। কুশী দাসী। হুই বোষ্টম মোকে রেখেছে। রূপ গোঁসাইয়ের ভাইয়ের নাম কি?

—সনাতন।

—হ্যাঁ উটাই অর নাম। খেতে দেয়, পরতে দেয়, মোকে লিয়ে সাধনভজন করে। সোম্‌সারী লোক উসব বুঝবা না। হামার সোম্‌সার নাই। তুমার কি নাম চাঁদ?

—তরঙ্গ।

—মেলায় একা আইসাছ? বউ?

—বউ নাই।

—বেটা বেটি?

—নাই।

—বাঃ। তেবে তোমার এত টাকার লালচ কেন?

—তোমার কেন?

—তা দিয়া তুমার দরকার। মোর ভাগ দাও। চইলা যাই। আঃ উ দেখ মোকে টুঁড়তে ইদিকেই আসছে। যাইও না। এইঠে বইসে থাক। এখনি আসছি। যাবা না হাঁ?

কুশী ছুটতে ছুটতে চলে গেল। খানিক দূরে বাউলদের আসর বসেছে' গানের সঙ্গে গাবগুবার ছাঁদ। ওদিকে সনাতন বোষ্টম তড়পাচ্ছে। তরঙ্গ ভেবে পাচ্ছিল না

কি ভাবে কুশীর চোখ এড়িয়ে চলে যাওয়া যায়। একটা কথাও ওর মনে এলো। কুশীর কিছু লুকোচুরি আছে। বাক্সটার কথা লোকটাকে নিশ্চয় বলেনি। না হলে চুপিচুপি আসবে কেন? ভেবে চিন্তে ও দীঘির পাড় ধরে কিছুটা গিয়ে রাস্তায় ওঠার সিদ্ধান্ত নিল। মেয়েটার চোখ দুটো এই আলো আঁধারে, পরিহাসে ঝিকমিক করে। দেখে বোঝা যায় না তলে তলে এত লোভ। উড়ে এসে জুড়ে বসে ভাগ চায়। পুরুষের জিনিস মেয়ে মানুষের কখন হয়? কাঁধে ব্যাগ নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরল খানিক। আরও একবার চা খেল। যেন দেখাতে চায় চোখের নাগালেই আছি। ছেড়ে যাইনি। এভাবে ধোঁকা দিয়ে একসময় দীঘির পাড় ধরে চলে গেলেই হবে।

কিন্তু হল না। বাঁধ থেকে কোনা কেটে সরু পথটা যেখানে ঢালু হয়ে রাস্তায় মিশেছে সে পর্যন্ত গিয়ে আবার সেই ডাক শুনল—এই যে, ও মানুষটা। মোকে ফেইলা চইলা যাছ নাকি?

তরঙ্গ একটু হকচকিয়ে গেল, না, মানে তুমি এখানে?

—ভাগ না নিয়ে চাঁদ, যাই কি কর্‍্যে? আস, ইখানে বস।

—বাবাজি কোথায়?

—ছোট কইলকায় দম দিয়ে নিঢালে পড়্যে আছে। কুশী দাসী খিক খিক করে হাসল, ভয় নাই গো, উঠতে দু'ঘণ্টা। এখন শুধু মোরা দুজনা। তোমার লেগে বইসে আছি। আমি জানি, মোকে তুমি এড়াইতে চাইবা। ঠিক কি না?

তরঙ্গ দেখল মেয়েটা শুধু লোভী নয়, অত্যন্ত ধূর্ত। ওর কৌশলটা ধরে ফেলে, কেমন পথের মুখ আঁটকে বসে আছে। খুব রাগও হল। বলল, যেযার মতো যাবে, তাতে কী? কুশী খুব নিরাসক্তভাবে জবাব দিল, ঠিক কহেছ। তুমি মোর কে? এই যে পথ চেয়ে আছি, টাকার লেগে। ভাগ দাও, চইলা যাও।

—কিসের ভাগ?

—ন্যাকা চান্দ গো। আস বস। বাক্সটা বাহির কর।

তরঙ্গ থুতু ফেলে কোনও জবাব না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল। কিছু চলার পর মুখ ঘুরিয়ে দেখল মেয়েটা ওর পিছু ধরেছে। ছাড়বে না। হাতিবান্দা পর্যন্ত এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। কুশী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ঠাঁইরে গেলে কেন?

আকাশ ফেটে আলো দেখা দিয়েছে। মাথার ওপর দিয়ে কিচমিচ করে পাখি উড়ে গেল। মেয়েটার চোখে-মুখে লালচে আভা। একগোছা চুল ঘামে গালে লেপটে আছে। এমন নাছোড়বান্দা। তরঙ্গ ঢোক গিলে বলল, তুমি আমার পিছু ধরেছ কেন? বোষ্টমকে ছেড়ে কতদূর চলে এসেছ খেয়াল আছে?

—তোমার সঙ্গে যাইব গ। তোমার ঘর কি বেন্দাবনে। যেইঠে তুমি লিয়া যাইতে চাও। তুমার কাছে যাদুর বাক্স। আর কি ছাইরা যাইতে পারি?

তরঙ্গ এ কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঘৃণায় সমস্ত শরীর রী রী করছে। নিজেই

বুঝতে পারল না! কী ও করতে যাচ্ছে। রাস্তা থেকে একটা পাথর তুলে চিৎকার করে উঠল—খবরদার।

মেয়েটা আরও কাছে এগিয়ে এলো, মারবা? মোরে মাইরা ফেলাও। আরে ভাল মানুষের বেটা মোর টাকা লিয়া ভাগবা, ফের খুন করতে চাও? টাকা দিয়া দাও, লয় আমি চিল্লাব। লোকে জানুক মোর টাকা ছিনতাই কইরাছ। মোকে বেইজ্জত কইরাছ। তরঙ্গ পাথরটা ফেলে দিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়াল। গলায় সমস্ত তিক্ততা ঢেলে দিয়ে বলল, ছিঃ!

কুশী ফুঁসে উঠল, ছিক্কারের কী হইল? হামি কি তোমার কাছে ভিখ মাইঙ্গাছি? জেবনে আমি কিছু পাই নাই। যদি প্যালাম তেবে কেনে কাইরা নিবা?

তরঙ্গ ঝোলা থেকে বাক্সটা বের করে আস্তে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে বলল, নাও। আমি ছিনতাই করি নাই। করছ তুমি। এটা আমার পাওনাই ছিল, রাস্তা থেকে আমাকে নিজের জিনিস তুলতে দেখেছ।

—এঃ তোমার পাওনা ছিল? আমার লয়? তুমি যেমন দেইখাছ, আমিও দেইখাছি।

—গেরুয়া পড়ে ভগবান ভগবান করে বেড়াও আর তোমার এত লোভ যে বোষ্টমকে ছেড়ে টাকার পেছনে ছুটছ?

কুশী ম্লান হাসল, মোরা ভগবান চাই, না পোড়া পেটের জন্য ভিখ চাই? ও বোষ্টম আমার কে?

মেয়েটা নত হয়ে বাক্সটা তুলে নিল। ওর দিকে ফিক করে হেসে দীঘির উঁচু পাড়ের আড়ালে চলে গেল। সেখান থেকে ভার মিঠে গলায় ডাকল, কী গ আসবা না? ইদিকে আস। তোমার সুমুখে খুলি।

তরঙ্গ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাড়া না পেয়ে কুশী শুকনো কাঠ হয়ে আছে। কী থাকতে পারে ওইটুকু বাক্সে? যতই থাকুক তা দিয়ে সব মিটবে? মেয়েটা আবার ডাকল, শুনছ? আসনা। ইযে চাবি দেওয়া বাক্স।

আবার কিছুক্ষণ জলের শব্দ, হাওয়ার খশ খশ, পাখিদের কিচিমিচিতে কাটার পর কুশী আড়াল থেকে বেরিয়ে তরঙ্গের হাত ধরল, হামি একা কেন খুলব? মোদের দুজনার জিনিস। রাগ করো না। টাকার দরকার। কিন্তু তোমারটা লিব কেন? ভাগে যা হয় তাই তো?

তরঙ্গ অভিমানী বালকের মতো পিছু পিছু গেল। ঝোপের আড়ালে জলের ধারে দুজন মুখোমুখী। মাঝে রহস্যের বাক্স। ঝড়ঝাপটায় পাওয়া। কেউ হারায় অন্যে পায়। তাতে কিছু পাপ লেগে থাকে। ভেতরে সুখের সন্ধান আছে। আছে কি?

মেয়েটা ঠুকে ঠুকে ভাঙার চেষ্টা করছে। ঠুক...ঠুক...। সেই শব্দে একটা বক ধ্যান ভেঙে উড়াল দিল। জল খলবল করে চাঁদির টাকার মতো সকালের সূর্য দোল খাচ্ছে। ঠুক.......ঠুক......মেয়েটা বলছে, যদি অনেক টাকা পাই তবে জমি কিনব।

ঘর গড়ব। মাগো, উদোম হয়ে ছোট্ট গোপাল হামা দিবে। ঠুক....ঠুক.....ও বুড়াকে দিয়ে হবে না গ। বোষ্টম আমার কেহ লয়। বাপ-মা মইরা গেলে চ্যাংড়া বয়সে ওর হাতে কাকা মোকে দিল। যা সেবাদাসী হ। ভাত দিবে কাপড় দিবে। ঠুক......ঠুক.....লিজেই ভিখ মাইঙ্গা খায়। মোকে দিবে? ঠুক......ঠুক...........ইতে সুখ লাই। কেন কিন, আর পাঁচজনার মতো ঘর সোমসারে হামার মন। চোখ তুইলা চাও। চাবা না? দেখতো হামি কি খারাপ? ই চেহারায় কী পাপ আছে? মনে যা আছে তা যদি পাই। কেনে লিব না? ঘর নাই তাই দুনিয়া ঢুইরা মরছি—। ঠুক....ঠুক...হাঁ, যদি কম টাকা থাকে তবে একটা পানের দুকান দিব।

খটাস করে ডালা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো কিছু হিসাবের কাগজ আর এগারটা টাকা।

এতক্ষণ তরঙ্গ ভাবছিল যদি অনেক থাকে তবে একজনের না মেটা সাধগুলো পূরণ হোক। ওই তো স্তব্ধ হয়ে বসে আছে যৌবনের যোগিনী। কোথায় মিলিয়ে গেছে ওর সাধের একচিলতে জমি, উঠানের পাশে নয়নতারা ফুলের ঝাড়। তাইতে উড়ে উড়ে বসা লাল-নীল ফড়িং ধরতে গোপালের ছুটোছুটি, সন্ধ্যায় মাঠের জল কাদা মেখে তার নিজের মানুষটার ঘরে ফেরা। এইসব ঘর-সংসারের নিতান্ত সাধারণ অথচ মস্ত আকাশ উপুর করা স্বপ্ন ছোট্ট একটা হাতবাক্সে ছিল। তার পেছনে পেছনে এতদূর ছুটে এসেছে ঝড়ঝঞ্ঝায়। সমাজের প্রভুকে তোয়াক্কা না করে। লাজ, ঘেন্না, ভয় ফেলে রেখে। এখন নিতান্ত শূন্য চোখে চেয়ে আছে মোট এগারটা টাকার দিকে।

এমন সামঞ্জস্যহীন ঘটনায় তরঙ্গের খুব মজা লাগছিল। বলল, তোমার পান খাওয়া হবে বোষ্টমী। একশ বিশ নম্বর গোপাল জর্দা দিয়ে।

মেয়েটা জলে ভেজা পানপাতা মুখ তুলে ওর দিকে চাইল। তারপর টাকা ফেলে রেখে আবার পেছন দিকে হাঁটা দিল।

তরঙ্গের কি যে দুর্বুদ্ধি হল। ছুটে গিয়ে হাত ধরে বলল, এই, উলটো দিকে যাচ্ছ কেন?

ও কোকিলা

ল্যারিংসে ক্যানসার ধরা পড়ার পর সোমশংকর ছেলে অলককে ডেকে বললেন, আমার দিন ফুরিয়ে এলো। বাড়িঘর, ব্যাঙ্ক ও শেয়ার ডিবেঞ্চারের কাগজপত্র বুঝে নাও। কোনও অসুবিধা হলে এ্যাটর্নি প্রভাকর রাওভাও তোমাকে সাহায্য করবে। যা রেকে গেলাম তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। কেঁদো না। একজন ডাক্তার হিসেবে আমি শরীরটাকে যন্ত্র বলেই জানি। এখন মেরামতের বাইরে। কাজেই বাতিল হতে হবে। তবে ......

অলক বাবার বুকে মাথা রেখে ভেজা গলায় বলল, তুমি তো দিব্যি মা'র কাছে যাচ্ছ। আমার কে রইল?

সোমশংকর অনেকক্ষণ অলকের মাথা দু'হাতে জাপ্‌টে রইলেন—মরা মানে সব কিছু ছেড়ে যাওয়া। যারা পরলোক বিশ্বাস করে তাদের আবার দেখা-টেখা হওয়ার সান্ত্বনা থাকে। না, লীলার সঙ্গে আর কোনওভাবেই মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পাঁচ বছর আগে জল-হাওয়া-মাটিতে মিশে গেছে। এখন এই যে ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে ওর কত কষ্ট সে কার? আসল কথাটা বলা দরকার। বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর মতো আস্তে আস্তে পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, তোর জন্ম আটান্নর বাইশে ডিসেম্বর। রাতে। লীলার সেদিন মোটনিটিতে ডিউটি। আমাদের দুজনেরই তখন আদ্রা রেল হাসাপাতালে চাকরি। পরদিন সকাল আটটায় লীলা তোকে কোলে নিয়ে এসে হাজির। বলল, একে জন্ম দিয়ে মা-টা খুব কেঁদে চলে গেল। তো তুই আমাদের হয়ে গেলি। জন্ম যে দ্যায় সে জননী, আর মায়া যে করে সে মা। তোর ক্ষেত্রে মা ও জননী আলাদা। শুনে কি খারাপ লাগছে?

অলক ভয়ানক চমকে মাথা তুলেছিল। আবার আস্তে আস্তে পালক বাবার বুকে কান পেতে বলল, এসব কথা না জানালেই পারতে।

—সামনের শুক্রবার তোর আঠারো হবে। এখন নিজের ইতিহাস জানা দরকার। এই নে মনোরমা বারুড়ির ঠিকানা। বিয়ের পর হালদার। আমি চলে গেলে যখন খুব মন খারাপ করবে জননীর কাছে যাস।

ব্যস, এইটুকু। সেদিন বিকেল থেকে কথা বন্ধ। ক্যানসার ওয়ার্ডের সিসটার ওঁর মাথার কাছে একটা স্লেট ও পেন্সিল রেখেছিলেন। কিছু বলার থাকলে বা ডাক্তারের প্রশ্নের জবাবে লেখার জন্য। মারা যাওয়ার পর অলক ওই স্লেটটা দেখল। যদি শেষ কথা কিছু থাকে। একটা ফুল এঁকে রেখেছেন। তিনটি পাপড়ি। বাক্যহীন ভয়ানক ভয়ানক যন্ত্রণার ভাষা কি এই কুসুম? গভীর রাতে চলে গেছেন।

অলক বাড়িতে গাঢ় ঘুমে। রিং রিং। ফোন। সোমশংকরের ডাক্তারি ছাত্রের ভারি গলা। নিদারুণ উচ্চারণ। প্রাথমিক সান্ত্বনা।

শেষের কাজগুলি চুকে-বুকে গেল। খুব আশ্চর্য ব্যাপার এই—অলক হঠাৎ

বড়মানুষের মতো দেখেশুনে খরচ মেটাল। আপ্যায়ন করল। বাবার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শে বসল। আসলে ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে স্নেহ ও শাসন করার একমাত্র মানুষটার শোক ভুলে থাকতে চাইছিল। এই তো সেদিন ওই ডেক-চেয়ারটাতে বসে শীতের রোদে পিঠ দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। যেন এইমাত্র উঠে বাথরুমে। ঝর ঝর জলের শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটু গুন গুন। তারপর ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ডাকাডাকি—অলক আয়, পরিজ জুড়িয়ে যাবে। পরীক্ষার পড়া ঠিকমতো চলছে তো? না, আমি চেম্বারে গেলে সারাদিন বিশ্বকাপ চলে? কাল দেখলাম একটু খুঁড়িয়ে হাটছিস। মনে হয় পা বড় হচ্ছে। আজ চল নতুন জুতো কিনে ফেলি। ওকে আর দু'পিস অ্যাপলটার্ট দাও, মিসেস পারিখ। খা খা। বাড়তি বয়সে না খেলে চলবে কী করে? প্রত্যেকবার পরীক্ষার আগে তুই খুব রোগা হয়ে যাস রে। লীলা থাকলে আমাকে এতসব ভাবতে হত? মনে আছে অলক, সেই যেবার আমরা সিমলা গেলাম—রোপওয়েতে তোর কী ভয়! কিছুতেই নিচের পাহাড়-ঝর্ণার দিকে তাকালি না, লীলার আঁচলের তলে মুখ গুঁজে থেকে গেলি। বাচ্চা বয়সে পৃথিবীটা বোধহয় মা'র বুকে।

বাবার কাজের লোক, ড্রাইভার, এবং আয়া—হরিয়ানা আর রাজস্থানের। রাঁধুনী কিন্তু বাংলার। বহুকালের পুরোনো পদ্মপিসি। দুপুরের ঝালঝোল অম্বল ওঁর। ব্রেকফাস্ট মিসেস পারিখের। আসলে তিনি আয়া। অলক বড় হয়ে যাওয়ায় ওঁর আর কোনও কাজ নেই—তাই ধর গোছানো, আর সকালের টেবিল সাজানো। দুপুরে ভাত বেড়ে পদ্মপিসি বক বক করেন, দাদাবাবু মাছের পুর দিয়ে পটলের দোলমা রাঁধতে বলেছিল। ভাবলাম,অসুখ সেরে বাড়ি ফিরুক, করে দেবো। হল না। তার বদলে তুমি খেয়ো। ওঁর আত্মা শান্তি পাবে।

—বাবা তো আত্মায় বিশ্বাস করতেন না পদ্মপিসি।

—তা আত্মা না থাকুক পরাণটা পড়ে থাকে। হঠাৎ করে যেন গলার আওয়াজ শুনি। তার মানে কী? যে যায় তার সামনের দিনগুলি যায়। পেছনের চলাফেরা সুখ-দুঃখ সেসব তো মানুষের মনে মনে থাকে।

উনি বুড়ি হয়ে গেছেন—তাই আদ্যিকালের ধ্যান-ধারণা নিয়ে দিন কাটান। এসব আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে বাবার জায়গায় আমাকে বসিয়েছেন। হঠাৎ সমীহ পেতে শুরু করেছি। ড্রাইভার ছুটির আবেদন করে। সুইপার বখশিস চায়। ফোন করলে জলকলের মিস্ত্রি আসে। এই আঠারোয় একটা মৃত্যু অলককে বড় করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে একলা স্লেটের ফুলটা এক বৃষ্টি-বাদলার রাতে ওকে ভয়ানক কাঁদালো। হুহু হাওয়ার ঝাপট্ দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে ছল ছল জলে বাড়িটা কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এসময়, বাবার ভীষণ যন্ত্রণা পেতে পেতে আঁকা ফুল থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ উঠে এলো। প্রথমে মনে হল—সেই মৃত আঙুলগুলির প্রাচীন ঘ্রাণ। তারপর যেন রোদে বাচ্চাদের কাঁথা শুকোতে দেওয়ার ভাপ। আসলে বাবার জীবনের প্রতি শেষ মমতো, যার একটা দিকে জন্ম আর একটা দিকে মৃত্যু, স্লেটের ফুলে ফুটে আছে। ওঁর কথাগুলি মনে পড়ল—লীলা মায়ার বাঁধনে বেঁধেছেন তাই

মা, আর মনোরমা জন্ম দিয়ে জননী। যার রক্ত ধমনিতে বইছে তাঁকে কিছুতেই মনে করা যায় না। শুধু স্নেহ-কাঙাল-বালক ভেতরে ভেতরে কাঁদে। এই তো জননীর ঠিকানা। ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়। কেন যাব না? এদিককার সব বাঁধন কেটে গেছে। এখন সেই হারানো কোল ফিরে পেতে চাই। সিদ্ধান্তে পৌঁছে অলক মনে বড় প্রশান্তি পেল। শুধু একটা খট্‌কা—পালক বাবা কিন্তু জন্মদাতা বাবার কথা একবারও বলেননি।

এই প্রথম অলকের একা একা বাইরে যাওয়া। আর কত লম্বা ভ্রমণ। জয়পুর থেকে আদ্রা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে বাঁকুড়া এবং বি. ডি. আর ছোট লাইনে পাত্রসায়ের। ট্রেনের জানালা দিয়ে ছবির মতো গ্রাম, গাছপালা, আর কত নদীনালা দেখতে দেখতে এসেছে। ওর দেশ। এখানে মানুষের মুখের বুলি কত মিঠে। মোটমাট একটা গভীর ভালোলাগা ওকে নেশা ধরিয়েছে। পাত্রসায়ের স্টেশনে নামল বেলা ন'টায়। শীতের ঝলমলে রোদ। আঁকাবাঁকা সরু রাস্তার দু'পাশে চা, পান, তেলেভাজা, মাটি ও কাঁসার বাসন, আর চায়ের সরঞ্জামের ছোটছোট চাকচিক্যহীন দোকান। মূলত গ্রামীণ পণ্য সব। জয়পুরের সাজানো পণ্যবীথির সঙ্গে কত তফাৎ। একপাল গরুকে পথ করে দেওয়ার জন্য রিক্সা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ালে অলক একহাঁড়ি মিষ্টি কিনল। দোকানদার ওর চোখে-মুখে-পোশাকে ও ভাষায় স্বচ্ছল নাগরিকতার ছাপ দেখে বলল, মনে লয় আপনি ইদিককার নন। কোথাকে যাবেন বটে?

—মনোরমা হালদারের বাড়ি!

যারা ওকে দোকানদারের মতোই লক্ষ্য করছিল, তারা হাঁ হাঁ করে উঠল, মনো কীর্তনীয়া? তাই বলেন। আপনার মতো লোক ইখানে আর কার কাছে যাবেক?

এক যুবক গলা তুলে বলল, পরেশকা, গেল বছর উয়ার কাছে এক জাপানি মেয়্যাছ্যেলা কেত্তন শিখতে এয়েছিল না?

—কত লোকই তো আসে। কোকিলেন মতো মিঠে গলা।

অলক বুঝতে পারল, মাকে নিয়ে এখানকার লোকের গর্ব আছে। ওর বুক ফুলে উঠল। মনে মনে বলল, কালই জানতে পারবে—আমি বিদেশি নই, তোমাদের মনো কীর্তনীয়ার ছেলে। ওর তো এখানেই বড় হওয়ার কথা ছিল। না হই। এখানে বুড়ো হব। অলক সত্যি সত্যি ভেতর থেকে স্বদেশের জন্য একটা টান অনুভব করল। রিক্সাওয়ালা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। ওর মা'র কথা শুনে বলল, বড় মিঠে গায়। গোষ্ঠলীলায় আখর কেটে যখন যশোদা জননী গোপাল ফিরে আয় করে—তখন কার চোখে না জল? এস্যে গেলম। ওই যে, উয়ার বাকুল।

এত মানুষের প্রশংসা যাকে ঘিরে, তিনি না-জানি কত বিশাল। আহা, মা ওকে পেয়ে আত্মহারা হবেন। আয় হারানো গোপাল আমার। পিঠ ঢাকা লম্বা চুল, করুণাঘন চোখ আর মস্ত সিঁদুরের টিপে উজ্জ্বল মাতৃমূর্তি অলকের কল্পনায় চেহারা পায়।

মাটির ঘর, খড়ের চাল। সামনে গরু বাঁধা। পেছনদিকে তালগাছের ছায়া ঢাকা মস্ত পুকুর। আসলে এই বাড়িটাকে পাড়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

দুরু দুরু বুকে অলক দরজায় দাঁড়াল। কী বলে ডাকবে? মা দরজা খোল? হঠাৎ কেমন শোনাবে? জানালা একটু ফাঁক করে বছর চোদ্দর মেয়ে উঁকি দিয়েই সরে গেল। অলক তাকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, এই কি মনোরমা হালদারের বাড়ি?

—হাঁ বটে। মা ঘরকে নাই। রায়বাড়িতে অষ্টপহরে গেছে।

—তুমি ওঁর মেয়ে? তবে তো আমার বোন। দরজাটা খুলে দাও।

খুলল না। মেয়েটা, মানে ছবি, বোধহয় খিড়কি পথে বাইরে গেল। ওখান থেকে মিহি গলায় আওয়াজ এলো—অশোক। বছর আটেকের একটা ছেলে কোথা থেকে ছুটে এলে দুজনে পেছন দিয়ে ঘরে ঢুকে ফিস ফিস করে কথা বলল। গোয়ালের বেড়ার ঝিরিঝিরি ফাঁক দিয়ে ছাঁচাতলার পথে ওদের যাতায়াত অলকের চোখে পড়ছিল। মনে মনে বলল, দাঁড়াও না, আগে মা আসুক, তখন মজা দেখাবে। অশোক এবার সামনের দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

—আমি তোদের দাদা।

ভেতর থেকে বোনের গলা, আমাদের কোনও দাদা নেই। তুমি মিছে কথা কইছ।

অলক ভেবে দেখল—জোর খাটানো দরকার। সে-অধিকার ওর আছে। ভাইটার কোমর জাপটে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বলল—যা, মাকে ডেকে আন্। তখন টের পাবি, আমি কে।

এতে কাজ হল। সম্পূর্ণ অন্য পোশাক আর চেহারার এই মানুষটার জন্য অশোকের দারুণ কৌতূহল। মাকে ডেকে আনার কথাই তো বলছে। এমন একটা দাদা পাওয়া গেলে দারুণ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ভাই অলকের বশে এসে গেল। দুরন্ত ছেলেটা সারামুখে রসগোল্লার রসমেখে বড় মিঠে হয়ে উঠল। বলল, তুমি এতদিন কোথাকে ছিলে? কেন আস নাই?

ছবি আড়ালে-আবডালে থাকে। আর মাঝেমধ্যে চাপা গলায় অশোককে ধমকায়, যাঃ আরদিখ্যেতা করতে হবে নাকো।

তবে এই সুন্দর বিদেশি যুবক সম্পর্কে ওর বয়সী বালিকার সন্দেহ এবং আকর্ষণ দুটোই কাজ করছে। আচারের তেল দিয়ে মাখা এক বাটি মুড়ি ঠক্ করে সামনে নামিয়ে রেখে ধুপধাপ চলে যায়। অলক সেদিকে তাকিয়ে বলে, তবু ভালো যে, কিছু খেতে দিলি। ছবি, এরপর চা দে।

বোনটা ভারি বিরক্তি প্রকাশ করে, উড়ে এসে জুড়ে বসে, আঁচলেতে মুখ ঘষে। মুড়ি খাই চা খাই, এরপর বলবে ভাত খাই। ইঃ।

অলক খপ্ করে ওকে ধরে কাছে টেনে আনল। ছাড় ছাড়—বলে বোনটা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিন্তু ছাড়া পাওয়ার কোনও চেষ্টা নেই। চিৎকার করে বলে, তুমি আমাদের মিছে কথা বলে কেন কষ্ট দিচ্ছ?

—সত্যি সত্যি সত্যি আমি মা'র বড় ছেলে।

—তোমার কথা কোনদিন শুনিনি।

—বিশ্বাস না-হয় এখুনি আমাকে মা'র কাছে নিয়ে চল্।

—তাই কি আমি বসে আছি? বাগালটাকে দিয়ে খবর করেছি, একজন অচেনা

লোক এসে বসে আছে। মা পালা গাইতে লেগেছে। শেষ না করে ছেড়ে দিলে আবার গোড়া থিকে ধরতে হয়। তা ওবেলায় এসে যাবেক।

—বাবা কখন আস্‌বেন?

—ওমা, কেমুন দাদা গ, তাও জানো না? আজ কী বার?

—বুধ

—বিস্যুৎ শুক্কুর শনি। তার মানে তরশু বিকালে। বাঙরোয় চাকরি করে শনিবার এসে সোমে যায়।

ভাইটা বড় সরল। ওর সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হয়ে গেছে। বোনটা ঘরের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। প্রায় কাছে আসে না। অথচ লক্ষ্য রাখে। অশোক বলল, ও দিদি, নন্তু মুরলী গোভাদিদের খবর দি যে, আমাদের দাদা এসে গেছে।

অলককে শুনিয়েই স্পষ্ট করে ছবি বলে, থাম্‌, এখন কাউকে কিছু বলতে হবে না। মিছা হলে তখন লোকে আমাদের দুষবে।

যা-ই হোক, চোদ্দ বছরের বোন উনুন জ্বেলে রান্না চাপায়। অলক ওকে সাহায্যের নামে কেবল বাগড়া দ্যায়। অশোক আচমকা দাদাকে জাপটে ধরে অভিমান করে, তুমি খুব খেচর। হুঁ। এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে? আবার চলে যাবে?

না ভাই যাব না। কতকাল পরে রক্তের স্রোতের টানে ভাই-বোন-মা-বাবার কাছে এসে গেছি। নিজের মাটিতে থাকব। পুকুরে ঝাপাঝাপি করে এ ওর গায়ে জল ছিটাব, আর হঠাৎ রামধনু দেখতে পাব। জাম খেয়ে ঠোঁট আর মুখ কালো করে একটা অন্য গাছে পাখিকে নকল করে কুহু কুহু করব। এখানে এরা বড় গরিব। আমার সব টাকা মাকে দেবো। জয়পুরের মতো মস্ত বাড়িঘরে এয়ারকুলার। মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে ছবি..........স্লেটের ছবি থেকে সেদিন যে বাচ্চাদের কাঁথা রোদে দেওয়ার গন্ধ তা আবার এখানে সহসা ঘন হয়ে উঠল। মা-বাবার ঘরে নতুন করে ছেলেবেলা ফিরে এসেছে। এই যে ওর মিষ্টি ভাইটা, তাকে ও মনের মতো গড়ে তুলবে, সোমশংকরের মতো মস্ত ডাক্তার করবে, আর গাঁয়ের মেয়ে লাজুক বোনটাকে জয়পুরের মা লীলার মতো চৌকস রূপসী করে তুলবে। তিন ভাইবোনের কাছাকাছি হওয়ার জন্য সম্পর্কের টান তো আছেই। আরও প্রবল হয়েছে অশোকের নির্ভেজাল আত্মসমর্পণে এবং কচিমুখ বোনটার পালিয়ে বেড়ানোতে। এইটুকু ঘরের ভেতর তাকে কেবলই খুঁজতে হয়। এভাবে তিন ভাই-বোন আড়ি-ভাব, খেলা, গল্প, আর কাজে-অকাজে সারাটা দিন পার করল। অশোক দাদাকে ময়দার টোপ দিয়ে ছিপে পুঁটিমাছ ধরা শেখাচ্ছে। ফাৎনা ডুবু ডুবু। পেছনে বসে ছবি জলে একটা ছোট ঢিল ছুঁড়ে দিল তো মাছ তাড়িয়ে। অলক মুখ ফিরিয়ে ধমক দিতে যাবে, মেয়েটা আঙুল তুলে পুকুরের অন্য পারের ছায়া ঢাকা দিকটা দেখায়—ওই যে মা আসছে।

সেই দিকে অলক তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল। ওর কল্পনার মা'র সঙ্গে কোনও তফাৎ নেই। অশোক ছুটে আগাম সংবাদ দিতে যাচ্ছিল, অলক ওকে থামিয়ে দিল। আমি একা যাব। তোরা কেউ পিছু ধরিস না। মাকে আমি প্রথম দেখা দিয়ে চম্‌কে দেবো। লম্বা লম্বা পা ফেলে মনোরমা হালদারের সন্তান প্রথম জন্মদিনের পর মা'র

মুখোমুখি হোল। পা ছুঁয়ে ডাকল, মা।

বড় গভীর ডাক। কীর্তনীয়ার ভেতরটা কেঁপে উঠল। গোষ্ঠীলীলাই গাইছিল। গোধূলি বেলায় গোপালের পথ চেয়ে মা'র ব্যাকুলতার পদ। তুমি কে বাছা? খবর পেলাম একজন আমার অপেক্ষায় বসে আছে। তাই তাড়াতাড়ি শেষ করে উঠে আসছি।

—চিনতে পারলে না? মা, আমি অলক। ডাক্তার সোমশংকর রায়ের কাছে আমাকে ......মনে পড়ছে? মনোরমার ভেতরে ভয়ংকর ঝড়। চোখে বাদল। অস্পষ্ট কুহকের মতো বলল, এত দিন পর? সোমশংকরের ছেলে আমাকে দেখা দিতে এলি? আয় আমার হারানো মাণিক বুকে আয়।

জন্মের পর যাকে পর করেছে—আঠারো বছর পর জননী তাকে বুকে টেনে, কপালে চুমু খেয়ে, চুলের ঘ্রাণ নিয়ে, দু'হাতে মুখ তুলে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গোধুলির আলোয় দেখছিল। দূরে কোথাও গরুর হাম্বা-রব আর ঝোপঝাড়ে পাখিদের তুমুল কিচিমিচি মা ও ছেলের আঠারো বছরের কত মান-অভিমান স্নেহ ও শাসনের জমে থাকা কথাগুলির মতো জট পাকিয়ে আছে। অলকের মনে হল, মা যেন এবার ওকে ঠেলে দিল আর বলল, কেন এলি?

—এখানে তোমার কাছে থাকব।

—কে তোকে আমার কথা বলল? সোম ডাক্তার?

—হ্যাঁ। মারা যাওয়ার আগে বলেছেন—ওঁদের তো ছেলে নেই, তাই তুমি দত্তক দিয়েছ।

—কথাটা মিছে নয়, আবার পুরো সত্যিও নয়। ওরা দুজনেই ডাক্তার। লীলাদির কোনওদিন কোল ভরবে না, একথা ওদের জানা ছিল। তাই আমাকে বেছে নিলেন। তুই আমার কুমারী বয়সের। তখন আমি সোম ডাক্তারের চেম্বারে কাজ করি। গরিব ঘরের মেয়ে। বর জোটে তো পণের টাকা জোটে না। লীলাদি বললেন, তোর ভাল বিয়ে দেবো যদি........এসব শুনতে কি তোর খারাপ লাগছে?

অলক চুপ করে রইল। একই প্রশ্ন সোমশংকর ওকে করেছিল। বড় উদাসভাবে মা আবার বললেন, দাগ মুছে ফেলে এই যে সংসার পেতে বসেছি—সে তো সোম ডাক্তারের বউ লীলার জন্য। কথাটা চিরকাল গোপন থেকে যেত, যদি তুই না-আসতিস। তোকে ফিরে চাইলে সব চুরমার হয়ে যাবে। দয়া কর, দয়া কর বাছা, এখুনি ফিরে যা! আর কোনদিন আসিস না। সোম ডাক্তার তার নিজের ছেলেকে মানুষ করেছে।

তা-ই করল অলক। ভাই-বোন যাতে ওকে দেখতে না-পায়, তেমন করে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে গাছপালার আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পালাল। চোরের মতো। ওরা জানবে, একটা খারাপ লোক বদ মতোলব নিয়ে এসেছিল। দাদা সেজে কী সর্বনাশ করত। মাকে দেখে কেটে পড়েছে। জানুক। কিন্তু একটা বেলা অলক ভাই-বোন পেয়েছিল। ছবি আর অশোক ওকে অনেক দিয়েছে।

বাতাসিয়া লুপ

সুদর্শন উঠি উঠি করছিল। রাস্তাটা যেখানে ঢালু হয়ে মকাইবাড়ির দিকে নেমে গেছে সেখানে একটা চওড়া পাথর সেই কবে থেকে একইভাবে অচল অনড় হয়ে আছে। কার্শিয়াং এলে বেড়াতে বেড়াতে এই পর্যন্ত এখানে এসে কিছুক্ষণ বসে তারপর ফিরে যায়। এবার এসেছে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর।

সকালে অনেকেই পাহাড়ী তাজা হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। এখানে লোকে স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে আসে। তবে সংখ্যায় কম। অধিকাংশ যায় দার্জিলিং নয় কালিম্পং নয় মিরিকে। কার্শিয়াং-এ দেখার মতো তেমন কিছু নেই। তাই নির্জন। খুব একটা পাল্টায়নি। প্রথম এসেছিলেন উনিশশ চৌষট্টিতে। তখন বয়স ছিল আটাশ। এখন আটান্ন। এই বোধহয় শেষ আসা। উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক ভারী চেহারার মহিলা বাঁকা ঘাড়ে ওকে দেখলেন ও কয়েক কদম দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরলেন। এত বছর পরে এখানে পুরোনো চেনা-জানার কিছু কি অবশিষ্ট আছে? সুদর্শন ভেবে পেল না। চোখের নজরও কমে এসেছে। কে হতে পারে? কাজেই চশমার কাচ মুছে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ওদিক থেকেও তাই। তিরিশ সেকেণ্ডের চোখাচোখী। মহিলাই এগিয়ে এলো।

—তুমি না?

সুদর্শন চমৎকৃত হল—আরে তাইতো। কি আশ্চর্য। হ্যাঁ আমি।

নাম না করে এভাবে কেউ পুরোনো পরিচয় ঝালিয়ে নেয় না। কিন্তু এককালের স্বামী-স্ত্রী সাবেকী অভ্যেসমতো তুমি ও আমি দিয়ে পরস্পরকে চিনে ফেলল। মীনা আগেকার মতোই সপ্রতিভ। গাল থেকে চূর্ণ চুলের গোছা কানের পাশ দিয়ে পেছনে ঠেলে দিতে দিতে বলল, তাই বল। এই পাথরটার ওপর না বসলে চিনতে পারতাম না। সেই প্রথমবার এসে যেমন বসতে। তুমি ছাড়া আরতো কাউকে এমন অদ্ভুত জায়গায় জিরুতে দেখি না।

তা ঠিক। বিয়ের পর সুদর্শন মীনাকে নিয়ে কার্শিয়ং-এ এসেছিল। এই প্রথম যৌথ পরিবারের বাইরে পরস্পরকে অনাবিল পাওয়া। সেসব কথা মনে করে কি হবে। সুদর্শন উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে এলে। ক'দিন আছ?

—কাল এসেছি। সাত দিনের ছুটি। যাতায়াত বাদে পাঁচ দিন থাকব।

—আমিও কাল। তবে থাকাটা পাঁচ দিনের চেয়ে বেশি বা কম হতে পারে। ভাল লাগলে থাকব না হলে না। এখন তো আর ছুটি নেওয়ার প্রশ্ন নেই।

—তা বটে। গত ডিসেম্বরে রিটায়ার করলে তাই না?

—ঠিক। হিসাবটা মনে রেখেছ দেখছি।

—এ আর কঠিন কি? জন্ম তারিখটা জানা থাকলে যে কেউ হিসাব করে দিতে পারে।

নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু ওর জন্ম তারিখ মীনা যে ভোলেনি এটাই সহজ কথা। মনে মনে লজ্জিত হল এই ভেবে যে মীনার জন্ম তারিখটা ওর মনে নেই। তবে নামের বানানটা স্মরণে আছে। ম এ ঈ। মীন মানে মাছ। ছিল এক সরোবর স্তব্ধ গভীর। মীন তাতে খেলা করে চমকায় নীর। সখা পত্রিকায় এই কবিতাটা পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। বিশেষ চমকায় নীর। কালো গভীর জলে রুপোলি ঝিলিক। রহস্যের সামান্য এক প্রকাশ। তখন মীনার ভাবে-ভঙ্গীতে হঠাৎ গভীর কিছু ফুটে উঠত পেটে পেটে কি ছিল বুঝতে দেয়নি। ওসব নিয়ে এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। দেখা যখন হয়েছে ভদ্রতা করে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত।

—কোথায় উঠেছ?

—নাগবাবুর গেষ্ট-হাউসে।

ওটা একটা পারিবারিক হোটেল। এমন মরসুমে কিছু উপার্জনের জন্য। চারটা ঘরের মধ্যে দুটোতে অতিথি রাখার ব্যবস্থা। রান্না নাগগিন্নীর। সুক্ত, আলুপোস্ত, কুচোমাছের চচ্চরি এসব ঘরোয়া খাবার-দাবার। স্নানের জন্য গরম জল। টেবিলে ফুল। শোবার ঘরে ধুপ। আত্মীয়ের মতো সেবা। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে ঘরোয়া গল্পগুজব। সেসব কথা মনে আছে সুদর্শনের। আর একটা কথাও মনে আছে। মীনা বলেছিল ওরা বোধহয় পালিয়ে এসে এই নির্জন সংসার পেতেছে। বেশ আছে তাই না?

—আমি উঠেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে। নাগবাবুরা ভাল আছেন তো?

—দুজনের কেউই বেঁচে নেই। ওদের ছেলে ওই যে গাবদা গোবদা ছেলেটা ও এখন চালাচ্ছে। রান্না করে নেপালি বউ মনমায়া।

—ওমা তা হলে তো অনেক বড় হয়ে গেছে।

—হবে না? মাঝে যে তিরিশটা বছর চলে গেছে গো।

—তাই তো। কোন দিক দিয়ে যে বছরগুলি পালায়। কিছুই ধরে রাখা যায় না।

—প্রকৃতির নিয়ম। তোমার কিন্তু সব চুল পেকে গেছে।

—তোমার পাকেনি। তবে চর্বি জমিয়ে ফেলেছ। গলায় ভাঁজ পড়ে।

—মীনা খিক খিক করে হাসল। মুটকি বুড়ি হয়ে গেছি তাই না?

—না না, তাই বলেছি আমি? চেহারা ভালই আছে। একটু ভারিক্কী হয়েছে। এই দেখ কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। আমার আবার সাতটায় একটা ওষুধ খাবার কথা।

—আমাকেও যেতে হবে। ওঁরা আমার জন্য ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে থাকবে। একটু ইতস্তত করে মীনা আবার বলল, আচ্ছা, সেদিন তুমি হুস করে কোথায় চলে গেলে?

সুদর্শন বিস্মিত হল, কবে?

—ওই যে কোর্ট থেকে বেরিয়ে। এই দেখলাম এই নেই। কাটা ঘুড়ির মতো হাওয়ায় ভেসে গিয়েছিলে নাকি?

সুদর্শন মনে করার চেষ্টা করল। হ্যাঁ ট্যাক্সি ধরে হাওড়া স্টেশন। তারপর বাগনানে পিসির ওখানে। কাটা ঘুড়ির উপমাটা বেশ দিয়েছে মীনা। বিয়ে বিচ্ছেদের রায় মানেই

তো সম্পর্কের সুতো কেটে যাওয়া। দুম করে দায়হীন ভারহীন হয়ে যাওয়া। ঢোক গিলে বলল, হুঁ আমি আর অপেক্ষা করিনি। ওর পরে আর কে কার জন্য অপেক্ষা করে?

মীনার গলায় একটু বিষণ্ণতা, না তা করে না। তবে তোমার দরকারেই খুঁজছিলাম। বড় আলমারির চাবিটা আমার কাছে থেকে গিয়েছিল। ওটা খুললে কি করে?

—ভেঙে।

—ইশ্ আমার সখের জিনিসটা ভাঙলে? ভেবেছিলাম নিজেই গিয়ে দিয়ে আসব। আমার উকীল না করলেন। বললেন বিচ্ছেদ একটা শক। মাথা গরম হয়ে থাকে। তারপর চোখে-মুখে কৌতুক ফুটিয়ে কথাটা শেষ করল। তাছাড়া তখন তুমি পর পুরুষ আমি পরনারী। গায়ে হাত দিলে চরিত্র নষ্ট হত না?

সুদর্শন ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, ছিঃ মীনা এসব কথা ভেবেছিলে তুমি?

মীনা খুব হো হো করে হাসল। বললাম না, আমার কথা নয়। উকিলের কথা। শুনে তোমার মজা লাগছে না? দেরি হয়ে গেল। যাও হোটেলে গিয়ে ওষুধ খাও।

সেদিন এ পর্যন্তই। হোটেলে ফিরে এসে সুদর্শন ডাক্তারের নিষেধ ভেঙে সকালে ডবল-ডিমের ওমলেট, দুপুরে মটনকারি ও রাতে সন্দেশ খেল। তারপর নোটবুক খুলে মোটামুটি একটা হিসেব করে ফেলল। আজ থেকে প্রত্যেক দিন এর চেয়ে ভাল হোটেলে ওর পছন্দের সমস্ত খাবার-দাবার খেয়ে একশ বছর বয়সে মরে গেলেও একলাখ উনষাট হাজার টাকা হাতে থেকে যাবে। হিসেবের ভাষায় যদিও ক্যাশ ইন হ্যান্ড। কিন্তু হাত কথাটায় একটু ধাঁধা থেকে যাচ্ছে। মরা মানুষের কি হাত থাকে? তা হলে? একজন উত্তরাধিকারীর কথা মনে পড়ল। কিছুই আমি জানতে চাইনা বলে গোঁ ধরে বসে থাকলে বোধহয় চলবে না। খাতা বন্ধ করে যথাসময়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম আসার আগে কিছু ছবি ওর চোখে ভেসে ওঠে। যেগুলি স্বপ্ন নয়। অথচ স্পষ্টে দেখা যায়। সবই বালক বয়সের। যৌবনের একটাও নয়। গাঁ ঘরে সেই এক মেঘলা দিন। সব কিছু ঝাপসা। জলে জল পড়ায় ঝিমঝিম উজিয়ে ওঠা একটা কৈ কানে হেঁটে কি বিশাল মাঠ পার হচ্ছে পার হচ্ছে পার হচ্ছে...

মীনা নাগবাবুর গেষ্ট-হাউসে ফিরে দুধ ছাড়া তিন কাপ চা আর এক পিস টোষ্ট খেয়ে উঠে পড়ল। তুষারের নেপালি বউ মনমায়া বলল, আজ খুব পরেশান হয়েছেন আন্টি?

—না মনমায়া। যদিও অনেকটা হেঁটেছি তবু আমার কোনও ক্লান্তি নেই। আমি খুব ভাল সাঁতারু ছিলাম। প্র্যাকটিস রাখলে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হতে পারতাম। ডুব সাঁতার কাকে বলে জানো?

—না। আমি তো সাঁতারই জানি না।

—এই এপাড়ে ডুব দিয়ে ওপাড়ে গিয়ে হুস করে ওঠা। যাওয়াটা চোখেই পড়বে না।

মনমায়া ভাবল এই দারুণ জায়গাটায় উৎসাহ ব্যঞ্জক হাততালি দেওয়া দরকার। ও তাই করল। সাত-আট বছরের ছেলেটা শুনে মার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।

—আন্টি ডুব দিয়ে নদী পার হয়েছেন।

মীনা একটু বিরক্ত হল। বোঝেনা-সোঝেনা অথচ খুব স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে মেয়েটা। আসলে আমি এখনো ডুব সাঁতার দিয়েই যাচ্ছি। কোথাও পৌঁছাবার আগেই দম ফুরিয়ে আসছে। আর যে পারছি না। ছেলে অরনি টরেন্টোয়। কানাডার নাগরিক। কোনদিন ফিরে আসবে না। এর আগের চিঠির খামে নাতনী লোলার ফটো পাঠিয়েছিল। দুষ্টু দুষ্টু চোখ। কি নধর। বুকে চেপে ধরতে পারলে প্রাণ ঠান্ডা হত। উপায় নেই। ভবেশ রাজনীতি থেকে ছিটকে গিয়ে এখন শুধু সমালোচনা করে দিন কাটায়।

সেদিন বলে কি আমি নাকি ওর পিছুটান। আমার জন্যই পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করেছে। এসব কিসের হাহাকার? তাহলে আমি কি করেছি? বিকেলে আলুবোখরা গাছের নীচে বসে এসব ভাবতে ভাবতে আলো আস্তে আস্তে কমে আসছে। পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘ হয়ে ইতিমধ্যে ডোরার ভেতর অন্ধকার ঘনিয়ে তুলছে। টইটম্বুর হয়ে গেছে। রাত্রি উপচে উঠে আসবে। পাহাড়ী রাত ঢল নামার মতো হুড়মুড় করে আসে। মীনা মনে মনে বলল জীবনের শেষবেলায় আমার কোনও অভিযোগ নেই। ভেবেছিলাম যা কিছু করেছি বিপ্লবের জন্য। সংসার ত্যাগের চেয়ে বড় কি দিতে পারতাম? তখন কি জানতাম গোড়াতেই মস্ত ভুল?

সকালে দুভাগ হওয়া রাস্তার মোরে এসে সুদর্শন দেখল ওর আগেই মীনা সেই পাথরের ওপর বসে আছে। কাছে এসে একটু শুকনো হাসল, আজও একা দেখছি?

মীনা বলল, তুমিও তো তাই।

—আমার তিন কুলে কেউ নেই। কে থাকবে সঙ্গে? তোমার তো তা নয়। ছেলে কোথায়?

—টরেন্টোয়। চাকরি-বাকরি বিয়ে থা করে ওখানেই আছে।

—ভালই মানুষ করেছ দেখছি।

—একটা বলেই পেরেছি। আমার সামান্য বেতনে টেনেটুনে অনেক কষ্টে ছেলেটাকে উপরে তুলে ধরতে পেরেছি এটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সময় ওর বয়স তিন। শিশু বলে মার হেপাজতে থাকার হুকুম মিলেছিল। পার্থ যত বড় হয়েছে তত আমার ভয় পেড়েছে কি জানি কবে কেড়ে নাও।

—আজ যদি চাই?

—লাভ কি? ও এখন কারো নয়, নিজের।

—না মানে আমার কিছু টাকা পয়সা আছে। মরে গেলে ওরই তো পাওয়া উচিত।

—অচেনা কারো কাছ থেকে পার্থ নেবে কেন? দুজনের কোথাও দেখা হলে কেউ চিনতে পারবে? তাছাড়া ও জানে ওর বাবা নেই।

—আর একজন তো বাবার ভূমিকা নিতে পারত?

—বাঃ চমৎকার কথা বলছ। সুভাষ কেন পরের ছেলের বাবা হতে যাবে?

—না মানে তোমার স্বামীতো?

—আমার নেতা। ঘর-সংসার দেখার সময় ছিল ওর? হয় জেল নয় মাঠে

কারখানায় লড়াই। ভেবেছিলাম এমন একজন লোকের পাশে দাঁড়ানো একটা মস্ত কাজ। সে কথা তোমাকে স্পষ্ট করেই বলেছিলাম সুদর্শন। কিন্তু তুমি—

সুদর্শন কিছু বিচলিত বোধ করল। সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, বাসী কথায় কাজ কি? ও বয়সটাই চলে গেছে। এখন কারো ওপর আমার কোনও ক্ষোভ নেই।

—বরং এই হঠাৎ দেখা হওয়ায় আনন্দই হচ্ছে। কাল সুভাষকে সঙ্গে এনো।

—একাই এসেছি। সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো ওর ধাতে নেই।

—ঠিক আছে। কাল ভোরে চলে এসো। এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমারা পাগলাঝোরার দিকে যাব।

—সে তো অনেকটা পথ। তা হোক। আগেকার মতো এখন পারবে তো?

দুজনেই হেসে উঠল। সে এক কান্ড। ঝোরায় ওরা স্নান করেছিল। গর্জন করা জলের নীচে মাথা পেতে। মীনা ভয় পাচ্ছিল। সুদর্শন ওকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নেমে গিয়েছিল। পা হড়কে গেলে মারাত্মক হতে পারত। সুদর্শন বলল, স্নানটা না করতে পারি। পাড়ে বসে পিকনিক করা যায়।

মীনা বলল, বেশ হবে। পরশু গীদ্দা পাহাড়ে। তারপর দিন স্যানেটোরিয়ামের দিকটা। আমি ডিম সেদ্ধ কলা আর টোস্ট নিয়ে আসব। মনমায়াকে রাতেই বলে রাখা যাবে। আর হ্যাঁ এক ফ্লাস্ক চা। চিনি খাও?

—কাল খাব।

—তা হলে সে কথাই রইল।

পাইন গাছের ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁক দিয়ে স্মিত রোদ ফুটিফুটি হচ্ছে। ওরা দুরাস্তায় দুজনে চলে গেল।

ফিরতি পথে দার্জিলিং মোরে সুদর্শনের কানে এলো কালিম্পং কালিম্পং। ও থমকে দাঁড়াল। একটা ল্যাণ্ডরোভার। কালিম্পং যাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করছে। প্রথমবার এসে কালিম্পং যাওয়া হয়নি। দেখা বাকি থেকে গেছে। ওখান থেকে সিকিম স্টেট- বাসে গ্যাংটক যাওয়া যায়। পৃথিবীতে কত ঘোরার জায়গা। দেখার শেষ নেই। পায়ে পায়ে গাড়িটার কাছে এগিয়ে হাঁক ডাক করা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, কটায় ছাড়বে?—আটটা কুড়ি। তার মানে আর পঁচিশ মিনিট।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সুদর্শন হোটেল নিজের রুমে উঠে গেল। কিছুই না ভেবে দ্রুত এটাচি গুছিয়ে নিয়ে আচ্ছন্নের মতো ম্যানেজারের কাছে বিল মেটাল। এবং দশ মিনিট পরে ল্যাণ্ডরোভারের জানালা দিয়ে যথাসম্ভব ঝুঁকে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে একটা রুপালি জলের দাগ দেখতে পেল। হিমালয়ের গালে পাগলাঝোরার ধারাপাত। পুলকিত হল সুদর্শন। পাক খেয়ে নামার পথে আরও একবার দেখা দেবে। বাকি দিনগুলির জন্য এই ছবি ওর মনে ফিরে ফিরে আসবে। বাতাসিয়া লুপের মজাটা এই ফেলে আসা আগের জিনিস যেতে যেতে সামনে দেখা দেয়। মনটা একটা অজ্ঞাত অভূতপূর্ব সুরে ভরে গেল এই ভেবে যে কাল মীনা ওর জন্য অপেক্ষা করবে। বসে থাকতে থাকতে বেলা বাড়বে। বিরক্তি ও আশঙ্কা নিয়ে উঠে যাবে একসময়। যেমন মীনার জন্য ও সেই আদ্যিকালে পথ চেয়ে বড় কষ্ট পেয়েছিল।

জিনা

মুনিয়া স্লেটের ওপর পেন্সিল ঘসে বলল, এই করলাম চিল। শুনে আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সত্যি। একটা চিল চক্কর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। অত উঁচুতে বোধহয় সাঁই সাঁই হাওয়া। মুনিয়া আবার বলল, নাহ্ মুছে ফেলি। ভাল হয়নি। অন্য একটা আঁকছি। কি আশ্চর্য! কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ এসে পাখিটা ঢেকে দিল। এসব ছেলেবেলার কথা। তখন স্লেট-পেন্সিল চালু ছিল। ঘাসের ওপর গোল হয়ে সুরেলা নামতো পড়লাম। মুনিয়ার খুব ছবি আঁকার ঝোঁক। ঝিমন্ত মাস্টার মশাইয়ের চোখ এড়িয়ে স্লেট আঁকিবুকি করত আর আমাকে দেখাত, এবার একটা মোষ করছি। আমি মাঠের দিকে চেয়ে চোখ কচলাই, কোথায়?

—ওমা, হয়েছে নাকি? এইতো সবে শিঙ এঁকেছি।

এবার আমি দেখতে পাই। মানার ঝোপ ঠেলে শিঙ তুলে একটা মোষ বেরিয়ে আসছে। মুনিয়া বোধহয় টের পেল আমি হাবলার মতো আকাশ আর মাঠ দেখছি। ধমক দিয়ে বলল, আমার দিকে তাকা।

মুনিয়া নোলক পড়বে। তাই ছ্যাঁদা করে নাকে হলুদ ছোপানো সুতো বেঁধে দিয়েছে। পাক খেয়ে আছে। বড় হলে ওদের নোলক পড়তে হয়। হ্যাঁ মুনিয়া আমাকে বলেছেতো নোলক না পড়লে বিয়ে হয়না। এখন ওর কচি কলাপাতা লম্বাটে মুখটা দেখতে অন্যরকম লাগছে। এতদিন পর ওই প্যাঁচ খাওয়া হলদে সুতোটাই মনে আছে। মুনিয়ার ছিরি ছাঁদ ভুলে গেছি। কতবার চেষ্টা করেছি। আসে না।

অথচ—

দাদা মারা গেল এক বাগানময় গাঁদা ফোটা শীতের দুপরে। আমার তখন চৌদ্দ বছর বয়স। মৃত্যু কেমন সে সম্পর্কে ধারণা নেই। ডাক্তার আসে-যায়। লণ্ঠন ঝোলানো বারান্দায় বাবা পায়চারি করেন। সঙ্গে ছায়া ঘোরে। তার আবার অর্ধেকটা দেয়ালে, বাকি আধখানা মেঝেতে। দেখে মনে হয় কোমর ভাঙা। এক সময় দাদার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, জ্বর কত দেখলে? মা ভেজা গলায় জবাব দেন, এই দেখছি। এত ঘামছে কেন? বৃষ্টির মতো ফোঁটা ফোঁটা নামছে, বাবা বললেন, তা হলে বোধহয় ছেড়ে যাবে। এই রাতটা কাটলে উনচল্লিশ দিন। ভোর হওয়ার আগেই ছোটাছুটি আরম্ভ হল। ভাঙা ভাঙা ঘুমের ভেতর আমি অনেক পায়ের শব্দ আর চাপা গলার আওয়াজ পেয়েছিলাম। পিশি ঠেলা দিয়ে বলল, বাবলু ওঠ, সুমর অবস্থা ভাল না। আমি নিশ্চয় খুব পাপী। পিশি, পিসেমশাই, নন্তু, কাজল, ডলি এবং পরশীদের ভিড়ের মধ্যে কেমন মেলা গন্ধ পাচ্ছিলাম। ওই যে তাঁবুর ভেতর অজানা কত কি থাকে। পর্দা সরানো মাত্র কাটা মুণ্ডু কথা কয়ে ওঠে। মাকড়শা বালক আট পায়ে হামাগুড়ি দেয়। তেমন রহস্যময় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সকাল গড়িয়ে

দুপুর এসে গেল প্রায়। এত দেরী কেন? দাদার মৃত্যুর জন্য আমি অধীর অপেক্ষা করছিলাম। একসময় লঞ্চের গায় জোয়ারের ছলাৎ ধাক্কা লাগার মতো মা চিৎকার করে উঠলেন। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে দাদার ঘর শূন্য হয়ে গেল। ভেজা মেঝেতে পা টিপে হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা মানুষের না থাকার শূন্যতা অনুভব করছিলাম। কেমন ভারী হাওয়া। দাদা চলে গিয়ে কি শরীরের ভার ফেলে গেছে? ক'দিন আর হবে, অসুখে পড়ার প্রথম দিকে এক বিকেলে বাদামআলা হাঁক দিয়ে যাচ্ছিল। জানলার দিকে মুখ রেখে আমি খুব আস্তে করে বলেছিলাম, দাদা। ও আমার মুখের দিকে একপলক কি দেখল কে জানে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, ঠিক আছে, ডাক, ওই যে আমার নীল শার্টের পকেটে পয়সা। মা দাদার বিছানায় বাদামের খোলা দেখতে পেয়ে বকেছিলেন, কোন আক্কেলে টাইফয়েডের মধ্যে ছাইপাশ খেলি? যদি কিছু হয়?

সেই হওয়াটা কি এই? আর কোনদিন দেখতে না পাওয়া? যাঃ তা হবে কেন? দাদা তো মাত্র কয়েকটা! সবই আমি খেয়েছি। প্ররোচনা আমার। সামান্য কয়েকটা বাদাম যদি মৃত্যু বীজ হয়ে থাকে তো তা দাদার হাতে তুলে দেওয়ার অপরাধটা আমার। আমার কাছে এই মৃত্যু একটা পাপবোধ। কোথায় একটা ভুল একটা লোভের সর্বনাশ থেকে গেছে। এখন তার চেহারাটা আলো নিভে যাওয়া সন্ধ্যার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমি মার গলাভাঙা কান্না আর হাওয়ার শোঁ শোঁ শুনছিলাম আর তখনি জানলার ফ্রেমে আটকানো মনিয়ার প্লেটের মতো কালো আকাশে একটা মাত্র তারা ফুটতে দেখলাম। একেবারে নতুন তারা। আজ সন্ধ্যায় হল। জন্মালে তারা খসে, মরলে ফোটে।

আমার কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল মুনিয়াতো পোটোর মেয়ে। ও যা আঁকে তাই হয়। একটা তারা আঁকা বা মুছে ফেলা ওর কাছে কিস্সু না।

পাঠশালা ছাড়ার পর হাইস্কুলে পড়ছি। মুনিয়ার পড়া শেষ। তবু ও সকালে আমাদের বাড়িতে আসে। পুরনো ব্যাগের মধ্যে ছেঁড়া-খোঁড়া বই আর স্লেট। পড়ার খুব সখ। টেবিলের উলটো দিকে বসে আমার একটা বই টেনে পড়তে থাকে। মা গলার আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করেন, কিরে তুই হাইস্কুলে ভর্তি হলি?

—না মাসিমা

—তবে?

—এমনি পড়ছি

—এমনি পড়ে কি হবে?

—ভাল লাগে। বাবুলের নতুন বইগুলির কি মিষ্টি গন্ধ। কত কি জানার। এই যে শোনো না 'ক্রমে খালি চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র প্রাণী প্রোটোজোয়া থেকে মাছ, তিমি, গাছপালা, সাপ-পাখী, কীট-পতঙ্গ, বাঁদর এবং মানুষ। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব ও উদ্ভিদের বিকাশ। ডারউইন বলেছেন প্রাণী জগতে বাঁদর মানুষের নিকটতম আত্মীয়।' হিঃ তেঁতুল গাছে যে গোদা বাঁদরটা আছে তাকে কাকু ডাকলে তেঁতুল দেবে?

শুনে আমি হি হি করে হাসছিলাম। মা কিন্তু ধমক দিয়ে উঠলেন, এসব শিখে তোর লাভ? লেডি ডাক্তার হবি? খামোকা রোজ সকালে এসে বাবুলের পড়া নষ্ট করিস কেন?

মুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কিরকম হিংস্র চোখে মার দিকে চাইল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, বাবুল তোমাকে মাস্টারী করতে হবে না। নিজের পড়া কর। সেই যে পোটার মেয়ে স্লেট নিয়ে চলে গেল আর এলো না। এসব দাদার মৃত্যুর তিন বছর আগের কথা। মাকে আমি বলিনি মুনিয়া রাগ করে আঁকলে একরকম, ভালবেসে আঁকলে অন্যরকম। কিছুদিন পর শুনলাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে। শেষ দেখা সেই যেবার বহরমপুর কলেজে ভর্তি হলাম। পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরছি। বেলা যায় যায়। বাস থেকে নেমে রাস্তা সংক্ষেপে করার জন্য মেঠো পথ ধরলাম। খেড়িয়া পুকুরের পশ্চিমপাড়ের ঘন ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ডাক এলো, এই বাবুল। আমি চমকে উঠেছিলাম, মুনিয়া তুই?

—হ্যাঁরে আমি পেত্নী নই। এখানে খুব সুনসান ঝুপসী আড়াল। আয় না?

—তুই উঠে আয়। খুব খারাপ জায়গা। লতা-টতা থাকে।

—আমাকে দেখে পালিয়েছে সব। আয় একটু বসে যা।

—অনেকদিন পর তোর সঙ্গে দেখা হল রে মুনিয়া।

—তাও তো না দেখে চলে যাচ্ছিলি। ডাকলাম তাই এলি।

—মাইরি আমি দেখতে পাইনি।

মুনিয়া খপ করে আমার হাতটা ধরে হেচকা টানে পাশে বসিয়ে দিল। তারপর চাপা গলায় সেই অদ্ভুত গানটা গাইল, মাইরি বলে মুচকি হেসে গায়ে পোড়নো......

আমি বললাম, এই মুনিয়া থাম। এসব কি গান শিখেছিস? শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তুই বড্ড পালটে গেছিস রে।

—পালটাব না? কত্তোদিন পর দেখা হল।

—হুঁ। সেই যে তুই চলে গেলি তারপর এই। ও আমার শরীরে লেপটে গেল। ঘামে ভেজা কাঁধের ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, আরও পালটে যাব। আমার মাছ হতে মন হয়েছে। আমার সঙ্গে জলে নামবি?

—ধ্যাৎ, এই অবেলায়? ভিজে প্যান্টে বাড়ি ফিরব?

—আয় পাড়ে খুলে রেখে নামি। কে আর এখন দেখতে যাচ্ছে? কাউকে বলিনি। মাকেও না। ওরা আমাকে বড্ড মারে।

আমার গা শিরশির করে উঠল। জলে মাছের মতো নয়। সেই ঝোপে আমরা ঢেমনা আর গোখরোর মতো জরাটাপটা খেললাম। তারপর আস্তে আস্তে শরীর আলগা করে ও ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে রইল। তখন আমার সেই পুরনো পাপবোধ ফিরে এলো। খেড়িয়ার শ্লেট কালো জলে অস্ত মেঘের ছায়া রঙের ওপর রঙ বোলাচ্ছে। অসম্ভব জটিল একটা ছবি হয়ে উঠতে উঠতে ঝপ করে অন্ধকার। মুনিয়া বলল, বেশ হল। এভাবে আমি শাস্তি দিলাম।

—কাকে?

—ন্যাকা। সেই লোকটাকে। ইচ্ছে করে ঘরে আগুন দি। মুনিয়ার কাঁধে হাত রেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম ভাবিস না। আমি আছি। মেয়েটা আমার হাতে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বড় অলস ভঙ্গিতে শাড়ি জামা ঠিকঠাক করে এলোচুলে গুছি বেঁধে খোঁপা জড়াল। তারপর বলল, বাড়ি যা। তোকে আমার যতটুকু দরকার মিটে গেছে।

এই শেষ। আর কোনদিন দেখা হয়নি। কত জায়গায় ঘুরলাম। যৌবনের প্রান্তে এসে ঠেকেছি। মুনিয়ার ছিরিছাঁদ কিছুই মনে নেই। অনেক চেষ্টা করেও ফোটাতে পারি না। চোখের ভেতরের চোখে কেবল সেই পাক খাওয়া সুতোর ডগাটা ভেসে উঠে। অথচ কেমন অস্পষ্টভাবে ওকে টের পাই। আমাকে ওর যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু। বিয়ের পর পাটনায় সংসার পেতেছি। সে এক তারাভরা আধোচাঁদের রাত, বিকেলে এক পশলা ধোয়ামোছা আকাশ। আমাদের বাসার পাশেই বড়ে তালাও। তাতে ব্যাঙের ডাকাডাকি। আমি আর নয়না প্রথমে এই জলচরদের মতো বিছানায় ঝাঁপাঝাঁপি করে পরস্পরের ওপর সাঁতার কাটালাম। তারপর বুনোগন্ধটা স্পষ্ট হয়ে উঠলে জীবনে প্রথমে শেখা গোখরা আর ঢেমনা সাপের শরীরে শরীর পেঁচানো খেলাটা হল। মিঠে অবসাদে নয়নার বুকে আলতো হাত রেখে শুয়ে শুয়ে হাওয়ার ঝিরঝির শুনছি। অনেকটা উঁচুতে জানলার ফ্রেমে একখণ্ড আকাশ। উজ্জ্বল দাগ টেনে একটা তারা খসে পড়ল আর আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নয়না অবাক হয়ে বলল, কি হল?

—এইমাত্র তোমার পেটে বাচ্চা এসে গেল।

—যাঃ কি পাগলের মতো বকছ? এসব এত চট করে বোঝা যায়? আমার বন্ধু রেখার কাছে শুনেছি অন্ততঃ মাসিকের আগে কিছু আন্দাজ করা যায় না। ওতো দুবার মা হয়েছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম, দুবার কেন একশবার মা হলেও খুব নির্বোধভাবে হয়। কেউ কি পুতুল গড়ার মতো নিজের পেটের বাচ্চা চোখে দেখে হাতে ছেনে বানায়? হয়ে যায়। জন্মের ব্লু-প্রিন্ট থাকে।

মুনিয়ার আঁকিবুকি আমি চিনি। ওই রকম একটানে কালোর ওপর সাদা দাগ দিয়ে তারা খসলে কেউ জন্মায়। মরলে উল্টোটা। আঃ সেই পাপবোধ আবার আমার ভেতর কামড় বসিয়েছে। আমি কারো জন্মের জন্য দায়ী। সারাজীবনের সুখ-দুঃখ, ঝড়ঝাপ্টা আর—

নয়না ধরমর কর উঠে বসল, কি হয়েছে তোমার?

—কি আবার হবে?

—তা হলে এসব ভুতুড়ে কথা বিড়বিড় করে বলছ কেন?

আমি বিছানায় এসে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লাম। কি জবাব দেব? এসব কাউকে বোঝাতে পারব না। কোথায় আঁকে আর কোথায় ফুটে উঠে।

সেই ছেলে বউমা আমাদের নাতি-নাতনীদের নিয়ে এসে গেছে। হয়ত শেষ দেখা-টেখার কথা ছিল। মোট পাঁচ বছর পর হুড়মুড় করে চলে আসতে হওয়ায়

আমাদের একমাত্র ছেলে শঙ্খ ও বউমা বুলা বেশ বিরক্ত। বড় নাতি রাণার বিখ্যাত স্কুলের এখন মিড শেসন। এ কদিনেই পিছিয়ে পড়বে। বাবা তো ভালই আছেন দেখছি। হ্যাঁ আছি। কি আবার হয়েছে? কিচ্ছু না। হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম। এবার কিন্তু কালো স্লেটে কোনও ছবি ফোটেনি। সেই কালো মেয়েটার আমাকে দরকার বোধহয় ফুরিয়ে এলো। ওর চেহারা তো কবেই ভুলে গেছি। ছবি আঁকাও শেষ।

বউমা বুলা এক বছর চার মাস বয়সী আমার কনিষ্ঠতম বংশধরকে কোলে নিয়ে মুখোমুখি বসল। ও খুব আলাপী। বলল, আপনার কি খেতে ইচ্ছে করে বাবা?

আমি জবাব দিলাম, ছোট্টটাকে দাও। একটা চুমু খাই। না এলে এরসঙ্গে আমার দেখাই হত না।

—সবাই বলে ও নাকি আপনার মতো হয়েছে। কপাল, নাক, এমনকি পিঠের ডানদিকের জরুলটা পর্যন্ত মিলে যায়।

শিশু আমার বুকে এসে খুশি হয়েছে দেখছি। ছোট্ট মুঠো বাড়িয়ে চশমাটা ধরার চেষ্টা করছে। আমি ওর টাটকা ঘ্রাণ নিতে নিতে বড় নাতি রাণার হইচই শুনছিলাম। সঙ্গে আর বালিকার গলা। একসময় রাণা ছুটে এসে পেছন থেকে মাকে জাপটে ধরল। এই ছাড় ছাড়। কি হয়েছে?

—জিনা মারবে।

—কি হয়েছে?

—আমি কিছু করিনি। শুধু একটু ধরেছিলাম। মাত্র একটা। ওর কাছে তো অনেক আছে—

—আমার হয়েছে জ্বালা। তোদের নিয়ে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। দাদুর অসুখ খেয়াল আছে? জিনা এই জিনা..........

ডাকার দরকার ছিল না। মেয়েটা নালিশ নিয়ে দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল। অত্যন্ত লঘু পায়ে এগিয়ে এসে ইজেরের পকেট থেকে এক মুঠা পুঁতি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এই দেখ ছিঁড়ে দিয়েছে। ছেচল্লিশটা ছিল। একটা নেই, সবচেয়ে বড়টা—

আমি হাঁ করে দেখছিলাম। পাতলা গড়ন কালো মেয়ে। পুঁতিগুলি একটা একটা করে তুলে নিতে ফণা তোলা সাপের মতো অল্প দুলছে। নাকে প্যাঁচ খাওয়া হলদে সুতোয় গিট। এই সেই মুনিয়া। একেবারে মুছে গিয়ে কতকাল পরে আবার দেখা দিল। বুলা চিৎকার করে উঠল, রাণা। ছেলেটা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে হাতের মুঠো থেকে ঘামে ভেজা মাদুলির আকারের লম্বাটে একটা পাথরের পুঁতি গড়িয়ে দিল। ভারি অদ্ভুত মালাতো। প্রত্যেকটি দানা আলাদা রকমের। বুলা বলে চলেছিল, পারিনা। বাচ্চাটাকে ধরার জন্য ওকে এনেছি। ওদের গলায় এরকম মালা থাকে। তার আবার তুকতাক আছে। ওর ঠাম্মা কিন্তু এখানকার মেয়ে। আপনাকে চেনে। জানি জানি। আমার ঘুম পাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে মনে মনে বললাম, তা হলে এসে গেছ? আমাকেতো তার দরকার নেই। তোমার তুক-তাক শেষ মুনিয়া। এবার অন্য খেলা খেল।

লীলাবতীর পাঁচ হাজার বছর

"ইনি সেই আদ্যা।
সহস্র সহস্র বৎসর আমরা যাঁহার গর্ভে আছি।"

—তন্ত্রবিভূতি

লীলাবতী বিউটিপার্লার থেকে সুন্দরকান্তি হয়ে ফিরে এসে বউদিকে বলল, কেমন লাগছে? শোভা ছেলের শার্টে বোতাম সেলাই করছিল। নতমুখ না তুলেই বলল, হুঁ। বাইরে ঝড়ঝাপটা এলে ও এরকমই করে। দুরন্তপনার বয়সে জামাপ্যান্টের বোতাম ছিঁড়ছে ছিঁড়বে। কাজেই শোভার অশান্ত মন জুড়িয়ে নেওয়ার উপকরণের অভাব হয় না। বসে বসে বোতাম সেলাই করে। লীলাবতী বউদির মুখোমুখি বসে পড়ল, বলল, না দেখেই হুঁ বললে? শোভা এবার ওর চোখে চোখে চাইল। বিশ সেকেণ্ডের মতো,

—কার জন্য এসব?

—মেয়েরা কার জন্য সাজে?

—শোভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাবার ঘরে যাও। তোমার একটা চিঠি আছে। আজ তোমার ফেরার কথা না?

—হুঁ। কাল সকালের ফ্লাইটে ও মুম্বাই থেকে এসে যাবে। আমাকে না দেখতে পেলে চায়ের কাপ ভাঙবে, কি গীজার চালু রেখে অফিসে চলে যাবে।

—এত?

লীলাবতী গরবিনীর মতো গ্রীবাভঙ্গী করে উঠে গেল চিঠিটা দেখতে। এই সেই চিঠি। রেজিস্টার্ড পোস্টকার্ড। উকিলেরা যেমন করেন।

মহাশয়া,

আমার মক্কেল শ্রী মানব বসু, পিঃ রাধানাথ বসু, হাল সাং এ ১৭/৩২ ডানকান পার্ক অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আপনার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিয়াছেন। এতদ্বারা আপনাকে তাঁহার বসবাসের জন্য কোম্পানির প্রদত্ত গৃহের কোনও উপকরণ অপসারণ করা হইতে বিরত থাকিতে বলা হইতেছে এবং তাঁহার ক্রেডিটে কোনও দ্রব্য ক্রয় করিতে নিষেধ করা যাইতেছে।

পড়া শেষ হলে কম্পিতস্বরে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, এর মানে কি লীলা?

লীলাবতী হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মা বললেন, আসার আগে কি ঝগড়াঝাটি করে এসেছিলি?

—না তো। ওইতো গাড়িতে আমাকে নামিয়ে গেল। অনেকদিন যাও না। ক'দিন

থেকে এসো মার কাছে। এইসব মিষ্টি কথা। দাদা বললেন, তা হলে নিশ্চয় সেই মিসেস রতিয়া দুবের ব্যাপার। ওদের অফিসের কম্প্যুটার প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট মেয়েটা। দুজনকে আমি একসঙ্গে ক্রিসক্রস বার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। আর একদিন নন্দনে।

বাবা বললেন, মিসেস যখন তখন তো বিবাহিত।

—দেখগে, ওদিকেও এরকমই উকিলের চিঠি গেছে।

মা বললেন, ছিঃ এসব কি হচ্ছে আজকাল? হ্যাঁরে লীলা তোর দিক থেকে কি....?

—তেমন কিছু হলে জানতেই পারতে।

—এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে আগে থেকে তার আঁচ পাস নি?

—না।

বস্তুত লীলাবতী ওদের দিকে পিছু ফিরে জানালার গ্রীল ধরে মানবের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আগাগোড়া ভেবে দেখল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা স্কুল শিক্ষক। মানব উচ্চবিত্ত। কোম্পানির কভেনটেড অফিসার। চেহারা ভালো থাকায় নজরে পড়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা ওর হাঁসের মতো গলা, মুনস্টোনের মতো চোখ, পলসনস বাটারের মতো চামড়ার দাম। দামটা ভালোই পাওয়া গিয়েছিল। গাড়ি, বাড়ি, মাইক্রোওভেন। প্রথম আলাপে বুকের খাঁজ থেকে পেন খুলো হাতে ধরিয়ে দিলে মানব দেহতপ্ত জিনিটাকে নাকের কাছে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, কতো লিখব?

—আপনার কাছে আমরা ভাল সাহায্য আশা করে এসেছি। ভিতেনামের যুদ্ধে বাপ-মা হারানো শিশুদের জন্য খেলনা কিনে পাঠানো হবে। বুঝতেই পারছেন.....মা বাপ হারানো সেইসব বাচ্চাদের কত কষ্ট।

—না পারছি না। তবে চাঁদা দেব আপনারা এসেছেন।

লোকটা সত্যি করুণা, প্রেম এসব বুঝতে পারে না। তবে জিনিসের বাজারদর বোঝে। সেদিন ওর হাসতে হাসতে পিছনে মাথা হেলিয়ে দেওয়াটা নাকি খুব সেক্স অ্যাপিলিং ছিল। দুম করে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটা তাহলে কি বাজারদর কমে যাওয়া?

প্রথমে দুঃখে চোখে জল এলো। তারপর নিদারুণ ক্রোধের তাপে সেই জল শুকিয়ে গেল এবং জ্বলন্ত চোখ ফিরিয়ে ও জিজ্ঞেস করল,

—কি বলতে চাও তোমরা?

দাদা বলল, ভেঙে পরিস না লীলা, মামলা করতে চায় করুক। আমরা না লড়ে ছেড়ে দেব না। খোরপোষ তো চাই-ই।

—না।

বউদিও উঠে এসেছেন। বললেন, উকিলের চিঠি দিলেই হল? তোমার নিজের পাশবুক, ব্যাঙ্ক লকারের চাবি, জিনিসপত্র আনতে হবে না? ওঠো তুমি আর আমি যাই।

মা বললেন, সেই ভালো। কোথাও একটা ভুল হয়েছে। তুই চলে যা। নিজেরাই বোঝাপড়া করে নে। মেয়ে মানুষকে একটু নত হতে হয়। চিরকাল পুরুষের......

লীলাবতী ভাবল যা হচ্ছে হোক। ওর চেয়ে ধনী কাউকে বিয়ে করে আমি দেখিয়ে দেব আমার মধ্যে এখনও সেই পুরোনো জাদু আছে। তবে শেষ হিসেব-নিকেশ করার জন্য একবার যাওয়া দরকার।

তো যেতে যেতে লীলাবতী পাঁচশ বছর পিছনে চলে গেল। কার থেকে নেমে গরুর গাড়ি, গরুর গাড়ি থেকে নৌকোয়। ঘাটে নেমে হাঁটাপথে দুই ক্রোশ। ইতিমধ্যে ওর পোশাক-আসাক পাল্টে গেছে। মঙ্গলকাব্যের আমলে যেমনটা হতে হয়। পদ্মপেড়ে তাঁতের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট নেই। তবে কাঁচুলী আছে কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ, চোখে কাজল। আসার আগে রিঠার ফেনায় চুল ধুয়েছে। ডাবের জলে কলাই বেঁটে কাঁচা হলুদ মিশিয়ে অঙ্গ মার্জনা করেছে। ঘাটে পা দিয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে দিল। শ্বশুরের দেশ। সঙ্গে দাদা ও লাঠি হাতে রূপচাঁদ ডোম।

মাঠে মাঠে হাল নেমেছে। পক্ষকাল আগে অম্বুবাচীতে পৃথিবী রজস্বলা হয়ে এখন বীজ ধারণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। লীলাবতীর শ্বশুর ব্রাহ্মণ ভূস্বামী। এইসব জমি, ওই পশু ও মানুষগুলি তাঁরই। সম্পত্তি থাকলে তার উত্তরাধিকারী চাই। না হলে ধারাবাহিকতা থাকে না। মাটি থেকে শস্য জন্মায় এবং নারী থেকে সেই শস্যের মালিক জন্মায়। মাটি পুরুষের সম্পত্তি। নারীও তাই। হায়, লীলাবতী এখন পর্যন্ত কোনও সন্তানের জন্ম দিতে পারে নাই। অনুর্বর মাটির মতোই অনুর্বর নারীরও আদর নেই।

ফাল্গুনের আজ শুক্লা দ্বাদশী। শীত কেটে বেশ একটু গরমের ছাট পড়েছে। আকাশ রোদে ঝলমল করছে। যেতে যেতে একটা দীঘিতে ওরা তৃষ্ণা মেটাল। পাড়ে বসে বাড়ি থেকে আনা নাড়ু-মুড়ি দিয়ে জলযোগ করে নিল। তাল আর পিঠুলী গাছের ছায়ায় বড় গভীর দেখাচ্ছে নিস্তরঙ্গ জল। কিনারে ঝাঁকবাঁধা পদ্ম এ ওর গলা জড়িয়ে রুপসীরা যেসব গোপন কথা কেবল সইকে বলে সেসব আলাপ করছে মনে হয়। তাদের পাশে ওর বিম্ব বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। লীলাবতীর মনে আছে বিয়ের পর এইখানে ওদের পালকি নেমেছিল। সঙ্গে বর। তখন ছিল একরকম। সামনে সুখের রাত। সৌভাগ্যের দিন। আজ অন্যরকম। স্বামী আর একটি বিয়ে করেছে। বংশরক্ষার জন্য। তাইতো বলে পাঠিয়েছে। লীলাবতী এই উনিশ বছরের যৌবনে যদি গর্ভধারণ নাই করতে পারে তো এই খঞ্জনী চোখ, ফেটে যাওয়া ডালিমের দানার মতো দাঁতের পংক্তি, পানপাতা মুখ আর ঘন পত্রপুঞ্জের আড়ালে ঈষৎ উদ্ভাসিত দুটি কদম্বকোরকের মতো স্তন এসব বৃথা। লীলাবতী ভাবল তবে মেয়েমানুষের এত রূপ কেন? ও হাত বাড়িয়ে জল ছলবল করে দেওয়ামাত্র প্রতিবিম্ব ভেঙে গেল।

ওকে হাত বাড়াতে দেখে রূপচাঁদ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—কি গো, পদ্মচাক নেবা নাকি? মুই তুল্যে দি?

তা কাপড় গুটিয়ে জলে নেমে এই অস্পৃশ্য যুবক সঙ্গী কয়েকটা পদ্মচাক আর ফুল তুলে ওখান থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। দিতে দিতে কি রকম অবাক চোখে ওর দিকে চাইল।

শ্বশুরবাড়িতে ঢোকার মুখে কেটে যাওয়া ধূমধামের চিহ্ন চোখে পড়ল। দুয়ারের দুপাশে কোমরভাঙ্গা কলাগাছের নীচে মঙ্গল কলস। শামিয়ানা খুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু খুঁটিগুলি আছে। তার গায়ে ছেঁড়াপাতার মালা লেপ্টানো। আর সব নিত্যকার মতো। গোয়ালের বাইরে দুধ দোয়ানোর অপেক্ষায় খুঁটোয় বাঁধা গাইগুলি, ঢেঁকিশালে ধানকোটার ধূপধাপ শব্দ, ধোঁয়ায় রান্নাঘরের আচ্ছন্ন চাল। সংসারের সমস্ত কাজ চলছে। লীলাবতী ভাবল শুধু ওর জায়গাটা পালটে গ্যাছে। হেঁসেলে এখন ওর সতীন।

বাইরের বাকুলে দাঁড়িয়ে দাদা হাঁক দিল, কি গো, কুটুমবাড়ির কে আছে? তোমাদের পুরনো বউ এসেছে।

দাসী মানদা সাজোকাচোর কাপড়চোপড় পিঁড়ির ওপর থুপ করে মাথায় নিয়ে ঘাটে যাচ্ছিল, দেখে ধুপ করে নামিয়ে কাছে এসে বলল, ওমা, চলে এলে যে?

লীলাবতী জিজ্ঞাসু হল, কেন?

—না, তা এলে ভালো। কিন্তু এরা যে........তা আমি ভেতরে খবর দি। তোমরা ওই দাওয়ায় বসো।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে বগলে একটা গুটানো মাদুর আর হাতে এক ঘটি জল এনে বলল, বড় কর্তামশাই নাই গো। জমি গেছে। তিন পহরে ফিরবে। ততক্ষণ তোমাদের এখেনেই থাকতে হবে।

দাদা বলল, তা থাকছি। তোমাদের বউ ভিতরে নিয়ে যাও। মানদা গলা নামিয়ে জবাব দিল, সে হবে নি গো।

ঠাকরাইন বলল পুরনো বউকে নাকি ত্যাগ করেছে। কেন এলে? ভেতর বাকুলে যেন না ঢোকে।

দাদা উচ্চস্বরে বলল, ইঃ, বললেই হল! কেন, সতীনঘর হয় না? কি অন্যায় করেছে আমার বোন?

লীলাবতী থামিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে মানোদিদি, বাবাঠাকুর আসুন, তখন যা হয় হবে। অনেক সাজোকচো দেখছি? নতুন বউয়ের বুঝি? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঘাটে যাই।

—থাক থাক। এই এলে, জিরান নেও।

—ওমা, তাই হয় নাকি? একটা দিন তো থাকব খাব। মেয়ে মানুষ না খেটে খায় নাকি?

তো লীলাবতী সারাদিন কাপড় কাচল, বাসন মাজল, গোয়াল কাটল, কামিনেদের সঙ্গে ঘুঁটেও দিলে। সব বাইরে বাইরে। স্বামীকে দূর থেকে দেখল। নতুন বউকে দেখল কাছ থেকে। খেতে গিয়ে। নাকের চেয়ে বড় নোলক, রোগা কচি বয়সী মেয়েটি।

—তুই বুঝি আমার সতীন? জিজ্ঞেস করতেই টিপ করে প্রণাম করে বসল। সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে সুখে থাক—বলে চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। তারপর গলায় হিংস্রতা ঢেলে দিল, কেমন লাগছে আমার বরকে? সাবধান ছুঁড়ি, আমাকে তাড়াল কেন জানিস?

—না তো।

—পেটে আসে নাই বলে। তোরও হবে না। ও লোকটার কোনও ক্ষমতাই নাই। যদি টিকতে চাস তো যেভাবে হোক যাকে দিয়ে হোক এদের বংশরক্ষা করে দে।

ফিরে আসতে আসতে চোখে পড়ল ওর সতীন যমুনা বড় ভীতু, চোখেমুখে ত্রাস। বাঁশের খুঁটি জাপটে প্রমাণ মাপের শাড়িতে জুবুথবু হয়ে ঘামছে। লীলাবতীর করুণা হল, দুঃখ হল, ঘেন্নাও হল।

দাদা বলল, তোর শ্বশুর তো কিছুই কানে নিতে চাইল না লীলা। বললাম, সতীন নিয়ে কেউ ঘর করে না? তার জবাব হল ও বাজা, ওকে নিয়ে আমাদের লাভ কি? তো অনুনয় করলাম বউ না মানুন, কামিন্যা রাখুন। বারবাড়িতে থাকবে, খেটে খাবে। আপনার জমিজমা ধানপান কত। লোকওতো তেমন চাই। তাইতে বললেন—আমার দুই বিধবা বোন আছে। কাজের লোক অনেক। আর চাই না। একে নিয়ে যাও। পুরনো বউ থাকলে নতুন বউ-এর দিকে ছেলে ফিরে তাকাবে না। আমার নাতি হবে না। তা অনেক তো সাধলাম। কাল সকালেই ফিরে যেতে হবে। তুই নিজে একবার শ্বশুরকে ভজিয়ে দেখ না। লীলাবতী ঘাড় কাৎ করে বললো, আচ্ছা।

দীন বেশে নয়, কানোরী ছান্দে খোঁপা বেঁধে আঁচলে মার দেওয়া বর বশীকরণের জরিবুটি গিট দিয়ে পানরাঙা ঠোঁটে লীলাবতী শ্বশুরের ঘরে ঢুকল। হাতে যমুনা সতীনের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া সিদ্ধির গ্লাস। নিত্যকার এই অভ্যাসটার কথা লীলাবতীর জানা।

ওকে দেখে শ্বশুর চমকে উঠল, তুমি কেন?

—আগে তো আমিই দিয়ে যেতাম বাবাঠাকুর।

—না, না, ছোটবউকে দাও।

—কাল ভোরেই তো চলে যাব। শেষবারের মতো একটু পা টিপে দিয়ে যাই।

—দাও। কিন্তু সকালে উঠে আর যেন দেখতে না পাই।

লীলাবতী মোহিনীর মতো হাসলো। তারপর শ্বশুরের পায়ে ওর চাঁপার কলির মতো আঙুলে নরম চাপ দিল। পাশের ঘরে বাতে পঙ্গু শাশুড়ি, মধ্যবাকুলের ডান দিকের ঘরে স্বামীর কোলের কাছে এতক্ষণে যমুনা বইছে। দক্ষিণের ঘরে দুই পিসি

শাশুড়ি সবাই দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। লীলাবতী যুবতী বয়সের সমস্ত ছলাকলা একে একে প্রয়োগ করলো। শেষরাতে শেয়াল ডাকলে বিছানা থেকে নেমে এসে গায়ে শাড়ি জড়াতে জড়াতে বলল,

—তাহলে আমি যাই?

—দূর হ।

—পেটে আপনার ছেলে এসে থাকলে দেখিয়ে যাব কি?

—তুই পাপিষ্ঠা।

—কেন বাবা, তাতে আপনার বংশরক্ষা হবে না?

ভারতীয় পাপবোধে মানুষটা আর্তনাদ করে উঠল।—হায়, আমার যে নরকেও স্থান হবে না। তুই আমার এতবড় সর্বনাশ করলি।

লীলাবতী বিজয়িনীর মতো হেসে দরজা খুলে একেবারে বাইরের বাকুলে চলে এলো। জোছনায় থইথই করছে রাতের শেষ প্রহরে। ঢেঁকিশালে গিয়ে ঘুমন্ত রূপচাঁদকে আস্তে করে ডেকে তুলল, এই ওঠো, আমাদের যেতে হবে,

—দাদাবাবু?

—না, কেবল আমরা দুজন। হাঁ করে কি দেখছ? চুপচাপ চলে এসো। এই পিছন দিকে একটা জঙ্গলা পথ আছে।

যেতে যেতে বন ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে, গাছগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। আলো গ্রাস করার জন্য ঠেলাঠেলি করে উপরে উঠে গ্যাছে। বস্তুত নীচে প্রায় অন্ধকার। স্যাঁতস্যাতে মাটি। পচাপাতা ও শ্যাওলায় পিছল। একসময় কাঁটাঝোপের জটিল জালে পথ বলতে কিছু আর অবশিষ্ট রইল না।

দীর্ঘ যাত্রা শেষে লীলাবতী চার হাজার বছর পিছনে পার হয়ে গেল। তার মানে দুশো পুরুষের কাল। অবশ্য ওদের গোষ্ঠীতে সব পুরুষ নাই। আছে মাত্র পঞ্চাশ। শিশু ও বালক সহ। পশুদের জগতে যাকে খাও সেই খায়। ঝোপেঝাড়ে আকাশে জলে মৃত্যু ওৎ পেতে থাকে। এত সহজ যে কেউ শোক করে না।

পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে লীলাবতী নারী তাদের গোষ্ঠগুহার কাছে উঠে গেল। শিশুদের জন্য বন থেকে কিছু ফল ও নদী থেকে কচ্ছপের খোলায় জল এনেছে। তাকে দেখে সন্তানেরা ছুটে এলো। তারা তাদের মাকে চেনে। বাবা সম্পর্কে কোন ধারণা নাই। যে জন্ম দেয়, স্তন্যপান করায়, লালন করে তার প্রতি আজন্ম টান তাদের অনুগত করে রাখে। তা ছাড়া আছে ভয়। মা জাদু জানে।

লীলাবতী নারী জল আনতে গিয়ে নদীর বালুতে দলছুট বাইসনের উত্তরমুখো পায়ের ছাপ দেখে এসেছে। পুরুষদের সেই পশুর হদীস দিয়ে শিকারে যাওয়ার হুকুম দিল। পাথরের হাতিয়ার নিয়ে তারা ভয়ংকর চিৎকার করে ছুটে চলে গেলে, লীলাবতী নারী শিশুদের ফল-জল দিয়ে গুহামুখের আগুনে দুটো কাঠ ফেলে দিল। এই আগুন সে দাবানল থেকে কুড়িয়ে এনেছে।

আজ বনের পাতা ঝড়তে দেখেছে। তার মানে শীত আসছে। জ্বালানী আর আচ্ছাদনের জন্য পশুর চামড়া জোগাড় করে রাখা চাই। এসব যে জানে পুরুষের চোখে সে এক জাদুকরী। নাতো কি? তার পাতার কটিবাসের নীচে জন্মের উৎসে প্রচণ্ড ঘূর্ণী। চোখে বুকে ভয়ংকর টান।

সূর্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিমের আকাশ নানা রঙে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। শিকারীরা নিহত বাইসন নিয়ে ফিরে এসেছে। লীলাবতী নারী উঠে গিয়ে বাইসনের সামনের পা দুটি ছুটে যাওয়ার ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দিয়ে একমুঠো দুর্বা ঘাস মুখে গুঁজে দিল। সমস্ত শিকারীরা হু-লা-লা-লা করে চিৎকার করে উঠল। এই অভিচারে পশু পুনর্ভবা হবে। আবার ফিরে আসবে। গোষ্ঠের খিদে মেটাবার জন্য। লীলাবতী নারী তীক্ষ্ণ পাথর দিয়ে এবার পশুর বুক ও পেটের চামড়া ছাড়িয়ে মেটে আর হৃৎপিণ্ড খুলে নিয়ে শিশুদের দিল। এবার সবাই মাংস খেতে পারে। যার যেমন দেহের শক্তি সেই তার দেহের প্রয়োজনের পরিমাপ। যার যেমন শক্তি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকল।

লীলাবতী নারী তার অংশ ছিঁড়ে নিয়ে একটা উঁচু পাথরের উপর বসে খেতে খেতে দেখল পুরুষদের চওড়া কাঁধের আড়াল দিয়ে সূর্য পুট করে ডুবে গেল। তাদের ঘামে ভেজা সবল পেশিতে আর রক্ত মাখা দাঁতে দপ্‌দপ্‌ করতে থাকা আভা। স। .নে আগুন আর লীলাবতী নারী। সে তার খাওয়া শেষ কেরার পর হাড়খণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিল। অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে খস্‌ খস্‌ শব্দ শোনা গেল। বন্য কুকুরেরা মানুষের ফেলে দেওয়া খাবারের লোভে কাছাকাছি উঠে আসে।

সেদিনকার মতো আজও শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ অমল আলোয় চরাচর মগ্ন করে দিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে পুরুষদের একজন সেই লীলাবতী নারীকে মুগ্ধ চোখে দেখল। এখন পেটের খিদে মিটে গেছে। পশুমাংসের রস ও ঘ্রাণ থেকে আর একটা তীব্র অনুভূতির জন্ম হচ্ছে। সে উঠে গিয়ে সেই নারীকে হাত ধরে কাছে আকর্যণ করল। আরও একজন পুরুষ চিৎকার করে ছুটে আসা মাত্র লাফ দিয়ে উঁচু ধাপে উঠে গেল। সেখান থেকে সে দেখল মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তারই জন্য। কে তার সন্তানের বীজ বহন করবে তা স্থির হবে এই যুদ্ধে। প্রকৃতির সমস্ত নির্বাচনের মূল সে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে ভয়ংকর গর্জন করে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ করছে। পাথর ছিটকে যাচ্ছে। ধুলোর মেঘ। তাতে রক্তচ্ছটা। ডালপালা ভাঙার শব্দ। ঘর্ষণজনিত স্ফুলিঙ্গ ছিটকে যাচ্ছে। আর্তনাদ এবং বর্বর উল্লাস। আগে খিদে ছিল। তারপর মিলনেচ্ছা। তারপর জিঘাংসা। তার এদিকে মৃত্যু, আর একদিকে জন্ম। উচ্চধাপে যে নারীর আগুনের মতো লাল চুল হাওয়ায় উড়ছে তার জোছনায় ধোয়া শরীর থেকে এইসব হয়ে উঠছে। যতদূর চোখে পড়ে নদী বন আকাশ উপত্যকা সব তার। যে সন্তানরা গোষ্ঠীকে ক্রমশ বড় করছে তার মধ্যে বহুজাতিক কোম্পানির ম্যানেজার মানব বসু, ভূস্বামী তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং অন্ত্যজ রূপচাঁদ ডোমের বীজ আছে। সামনে বহুদূর বিস্তৃত বন, নদী, ঢেউ খেলানো উপত্যকা—সব তার। কোনও নাম নেই। এখন সে শুধু নারী।

বুনো রামনাথ চলে গেলেন

আমার চোখের সামনে বুনো রামনাথ মোষের পিঠে লাফিয়ে উঠলেন এবং আদি ভারতের দিকে চলে গেলেন। সীতামারীতে বি. ডি. ও হয়ে আসাব পর ওঁর কথা নানা প্রসঙ্গে কয়েকবার কানে এলো। বিলের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো জেগে থাকা গ্রামগুলিতে সম্ভবত জল দূষণের ফলে এক অজ্ঞাত রোগের মহামারী। সদর থেকে মেডিক্যাল টিম এসেছে। কোথায় কোথায় তাঁরা যাবেন এ নিয়ে ম্যাপ খুলে আলোচনা চলছে। পঞ্চায়েত অফিসার বিনয় দস্তিদার বললেন এই ছটা গ্রাম বাদ। রাস্তা নেই। জল আর জঙ্গল। টিম লিডার ডাক্তার সরকার খুব ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, এইতো আপনাদের দোষ। দুর্গম বলে ছেড়ে দেব? জলাভূমির লোকরাই সবচেয়ে বিপন্ন।

—না তা ঠিক নয়। ওখানে যাওয়ার দরকার হবে না। বুনো রামনাথ আছেন।

—বুধিয়া থেকে নারানটোলা পর্যন্ত টিউবওয়েল তো দূরস্থান একটা পাটকুয়া পর্যন্ত নেই, মানুষ আর জন্তু জানোয়ার জুলিতে নেমে ঘোলা জল খায়—তবু কলেরা টাইফয়েড হয় না এ কি ভোজবাজি? আর কি নাম বললেন, সেই লোকটা কি মন্তর-টন্তর ঝেড়ে সব ঠিক রাখে?

—আজ্ঞে না। আসল নাম রামাই কিসকু। তেঁতুলতলায় বসে কাচ্চাবাচ্চা পড়ান। এক রকম জঙ্গলী বলা যায়। সে-কারণ আমরা বুনো রামনাথ বলি।

—প্রাইমারি টিচার?

—আজ্ঞে তাও নয়, এস. আই অব স্কুলস জগন্নাথ দাস বললেন, নিয়ম মাফিক কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার ওই এলাকায় সার্ভে করতে গিয়ে দেখেছি নিরক্ষর প্রায় নেই। ছটা গ্রামে একশ সাতান্নটা পরিবার। লোক সংখ্যা.....

ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার বাধা দিয়ে বললেন, একশ আটান্নটা পরিবার। একটা কম বলেছেন।

—সে তো আপনাদের বানানো। আদ্যিকাল থেকে ওদের যৌথ চাষবাসের প্রথা ছিল। জমি কার? না গ্রামের। আপনারা ব্যক্তিমালিকানায় এনে কাগজপত্তর ঠিক করার জন্য কারো একার নয় এমন জমিটুকুর এক মালিক ঠিক করে ফেললেন। তাকে দখল দেওয়াতে পারলেন কি? সেই থেকে ক্রমাগত পুলিশ আর আদালতের হাঙ্গামা।

জে. এল. আর ও উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলেন, থামুন এস. আই সাহেব। ওদের কোনও রেকর্ড আছে—? সব তো মুখের কথায় চলছিল। এটা ওর, ওটা এর-এটুকু সকলের। এভাবে চলে? আমরা রেকর্ড করে দিয়েছি। এবার কোর্টে যাক। নাটের

শুরু হচ্ছে আপনাদের ওই বুনো রামনাথ। পেছনে কোনও কোনও ভদ্রলোকের মদতও আছে।

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, আদিবাসীদের মুখের কথাই রেকর্ড। পুরুষানুক্রমে চলে। এ ব্যাপারে ওরা খুব রক্ষণশীল। তবে মাঝি পরগণা ইত্যাদি মুখিয়াদের কাল দ্রুত চলে যাচ্ছে। এ যে দেখছি পুরনোকালের একটা লোক রয়ে গেছে। চলুন, গিয়ে সরেজমিনে দেখাই যাক।

মেডিক্যাল টিমের সঙ্গী হয়ে পাঁচ মাইল দূরে জিপ রেখে খানিকটা ডোঙায় খানিকটা জলকাদা ভেঙে লছমন টোলায় পৌঁছালাম। পঁচিশ বছর আগেকার আদিবাসী জনপদের নেংটি পরা কালো লোকজন। একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করা মাত্র সে রামাই কিসকু অর্থাৎ বুনো রামনাথের বাড়ি নিয়ে গেল। চালাঘরের মাথায় একঝাঁক শালিক। দেয়ালে রাঙামাটি দিয়ে আঁকা হাতি আর পদ্মফুলের মোটিফ। ভিটের একপাশে থাক। পাঁচজনের বসার জায়গা। সামনে একটা বাতাবিগাছ। ফুলে ফুলে শাদা। বুনো রামনাথের সঙ্গে দেখা হল না। তিনি জলায় মোষ চরাতে গেছেন। তা কলেরায় এখানে কেউ মারা গেছে কি?

—লয়কো। তবে একজনাকে সাঁপে কাইটাছে বটে।

—কোথাকার জল খাও?

ওরা হাত বাড়িয়ে বিল দেখিয়ে দিল, উই হোথাকে, হেলথ অফিসার বললেন, আশ্চর্য। আমি জলের নমুনা নিয়ে যাব। এক লোটা জল আনো।

সোনার মতো চকচকে মাজা ঘটিতে যে জল নিয়ে আমাদের মুখোমুখী দাঁড়াল তাকে দেখে, সত্যি বলছি, চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোরী। কালো পাথর নিখুঁত ভাবে খোদাই করে যেন বানানো হয়েছে। অথচ জলের ঘটি নামিয়ে যখন সোজাসুজি আমাদের দিকে তাকাল মনে হল কালো সাপ ফনা তুলে দাঁড়িয়েছে। এত তীক্ষ্ণ চোখ। অল্প অল্প দুলতে থাকা তন্বী শরীর। অনেকদিন ভুলতে পারিনি। দিকুদের প্রতি ওদের সন্দেহ অবিশ্বাস থাকে। তাছাড়া গাঁওয়ালী জমির ব্যাপারে চোট খাওয়া। এসব আমার পরে মনে হয়েছে। তবে সেদিন কিন্তু ওর চোখানজরে বিদ্রুপ পড়তে ভুল করিনি।

জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ জীবানুমুক্ত। পদ্ধতিটা চাক্ষুষ করেছি। ফিলটার করার দেশী উপায়। ছিদ্র করা কলশের উপর কলশ। সবচেয়ে উপরে ঘোলা জল। তারপর বালি। নীচে কাঠকয়লা। অবশেষে চুইয়ে নামা পরিশ্রুত জল। জীবানুমুক্ত করার জন্য কিছু নিমের বীজ ভেজানো।

বুনো রামনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা ব্যাঙ ধরার ঘটনায়। চমনলাল এক্সপোর্টের এজেন্ট একদিন বির্পস্ত অবস্থায় আমার অপিসে নালিশ জানাতে এলো। তখনো ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হয়নি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মার খেয়ে পালিয়ে এসেছেন। পুলিশ কয়েকজনকে ধরে এনেছে কিন্তু তাতে আসল কাজ হয়নি। চমনলালরা ফ্রান্সে ব্যাঙ চালানের মস্ত অর্ডার পেয়েছেন। বিলে ব্যাঙ ধরার সরকারি অনুমতি পত্র দেখলাম। এভাবেইতো জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়ে বিদেশী মুদ্রা আসে। জংলিরা

এসব বোঝেনা। নেট নামালে দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে ব্যাঙের মতো ডাকতে ডাকতে জল তোলপাড় করে দেয়। মানুষ সমেতো তো নেট টানা যায় না। আমি নিজেই রওনা হলাম। সামান্য ব্যাঙ চালান দিয়ে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধির কথা বললে আদিবাসী মাস্টার নিশ্চয় বুঝবে। বুনো রামনাথ জলার ধারে ওঁর তেঁতুলতলার পাঠশালায় গুটিদশেক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসেছিলেন। আমাকে দেখে উঠে কোমর ভাঁজ করে নমস্কার করলেন, বসিতে আজ্ঞা হউক। আপনি স্বয়ং আগমন করিবেন জানিতাম।

হেসে বললাম, কি করে জানলেন?

—ভেক নিধন সংক্রান্ত বিষয় নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আমাদের দরকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন। আশাকরি এই অনগ্রসর এলাকায় একমাত্র আপনি বুঝতে পারবেন। তুচ্ছ ব্যাঙের বিনিময়........

বুনো রামনাথ হাসলেন, তুচ্ছ? আমি ঈশ্বরচন্দ্রের কথামালা পাঠ করিযাছি। তাহাতে বালকগণের নিকট ক্রিড়াচ্ছলে ভেক নিধন না করিবার আবেদন আছে। আর বোধোদয়ে কথিত হইয়াছে অবশ্যই কোন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমস্ত প্রাণী সৃষ্ট। আদিবাসী বিশ্বাসও তদ্রুপ। আমার মাতামহ কর্মাটরে ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় আমি বঙ্গভাষা শিখিয়াছি। তুচ্ছ ভেক না থাকিলে বিক্রয় লব্ধ অর্থের কতগুণ ক্ষতি হইবে?

—তারমানে?

—অতীব সরল। জলাভূমির ভেকেরা কীট ভক্ষণ করে। তাহাতে মাঠের ধান্য সতেজ হয়। পুনশ্চ ভেক ভক্ষণ করিয়া মৎস্যের বাড়বাড়ন্ত। না। কোনক্রমেই ভেক হত্যা চলিবেনা।

সেদিন মাথানীচু করে ফিরে এসেছিলাম। বনের হাওয়া জলাভূমির ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছিল। ব্যাঙের ডাক আর পাখির কিচিমিচি। প্রকৃতির উদার প্রশান্তির মধ্যে তেঁতুল গাছতলার সেই আদিবাসী শিক্ষকের ধ্যান-ধারণা ও দৃঢ়তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞা কিভাবে মিলেমিশে গেছে। বোধহয় জ্ঞান নিসর্গের মতোই উদার। সঙ্কীর্ণ বেড়া দিয়ে তার শ্রেণীভেদ করা যায় না।

পঁচিশ বছর পর এই মহকুমায় এস. ডি ও হয়ে ফিরেছি। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত, ভূমি-সংস্কার, রেগুলেটেড মার্কেট, রাস্তা, কৃষিতে যান্ত্রীকরণ কত কি এসেছে। ভরাট হয়েছে জলাভূমি। বিদায় নিয়েছে বন। ঠাঁই পেয়েছে কোল্ডস্টোরেজ আর ভিডিও হল। পেশকার দাসবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম বুনো রামনাথ বলে কাউকে চেনেন? তিনি মাথা নেড়ে বললেন—না তো।

—গাড়ি রেডি করতে বলুন। আমি লছমনটোলা যাব।

সারা পথটাই এখন মোটরেবল। বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে, বুনো রামনাথের আদিকালের বাসভূমি। এখন নাম রাজীবনগর। ওপাশে ফরাক্কা ব্যারেজ, এ পাশে এনটিপিসির কারখানা, ভুতিয়ার ডাঁড়ার ওপর সেতু। পোড়া ডিজেল ও

রাসায়নিক মেশা কালো জলে মরা কাক ভেসে যাচ্ছে। বড় বড় এপার্টমেন্টের সূর্য আড়াল করা অন্ধকারে কাত হয়ে যাওয়া বুনো রামনাথের কুড়ে। সেই বাতাবিগাছটা কিন্তু আজও সতেজ। প্রথম দিনের মতো গন্ধে ঝিমঝিম করছে। তার তলায় তিনি মোষের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে আনত অভিবাদন, আপনার অপেক্ষাতেই আছি।

—কি করে জানলেন আমি আসব?

—অদ্য চলিয়া যাইতেছি। না আসিলে কাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব?

—কোথায় যাবেন?

বহুদূরে প্যাস্টেলের দাগের মতো রাজমহল পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করে বললেন,ওই দিকে এখনো অরণ্য। বনবাসীদের কয়েকটি গ্রাম আছে। পাঠদানের নিমিত্ত বালক- বালিকা পাওয়া যাইতে পারে। এ সান্ঝা, আয়গে, দেইখ্যে যা সি. বি. ডি সাহেব আইসাছে।

মস্ত এক পুটুলি নিয়ে মেয়েটা বাইরে এলে। আজ আর তাকে ফণাতোলা কালো গোখরোর মতো দেখাচ্ছেনা বরং ঝড়ঝাপটা খাওয়া সীমলতার তুলনা। আমাকে দেখে অস্পষ্ট শব্দ করল, অঃ তারপর পুটুলি নামিয়ে খিল খিল করে হেসে বলল, একলোটা জল আনব কি? তিয়াস পাইয়াছে? কিন্তুইবার আর পিতে নাই পারবা গ। বড় গন্ধা।

—তোমরা চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ গ। ই ঠাঁই আর মোদের লয় বটে। এতদিন কুথাকে ছিলা?

গলায় ভেজা অভিমান। আমি আর কি আশ্বাস দেব? কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে বললাম, এই বাতাবিগাছটা সেই রকমই আছে দেখছি।

বুনো রামনাথ খুব সহজ গলায় জবাব দিলেন, বৃক্ষের স্বভাবই এই প্রকার। ছেদন না করা পর্যন্ত ফল ও ফুল দিতে থাকে। ইবার চল সান্ঝা। আর বিলম কেনে? বহুত দূর যাইতে হবেক। মেয়েটা তর তর করে গাছে উঠে দুটো পাকা ফল পাড়ল। একটা আমাকে দিয়ে অন্যটা পুটুলিতে ঢোকাতে ঢোকাতে আনমনে বলল, ইটা নিলাম বীজের লেগে। তবে যাই?

বুনো রামনাথ মোষের পিঠে উঠলেন। দড়ি ধরে আগে আগে চলল সান্ঝা। আমার যে কি হল পায়ে হেঁটে কিছু দূর ওদের অনুগমন করলাম। এরপর ধু ধু প্রান্তর। আকাশের পটে স্থির মেঘের মতো পাহাড়ের ছবি। আমাদের এই কমার্শিয়াল উন্নয়নের সঙ্গে বুনো রামনাথের যুগ যুগ লালিত মূল্যবোধ, সান্ঝার প্রাকৃত রূপ এবং নিসর্গের নিয়মকে কিছুতেই কি মেলানো যায় না? বড় বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। ক্রমে বুনো রামনাথ ছোট হতে হতে বিন্দু হয়ে গেলেন। সেই সময় মোষ ডেকে উঠল আঁ আঁ। সেই শব্দ প্রান্তরের হু হু হাওয়া, জলের সোঁ সোঁ আওয়াজের সঙ্গে মিলে মিশে বলতে কি এক মহাধ্বনিতে পরিণত হয়ে ওম্ ওম্ শোনাচ্ছে।

এই বোধহয় সেই নাদব্রহ্ম। যা থেকে সমস্ত ভাষার উদ্ভব।

—